ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)

শিক্ষা পরিচিতি ও শিক্ষা দর্শন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

শিক্ষা পরিচিতি ও শিক্ষা দর্শন

লেখকবৃন্দ

কাজী ফারুক হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ মুশফিকুর রহমান সোহাগ, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

মোঃ কাউসার হামিদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই খাগড়াছড়ি

সম্পাদক

মোঃ মুশফিকুর রহমান সোহাগ, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক সহযোগিতা

মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

প্রচ্ছদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৬

মুখবন্ধ

শিক্ষা একটি চলমান ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তার সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করে এবং তাকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দেশ ও জাতির উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ১০ মাস মেয়াদি **ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম** পরিচালিত হচ্ছে। এটি কোনো চাকরিকালীন বা চাকরিসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম নয়। বরং এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক।

ডিপিএড প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হবে। অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাদর্শন, শিখনতত্ত্ব, শিক্ষার কাঠামো ও প্রশাসন, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-বিষয়ক সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয় থাকাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভের পাশাপাশি এ সকল বিষয়বস্তু কীভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে উপস্থাপন করতে হবে তাও আয়ত্ত করতে পারবে। ডিপিএড প্রোগ্রামে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান সরাসরি প্রয়োগ করে হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

এই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে এবং পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, পাঠ্যপুস্তকটি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এই প্রত্যাশা রইল।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

বাণী

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশের পাশাপাশি তাকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন এমন মানবসম্পদ, যারা জ্ঞাননির্ভর, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। এই মানবসম্পদ গঠনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা, যা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা করে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত প্রস্তুতি, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; কার্যকর শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুসংগঠিত একাডেমিক প্রস্তুতি, আধুনিক শিক্ষণ ধারণা ও পেশাগত মূল্যবোধের সমন্বয়। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার জন্য মানসম্মত একাডেমিক প্রোগ্রামের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি, শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এবং পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সমন্বিত ধারণা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষা পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এসব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী শিক্ষা ধারণা অর্জন করবে এবং সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা বা পরিমার্জনের সুযোগ পরিলক্ষিত হলে তা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, আমি আশা ও বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে একটি দৃঢ় ও ফলপ্রসূ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

শিক্ষা মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। এটি মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের সমন্বিত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এবং তাকে মানবিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একটি জাতির সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের ওপর। এই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে, যা শিশুর সার্বিক বিকাশের সূচনালগ্ন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ, নীতিবান ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের গুণগত মানে প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ বা পেশাগত অভিজ্ঞতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পারেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ পেলেও পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি তা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে, যা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য একটি সুদৃঢ় একাডেমিক ভিত্তি ও পেশাগত সক্ষমতাসম্পন্ন জনবলের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হতে পারে; অর্থাৎ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী জনবল তৈরি হবে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মৌলিক ধারণা, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো, শিখন প্রক্রিয়া, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান, পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সীমিত মানবীয় প্রচেষ্টার কারণে এতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে তা সংশোধনের লক্ষ্যে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং যে উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা পরিচিতি ও শিক্ষা দর্শন

সূচিপত্র

অধ্যায় নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	**পেশা ও পেশা হিসেবে শিক্ষকতা:** ○ পেশা হিসেবে শিক্ষকতা ○ শিক্ষকমান ○ আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও গুণাবলী	১-১৭
২	**শিক্ষার মৌলিক ধারণা:** ○ শিক্ষার ধারণা ○ শিক্ষার উপাদান ও কার্যাবলী ○ শিক্ষার ধারা ও স্তর ○ শিক্ষার পরিভাষা	১৮-৪৮
৩	**বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা নীতি পর্যালোচনা:** ○ ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭২; মফিজউদ্দিন আহমদ শিক্ষা কমিশন, ১৯৮৭ ○ শামসুল হক খান শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭) ও মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন (২০০৩) ○ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০	৪৯-৮৪
৪	**বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস, প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা:** ○ প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস ○ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ○ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	৮৫-১০৫
৫	**শিক্ষায় দর্শন ও প্রাথমিক শিক্ষা:** ○ দর্শন এর পরিচয় ও সংজ্ঞা ○ ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদ (২) ○ আচরণবাদ ও জ্ঞানবাদ (২)	১০৬-১৪১
৬	**বৈশ্বিক পরিপেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা:** ○ শিক্ষার আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ○ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও শিক্ষা ○ বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা ও বাংলাদেশ	১৪২-১৫৮

অধ্যায় ১
পেশা ও পেশা হিসেবে শিক্ষকতা

মানুষের জীবনপ্রবাহ শুরু হয় রাষ্ট্রের সীমানায়, জন্মগতভাবে সে থাকে প্রকৃতির সন্তান। কিন্তু একটি পারিবারিক পরিমন্ডলে লালিত হয়ে সে ধীরে ধীরে সামাজিক সত্তায় বিকশিত হয়। তবে কেবল সামাজিকতা রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করার জন্য যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন উৎপাদনশীল নাগরিক, যারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জীবিকার তাগিদে মানুষ যুক্ত হয় কোনো পেশা বা বৃত্তির সাথে। যদিও এই দুটি ধারণা প্রায়শই সমার্থক মনে হয়, কিন্তু এদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং দায়বদ্ধতার নিরিখে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা সকলেই শিক্ষকতা সম্পর্কে অবগত, কিন্তু এটি কি নিছক একটি 'বৃত্তি', নাকি একটি পূর্ণাঙ্গ 'পেশা'? এই প্রশ্নটির স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা অপরিহার্য। শিক্ষকতার স্বরূপ উন্মোচনের জন্য পেশা ও বৃত্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ জানা অত্যন্ত জরুরি। এই অধ্যায়ে, পেশা ও বৃত্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শিক্ষকতার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হবে। একই সাথে, একজন শিক্ষকের আবশ্যিক গুণাবলি, দায়িত্ব-কর্তব্য, শিক্ষকমান এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষকতা পেশার সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি একটি ইতিবাচক ও সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে উৎসাহিত করবে।

পেশার ধারণা

জীবনের তাগিদে এবং অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে একটি মানসম্মত ও আরামদায়ক জীবনযাপনের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। আমরা আমাদের চারপাশের মানুষদের বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত থাকতে দেখি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন নামে চিনে থাকি। যেমন, কৃষক, রাজমিস্ত্রী, কামার, কুমার, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। কিন্তু মজার বিষয় হলো মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকার তাগিদে যে সকল কাজে নিযুক্ত হয় তাদের অধিকাংশই বৃত্তি নামে পরিচিত, তবে কিছু কাজকে (যেমন, শিক্ষকতা, চিকিৎসা প্রকৌশলী ইত্যাদি) পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাহলে পেশা কী? বা কীসের ভিত্তিতে কিছু কিছু কাজকে পেশা বলা হয়? নিম্নোক্ত আলোচনায় বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

'পেশা' শব্দটির উৎপত্তি 'ফারসি' শব্দ থেকে। পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Profession', যার আভিধানিক অর্থ 'জীবন ধারনের বিশেষ উপায়' যা 'বৃত্তি' (occupation) হিসেবে প্রচলিত। মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য যেসকল কাজের সাথে যুক্ত থাকে সেগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে 'পেশা' বলবো? যেমন একজন রাজমিস্ত্রী ও একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ জীবন ধারনের উপায় হলেও রাজমিস্ত্রীর কাজকে পেশা বলা যাবে না বরং তা বৃত্তি হিসেবেই গণ্য হবে। কেন, এমনটা হবে? কারণ, পেশা বলতে ব্যক্তির সেই কাজকেই বুঝায় যেখানে তাকে ঐ নির্দিষ্ট কাজের উপর উচ্চমানের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা থাকতে হয়, যা ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি পেশা পেশাজীবীদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যেমন বাংলাদেশে শিক্ষকতা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, আইন ইত্যাদি পেশা স্ব-স্ব সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বিভিন্ন পন্ডিতজন পেশাকে নানানভাবে বর্ণনা করেছেন। A.E. Ben এর মতে, পেশা হল অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা বা উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের এমন একটি উপায় যার জন্য বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। Wilbert. E. More তাঁর "The Profession: Rules and Rules" গ্রন্থে পেশা বলতে একটি সার্বক্ষণিক কর্মকে বুঝিয়েছেন যা সেবাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় এবং যা সেবাপ্রদান ও দায়িত্বপালনের মাধ্যমে স্বতন্ত্রতা অর্জন করে। সুতরাং, পেশা হল এমন একটি বিষয় যেখানে একজন ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন যা অবশ্যই জনকল্যাণমুখী এবং

পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। পাশাপাশি, পেশা সমাজ ও রাষ্ট্র দ্বারা অবশ্যই স্বীকৃত হতে হবে। যেমনঃ জনাব রহিম একজন আইনজীবী ও জনাব করিম একজন রাজমিস্ত্রী। দুজনই কাজের সাথে যুক্ত কিন্তু করিম সাহেবের কাজকে পেশা হিসেবে গণ্য হবে না কারণ সমাজ রাজমিস্ত্রীর কাজকে পেশা হিসেবে স্বীকৃত দেয় না, সেটা একটা বৃত্তি। তাহলে, কেন আইন পেশা কিন্ত রাজমিস্ত্রী বৃত্তি?। কোন কাজ পেশা হতে হলে অবশ্যই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। পেশার আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

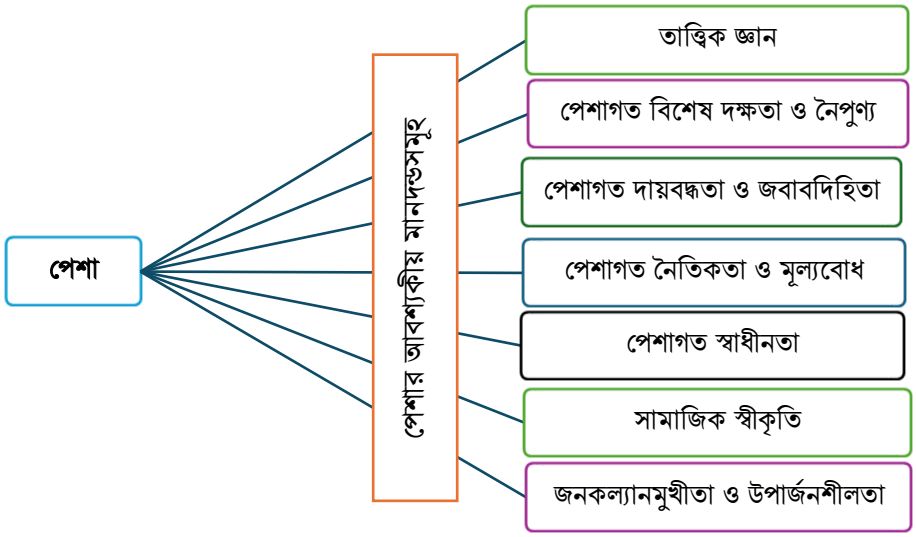

সুতরাং, আমাদের সমাজে প্রচলিত বৃত্তিগুলোর মধ্যে যেগুলো উপরের বৈশিষ্ট্যসমূহ পূরণ করে সেগুলোকে পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পেশা ও বৃত্তি

উপরোক্ত পাঠে আমরা পেশা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি তবে প্রশ্ন হলো, বৃত্তি কী? পেশা ও বৃত্তি কি একই? উত্তর হলো ‘না’। তাহলে কী কারণে বৃত্তিকে পেশা থেকে আলাদা জ্ঞান করা হয়, তা জানা প্রয়োজন। পেশা যেমন জীবিকা অর্জনের উপায়, তেমনি বৃত্তিও তাই। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? কেনইবা সকল পেশাকে বৃত্তি বলা গেলেও সব বৃত্তিকে পেশা বলা যায়না?

ডাক্তার

রিকশাচালক

চিত্রে দুইজন ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে, তাদের একজন ডাক্তার, অপরজন রিকশাচালক। আমরা ভেবে দেখেছি কি, একজন ডাক্তার এবং একজন রিকশাচালককে কেন তাদের পেশার বিচারে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়? উভয়ের কাজই কি পেশা, নাকি শুধুই বৃত্তি? বৃত্তির ধারণাই আমাদের এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট ধারণা দেবে।

'বৃত্তি' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Occupation'। মূলত 'বৃত্তি' বলতে জীবন ধারনের জন্য এমন উপায়কে বুঝায় যার জন্য উচ্চমানের কোন তাত্ত্বিক জ্ঞান বা দক্ষতার প্রয়োজন হয়না। যেমনঃ রিক্সাচালক, গৃহপরিচারিকা, রাজমিস্ত্রী, দারোয়ান, গার্মেন্টস কর্মী, ইত্যাদি। পেশা ইচ্ছা করলেই পরিবর্তন করা যায়না কিন্তু বৃত্তি পরিবর্তন যোগ্য। যেমন- একজন শিক্ষক চাইলেই ডাক্তার হতে পারবেন না কিন্তু একজন রিক্সাচালক চাইলেই দারোয়ানের চাকুরী করতে পারেন। পেশার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাধ্যবাধকতা রয়েছে কিন্তু বৃত্তির জন্য নেই। পেশা সাধারণত পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে মানদন্ড থাকলেও তা পরিবর্তনযোগ্য। বৃত্তি ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। পেশার অন্যতম মানদন্ড হল জবাবদিহিতা আবশ্যক কিন্তু বৃত্তির জন্য এমন নয়। পেশার জন্য সামজিক স্বীকৃতি আবশ্যক কিন্তু কোন বৃত্তিকে আমরা পেশা বলতে পারব না যদি না সেটা সমাজ স্বীকৃত হয়।

উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে পেশা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। পেশা ও বৃত্তির মধ্যকার পার্থক্য নিচে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

পেশা	বৃত্তি
পেশার জন্য সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োজন যা ঐ নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে জানতে হয়।	বৃত্তির জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের আবশ্যকতা নেই।
প্রতিটি পেশার পেশাগত মানদন্ড ও নৈতিক মূল্যবোধ থাকে।	বৃত্তির ক্ষেত্রে মানদন্ড থাকলেও তা অনেক সময় তা ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন হয়।
প্রতিটি পেশার সুসংগঠিত পেশাজীবী সংগঠন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।	বৃত্তির ক্ষেত্রে পেশাজীবী সংগঠনের আবশ্যকতা নেই।
পেশার ক্ষেত্রে জনকল্যানমুখীতা ও জবাবদিহীতা আবশ্যক।	বৃত্তি ব্যক্তির ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই এক্ষেত্রে জনকল্যানমুখীতা ও জবাবদিহীতা নাও থাকতে পারে।
পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সামাজিক স্বীকৃতি।	বৃত্তি কল্যানমুখী হলেও সামাজিক স্বীকৃতি না পাওয়ায় তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হয় না।
ব্যক্তির ইচ্ছায় যেকোন সময় পেশা পরিবর্তন করা যায় না।	ব্যক্তি চাইলেই যেকোন সময় পেশা পরিবর্তন করতে পারেন।
পেশার ক্ষেত্রে টাকার তুলনায় সেবাকে মূখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।	বৃত্তির ক্ষেত্রে টাকা মূখ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে তাহলে আমরা পেশা এবং বৃত্তির মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি কি? পেশা ও বৃত্তির ধারণা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, পেশা এবং বৃত্তি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে কাজ করতে হচ্ছে তবে যে জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে 'বৃত্তি' পরিচালনা করা যায়, তা নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। সুতরাং সব পেশাই বৃত্তি কিন্তু সব বৃত্তি পেশা নয়।

পেশা হিসেবে শিক্ষকতা

'শিক্ষকতা' (Teaching) আমাদের সকলের কাছে খুবই পরিচিত একটি শব্দ। শিক্ষকতা পেশার সাথে নিবেদিত যেকোন ব্যক্তিই শিক্ষক। আদিম বৈদিক যুগে যাকে 'গুরু' বলে অবিহিত করা হতো, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক সমাজে তিনিই 'শিক্ষক' (Teacher)। শিক্ষক তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম গড়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক সমাজের সকলের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল একজন ব্যক্তি। তিনি পরম মমতায়, দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে পড়ে তোলেন। জাতি গঠনের মহান দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত এবং একাডেমিক বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন, তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখান। এজন্যই শিক্ষক জাতি গড়ার কারিগর। একটা জাতি কতটা ভালো তা নির্ভর করে তাঁর নাগরিকরা কতটা ভালো তাঁর উপর, রাষ্ট্রের নাগরিকরা

কতটা ভালো তা নির্ভর করে তাদের শিক্ষা কতটা ভালো তাঁর উপর আর রাষ্ট্রের শিক্ষা কতটা ভালো তা নির্ভর করে তাদের শিক্ষকরা কতটা ভালো তাঁর উপর। সুতরাং, একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষক। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মতোই গতিশীল উপাদান শিক্ষক। শিক্ষক এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, শিক্ষক ছাড়া বিদ্যালয়কে বলা হয়, আত্মা ছাড়া দেহের মতো, রক্ত-মাংস ছাড়া কঙ্কালের মতো, অথবা বস্তু ছাড়া ছায়ার মতো। অর্থাৎ শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা অসম্ভব। শিক্ষার্থী এবং সমাজের কাছে তিনি অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। এজন্য শিক্ষক এবং শিক্ষকতাকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

- **স্যার জন এড্যামস** শিক্ষককে মানুষ গড়ার কারিগর (A maker of men) বলে অবিহিত করেছেন।
- শিক্ষকের বহুমাত্রিক ভূমিকাকে বিবেচনা করে **পার্সিভেল রেন** বলেছেন, শিক্ষক শুধু খবরের উৎস বা ভান্ডার নন, কিংবা প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহকারী নন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও যোগ্য উপদেষ্টা; একজন সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, শিশু-মনের বিকাশ সাধনের সহায়ক তথা তাদের চরিত্র গঠনেরও নিয়ামক।
- **জ্যাঁ জ্যাঁক রুশোর** মতে, শিশুদের জন্য তিন ধরনের শিক্ষক বিদ্যমান তথা, প্রকৃতি, মানুষ ও বস্তু। তাঁর মতে, শিক্ষককে হতে হবে সুশিক্ষিত এবং মনস্তাত্ত্বিক, জীবনতাত্ত্বিক, বস্তুগত ও প্রাকৃতিক শিক্ষানীতিতে বিশ্বাসী।
- দার্শনিক **ফ্রয়েবলের** মতে, শিক্ষকের কাজ ফুলবাগানের মালির কাজের মতো। মালি যেমন চারা গাছের পরিচর্যা করেন, সেটাকে সুপুষ্ট করে বেড়ে উঠতে এবং ফুলে-ফলে সজ্জিত হতে সহায়তা করেন, তেমনিভাবে শিক্ষক কোমলমতি শিশুদের স্বযতনে বেড়ে উঠতে সহায়তে করেন। তাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন, এবং তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত করেন।

শিক্ষক নিজেকে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিনিয়ত নতুনভাবে তৈরি করেন। তাকে তাঁর শিক্ষার্থীদের বুঝতে হয়, তাদের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েই শ্রেণির কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হয়। এজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,

> "একজন সত্যকার শিক্ষক নিজেকে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের পর্যায়ে নিয়ে আসেন, তাঁর অন্তরকে শিক্ষার্থীদের অন্তরে সোপিত করেন, এবং মন দিয়ে দেখেন ও অনুধাবন করেন। এমন একজন শিক্ষকই প্রকৃতপক্ষে ভালো শিক্ষা দিতে পারেন।"

জাতি গঠনের এই দায়িত্বশীল আচরণের কারণেই শিক্ষকতাকে মহান পেশা বলে। তিনি রাষ্ট্রের বৃহৎ স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতাকে আমরা পেশা বলবো কি? যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কেন শিক্ষকতাকে পেশা বলছি? এই পাঠের পূর্ববর্তী অংশে আমরা পেশার মানদন্ড সম্পর্কে জেনেছি। শিক্ষকতা কি পেশার মানদন্ডগুলো পূরণ করে? কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া যাক:

- শিক্ষকতা পেশার জন্য কি আনুষ্ঠানিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে?
- শিক্ষকতা পেশার কি কোন পেশাগত মানদন্ড আছে?
- শিক্ষকতা পেশার জন্য শিক্ষকের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আবশ্যক কি?
- শিক্ষকতা পেশা কি সমাজ স্বীকৃত?
- শিক্ষকতা পেশা কি জনকল্যাণমুখী?
- শিক্ষকতা পেশায় কি জবাবদিহীতা আছে?
- শিক্ষকতা পেশায় কি সুসংগঠিত পেশাজীবী সংগঠন আছে?
- শিক্ষকতা পেশায় কি সেবাকে মূখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে অবিহিত করা যায়। তাহলে প্রশ্ন হলো, শিক্ষকতা কেমন পেশা? সমাজে বিভিন্ন পেশা থাকলেও শিক্ষকতাকে সবচেয়ে মর্যাদাশীল পেশা বলা হয় কেন? আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছি, দিল্লির প্রভাবশালী বাদশা আলমগীর তাঁর পুত্রের শিক্ষককে সমাজের শ্রেষ্ঠতম আসনে সম্মানিত করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তাঁর পুত্রের শিক্ষকের কাছে পত্রের মাধ্যমে শিক্ষকের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে সুস্পষ্ট করেছেন। আমাদের আবহমান সংস্কৃতিতে দেখা যায়, শিক্ষককে সবাই সম্মান দেখান। অর্থাৎ পেশা হিসেবে শিক্ষকতা সম্মানিত এবং গুরত্বপূর্ণ যা অন্য সকল পেশার ভিত্তি গড়ে দেয়।

শিক্ষক একটি জাতির সভ্যতার আলোকে জ্বালিয়ে রাখেন এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জ্ঞান, দক্ষতা, এবং নৈতিকতার সঞ্চালনের মাধ্যমে মাধ্যমে একটি দেশের ভবিষৎ নাগরিকদের প্রকৃত মানবসম্পদ হিসেবে পড়ে তোলেন। পেশাগত জীবনে প্রবেশের পর কঠোর অধ্যবসায় ও নিরলস প্রচেষ্টায় একজন শিক্ষক ধীরে ধীরে সফল শিক্ষক হয়ে উঠেন। এক্ষেত্রে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এই ধারাবিহিক প্রচেষ্টায় তিনি যেমন তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা, ও নৈতিকতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করেন, সামাজিক করে তোলেন, সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল করে তোলেন, তেমনি তাদের নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখার জাতির মেরুদণ্ড তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষক সমাজ যে দর্শন ধারণ করেন সে অনুযায়ী তারা একটি সমাজকে আকার দিতে পারেন। বিশ্বের প্রতিটি জাতির জন্য শিক্ষকদের এই অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি শিক্ষকসমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে শিক্ষকতা পেশা হিসেবে সম্মানীয় ও সমাদৃত।

শিক্ষকতায় শিক্ষকমান

শিক্ষকমান হলো শিক্ষকের পেশাগত পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কিছু আদর্শের (standards) সমন্বয়। যার মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষকের পারদর্শিতার অবস্থা/মাত্রা যাচাই করা হয়। শিখনের ৩টি ক্ষেত্রের (পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন) আলোকে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য মোট ১২ টি এবং সহকারী শিক্ষকদের জন্য ০৯ টি শিক্ষকমান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষকমানের জন্য নির্দেশক ও পরিমাপের জন্য পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

সহকারী শিক্ষকদের জন্য ০৯টি শিক্ষকমান

১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
৭. পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা
৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা
৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার

প্রধান শিক্ষকদের জন্য ১২ টি শিক্ষকমান

১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন

৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
৭. পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা
৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা
৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার
১০. একাডেমিক তত্ত্বাবধান, মেন্টরিং ও মনিটরিং
১১. বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
১২. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব

প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের জন্য প্রণিত প্রতিটি শিক্ষকমানের জন্য প্রণিত পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশকগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের জন্য প্রতিটি শিক্ষকমানের বিপরীতে প্রণিত পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশকগুলো উল্লেখ করা হলো।

শিক্ষকমান ও পারদর্শিতার সূচকঃ সহকারী শিক্ষক (৯টি)

শিক্ষকমান	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক
১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা	১.১ শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা সংবলিত শিক্ষার্থী প্রোফাইল নিয়মিত হালফিল রাখেন; ১.২ শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকেন; ১.৩ শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৪ শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও আচরণ বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৫ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সক্ষমতা, শিখন ঘাটতি ও চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন।
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা	২.১ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ উপর গভীর আস্থা রাখেন; ২.২ শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সহায়তা করেন; ২.৩ শিক্ষার্থীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং ইতিবাচক আচরণ করেন; ২.৪ শিক্ষকের কথা ও আচরণে শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচকতা লক্ষ করা যায়; ২.৫ যেকোন ধরনের বুলিং থেকে শিক্ষক নিজেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন; ২.৬ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন; ২.৭ শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে প্রশংসা করেন।
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা	৩.১ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.২ শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা (শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক) এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৩ পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৪ পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়।
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪.১ শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ উপস্থাপন করেন; ৪.২ পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অনুসারে যথোপযুক্ত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন;

	৪.৩ বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় আইসিটিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি/প্রণয়ন, পরিমার্জন, সংগ্রহ, নির্বাচন এবং যথাযথ ব্যবহার করেন; ৪.৪ পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুমূখী শিখন কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৫ সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৪.৬ বাচনিক ও অবাচনিক কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করেন; ৪.৭ শিক্ষার্থীর চিন্তন অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার কৌশল এবং নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করেন; ৪.৮ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; ৪.৯ চাহিদার বিবেচনায় শিখন-শেখানোর কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর প্রয়োগ করেন; ৪.১০ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা	৫.১ আনন্দদায়ক, ভয়ভীতি ও নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.২ শ্রেণিকক্ষে একীভূত শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.৩ কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করেন; ৫.৪ শিক্ষার্থীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেন; ৫.৫ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করেন।
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন	৬.১ শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক মূল্যায়নে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন; ৬.২ শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত গঠনমূলক ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান করেন; ৬.৩ ধারাবাহিকভাবে শিখন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের লিখিতভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করেন; ৬.৫ মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করেন; ৬.৬ শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করেন; ৬.৭ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং অভিভাবকে অভিহিত করেন।
৭.পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা	৭.১ নিয়মিত নির্ধারিত ছকে স্ব-অনুচিন্তন এবং রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লিখেন; ৭.২ নিয়মিত এ্যাকশান রিসার্চ পরিচালনা করেন (প্রতি বছর ০১টি) ৭.৩ নিয়মিত কেইস স্টাডি পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করেন; ৭.৪ লেসন স্টাডি/টিএসএন/টিএলসি আয়োজন/অংশগ্রহণ করেন (মাসে ০১টি); ৭.৫ সহকর্মীদের পাঠ আগ্রহসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন প্রদান করেন ও নিজের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন; ৭.৬ নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মেন্টরকে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন; ৭.৭ পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা শিখন শেখানো যেকোনো ইতিবাচক পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন; ৭.৮ স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (যেমন, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি); ৭.৯ পরিবর্তিত ও আধুনিক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য নিয়মিত বই, আর্টিকেল, সংবাদপত্র এবং গবেষণাপত্র ইত্যাদি পড়েন।
৮. সকল অংশীজনের সাথে	৮.১ সকল অংশীজন এবং সহকর্মীদগণের সাথে ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখেন; ৮.২ সামর্থ অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেন;

পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা	৮.৩ নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ/উঠান বৈঠক আয়োজন করে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি অবহিত করেন; ৮.৪ নিয়মিত হোম ভিজিটের মাধ্যমে তাদের সন্তান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করেন; ৮.৫ এসএমসি ও পিটিএসহ অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ করেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ৮.৬ অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, SLIP বাস্তবায়ন, উপকরণ সংগ্রহসহ যে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করেন; ৮.৭ সকল অংশীজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন করেন ।
৯.শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার	৯.১ কর্মস্থলের প্রতিটি কার্যক্রমে যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন (আগমন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, প্রস্থানসহ অন্যান্য ইত্যাদি); ৯.২ অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব স্ব-প্রণোদিত ও স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করেন; ৯.৩ প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন; ৯.৪ জরুরি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখেন; ৯.৫ ড্রেস কোড (পোষাক) মেনে চলেন; ৯.৬ পেশাগত জীবনে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রমে সরকারি বিধিবিধান প্রতিপালনসহ স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখেন।

শিক্ষকমান ও পারদর্শিতার সূচকঃ প্রধান শিক্ষক (১২টি)

শিক্ষকমান	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক
১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা	১.১ শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা সংবলিত শিক্ষার্থী প্রোফাইল নিয়মিত হালফিল রাখেন; ১.২ শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকেন; ১.৩ শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৪ শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও আচরণ বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৫ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সক্ষমতা, শিখন ঘাটতি ও চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন।
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা	২.১ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ উপর গভীর আস্থা রাখেন; ২.২ শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সহায়তা করেন; ২.৩ শিক্ষার্থীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং ইতিবাচক আচরণ করেন; ২.৪ শিক্ষকের কথা ও আচরণে শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচকতা লক্ষ করা যায়; ২.৫ যেকোন ধরনের বুলিং থেকে শিক্ষক নিজেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন; ২.৬ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন; ২.৭ শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে প্রশংসা করেন।
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা	৩.১ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.২ শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা (শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক) এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৩ পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৪ পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়।

৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪.১ শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ উপস্থাপন করেন; ৪.২ পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অনুসারে যথোপযুক্ত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৩ বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় আইসিটিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি/প্রণয়ন, পরিমার্জন, সংগ্রহ, নির্বাচন এবং যথাযথ ব্যবহার করেন; ৪.৪ পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুমূখী শিখন কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৫ সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৪.৬ বাচনিক ও অবাচনিক কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করেন; ৪.৭ শিক্ষার্থীর চিন্তন অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার কৌশল এবং নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করেন; ৪.৮ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; ৪.৯ চাহিদার বিবেচনায় শিখন-শেখানোর কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর প্রয়োগ করেন; ৪.১০ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা	৫.১ আনন্দদায়ক, ভয়ভীতি ও নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.২ শ্রেণিকক্ষে একীভূত শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.৩ কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করেন; ৫.৪ শিক্ষার্থীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেন; ৫.৫ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করেন।
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন	৬.১ শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক মূল্যায়নে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন; ৬.২ শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত গঠনমূলক ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান করেন; ৬.৩ ধারাবাহিকভাবে শিখন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের লিখিতভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করেন; ৬.৫ মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করেন; ৬.৬ শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করেন; ৬.৭ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং অভিভাবকে অভিহিত করেন।
৭.পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা	৭.১ নিয়মিত নির্ধারিত ছকে স্ব-অনুচিন্তন এবং রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লিখেন; ৭.২ নিয়মিত এ্যাকশান রিসার্চ পরিচালনা করেন (প্রতি বছর ০১টি) ৭.৩ নিয়মিত কেইস স্টাডি পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করেন; ৭.৪ লেসন স্টাডি/টিএসএন/টিএলসি আয়োজন/অংশগ্রহণ করেন (মাসে ০১টি); ৭.৫ সহকর্মীদের পাঠ আগ্রহসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন প্রদান করেন ও নিজের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন; ৭.৬ নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মেন্টরকে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন; ৭.৭ পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা শিখন শেখানো যেকোনো ইতিবাচক পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন; ৭.৮ স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (যেমন, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি); ৭.৯ পরিবর্তিত ও আধুনিক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য নিয়মিত বই, আর্টিকেল, সংবাদপত্র এবং গবেষণাপত্র ইত্যাদি পড়েন।

৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা	৮.১ সকল অংশীজন এবং সহকর্মীদগণের সাথে ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখেন; ৮.২ সামর্থ অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেন; ৮.৩ নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ/উঠান বৈঠক আয়োজন করে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি অবহিত করেন; ৮.৪ নিয়মিত হোম ভিজিটের মাধ্যমে তাদের সন্তান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করেন; ৮.৫ এসএমসি ও পিটিএসহ অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ করেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ৮.৬ অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, SLIP বাস্তবায়ন, উপকরণ সংগ্রহসহ যে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করেন; ৮.৭ সকল অংশীজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন করেন ।
৯.শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার	৯.১ কর্মস্থলের প্রতিটি কার্যক্রমে যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন (আগমন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, প্রস্থানসহ অন্যান্য ইত্যাদি); ৯.২ অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব স্ব-প্রণোদিত ও স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করেন; ৯.৩ প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন; ৯.৪ জরুরি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখেন; ৯.৫ ড্রেস কোড (পোষাক) মেনে চলেন; ৯.৬ পেশাগত জীবনে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রমে সরকারি বিধিবিধান প্রতিপালনসহ স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখেন।
১০. একাডেমিক তত্ত্বাবধান, মেন্টরিং ও মনিটরিং	১০.১ শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের একাডেমিক তত্ত্বাবধান করেন; ১০.২ শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের মেন্টরিং করেন; ১০.৩ শিক্ষকদের শ্রেণিপাঠ পর্যবেক্ষণ করেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করেন; ১০.৪ নিজের বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সহকর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন; ১০.৫ সহকর্মীদের কার্যক্রম মনিটরিং করেন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
১১. বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক ও আর্থিক	১১.১ বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় করেন; ১১.৮ সহকারি শিক্ষকগণের জন্য ইন-হাউস প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন; ১১.৯ কার্যকরভাবে নিজ বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন; ১১.২ ই-প্রাইমারি, এপিএসসি, শিশু জরীপ, হোমভিজিট, শিশু ভর্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ সকল তথ্য হালফিল রাখেন; ১১.৩ সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মহোদয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করেন; ১১.৪ বিদ্যালয় পর্যায়ে আনুসঙ্গিক, (SLIP), প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, ওয়াসব্লক মেরামতকরণ, পয়ঃনিস্কাশন, রুটিন মেইনটেইনেন্স ও ক্ষুদ্র সংস্কার ও মেরামতের জন্য বরাদ্ধকৃত অর্থ বিধি মোতাবেক ব্যয় করেন। ১১.৫ সরকার কর্তৃক বরাদ্ধকৃত উপবৃত্তির অর্থ বিধিমোতাবেক বিতরণের জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন; ১১.৬ সরকার থেকে প্রাপ্ত ও অন্যান্য যেকোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের জন্য খরচ করেন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন; ১১.৭ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত সকল নির্দেশনা মেনে চলেন।
১২. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব	১২.১ বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সকলের নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন; ১১.২ সহকারি শিক্ষক শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে টিম স্পিরিটে কাজ করেন; ১১.৩ বিধি মোতাবেক সহকর্মী শিক্ষক ও কর্মচারীর ছুটি ব্যবস্থাপনা করেন; ১২.৪ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের মাসিক বেতন প্রাপ্তির জন্য মাসিক রিপোর্ট প্রণয়ন করেন; ১২.৫ স্টুডেন্ট কাউন্সিল, কাবদল গঠন, খুদে ডাক্তার দল, হলদে পাখির দল গঠন করে তাদের কার্যক্রম নিশ্চিত করেন; ১২.৫ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন।

প্রাথমিক স্তরে যথাযথভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিকের একজন প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের অবশ্যই উল্লেখিত শিক্ষকমানগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। শিক্ষকমানের ধারণা শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী:

একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থী এবং সমাজের সকলের কাছে অণুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সাধারণত একজন আদর্শবান মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। শিক্ষককে কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হয় যা তাকে সমাজের অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। শিক্ষার্থীরা একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলীসমূহ অনুসরণ ও অনুকরণ করে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। শিক্ষককে একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে হয়ে উঠতে হয় যাকে শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের আচরণ ও ব্যক্তিত্বকে সেভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করে যেমনটা তাঁরা তাঁদের শিক্ষকের নিকট থেকে দেখে বা নির্দেশনার মাধ্যমে শেখে। সেজন্য একজন আদর্শ শিক্ষকের বেশ কিছু গুণাবলী থাকতে হয়। একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রধান গুণাবলীসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- সুস্পষ্ট বিষয়জ্ঞান
- আচরণিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ
- মোহনীয় ব্যক্তিত্ব
- গঠনমূলক ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- পেশাগত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
- সময়ানুবর্তিতা
- দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা
- স্ব-শিখন মনোভাব ও অধ্যয়নশীলতা
- উদ্ভাবনের দক্ষতা
- সহযোগিতার মনোভাব
- যোগাযোগ দক্ষতা
- সৃজনশীলতা
- তথ্য ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সমন্বয়ের দক্ষতা
- উপস্থাপন দক্ষতা
- পক্ষপাতহীন মনোভাব
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রীক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা
- উপকরণ প্রণয়ন ও সংরক্ষণের দক্ষতা
- প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ দক্ষতা
- প্রতিফলনমূলক জার্নাল ব্যবহারের দক্ষতা
- শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক পার্থক্য নিরূপণ দক্ষতা
- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন দক্ষতা
- শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা

- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন দক্ষতা
- মূল্যায়ন দক্ষতা
- নেতৃত্বের দক্ষতা
- দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতা
- অভিযোজনের দক্ষতা, ইত্যাদি।

একজন শিক্ষককে ধীরে ধীরে শিক্ষকতার গুণাবলীসমূহ তথা একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলীসমূহ অর্জন করতে হয়। কথিত আছে, 'Teachers like poet, they are born not made' অর্থাৎ কবির ন্যায় শিক্ষকও জন্ম গ্রহণ করেন, তাকে তৈরি করা যায় না'। কথাটি প্রকৃত অর্থে অনার্থক। একজন শিক্ষককে শুধুমাত্র সহজাত প্রতিভার অধিকারি হলে হয় না, তাঁকে নিয়মিত অধ্যবসায় ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষকতার উপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা এবং পেশার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে।

শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য আলোচনায় যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মাথায় চলে আসে তা হলো, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর দায়িত্ব পালন করেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করেন। শিক্ষকের দায়িত্ব কি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে তথা শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ? শিক্ষকের দায়িত্ব কি শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি উৎসাহিত করা? নাকি শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষের বাইরে কিংবা বিদ্যালয়ের বাইরে কোন দায়িত্ব আছে? শিক্ষকতার আধুনিক ধারণায় শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিসর ব্যাপক। একবার চিন্তা করুনতো, শিক্ষককে যেহেতু জাতি গড়ার কারিগর বলা হয়, তিনি যদি শুধুমাত্র বিদ্যালয় পরিমন্ডলের মধ্যেই তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে জাতি গঠনের মহান দায়িত্ব পালন সম্ভব কি? উত্তর না হলে, কেন?। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষককে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। শিক্ষককে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে হলেও সাধারণত পাঁচটি ক্ষেত্রে শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্বকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষকের এই দায়িত্ব শুধুমাত্র তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

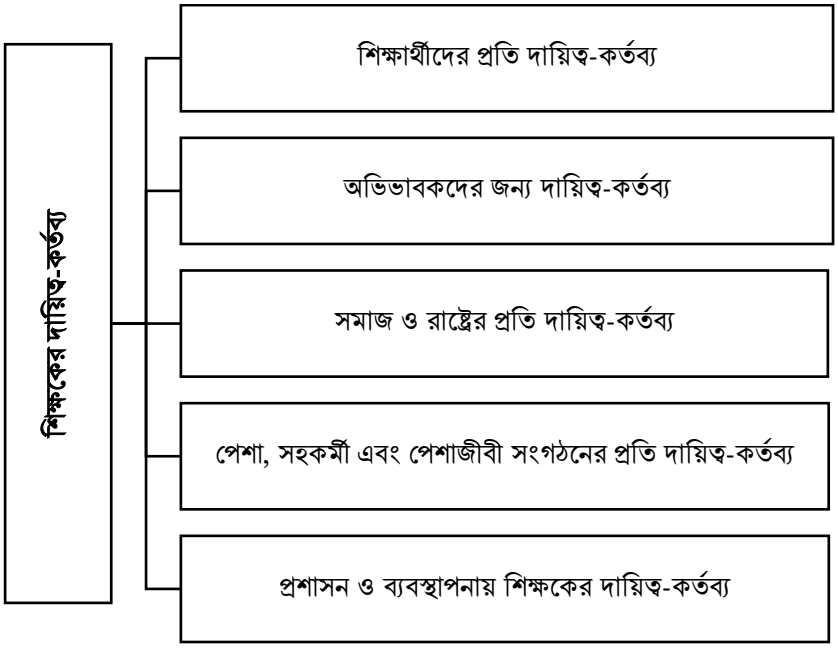

শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শিখনে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেন শিক্ষক। শিক্ষক একই সাথে জ্ঞানের সঞ্চালক, রোল মডেল, সহায়ক, সমঝোতাকারী এবং সহ-শিক্ষার্থী হিসেবে দা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার্থীদের শিখন-শিখনে শিক্ষকের বহুমাত্রিক দায়িত্ব পালন করতে হয় যা ইতোপূর্বে শিক্ষকমানে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শিখনে শিক্ষককে নানামুখী ভূমিকা পালন করেন।

- শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ঠ সকল কাজে সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা
- কোন পাঠ পড়ানোর পূর্বে সেই পাঠের বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ি শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- সকল শিক্ষার্থীকে সমান স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বিবেচনা করা এবং কোন অবস্থাতেই (বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারিরীক বা মানসিক অবস্থা এবং জন্ম স্থান বিবেচনায়) কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ না করা।
- একীভূত শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্রতাকে বিবেচনা করে উপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা।
- শিক্ষার্থীদের শারিরীক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, নৈতিক এবং আধ্যাতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত শিখন চাহিদা এবং তাদের পারস্পরিক পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে পারা এবং সে অনুযায়ি শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা।
- নিয়মিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনা করা এবং শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার আলোকে ফলাবর্তন প্রদান বা নিরাময়মূলক শিখন-শেখানো কৌশল অনুসরণ করা।
- শুধুমাত্র বিশেষ শর্তাধীনে প্রতিকারমূলক শিখন ব্যতিত শিক্ষার্থীদের থেকে কোন প্রকার সম্মানি গ্রহণ না করা।
- শুধুমাত্র বৈধ অভিভাবক ব্যতিত শিক্ষার্থীদের যেকোন ধরনের গোপন তথ্য অন্য কারো সাথে প্রকাশ না করা।
- শিক্ষার্থীদের তাদের সহপাঠী, শিক্ষক অথবা প্রশাসনের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া থেকে বিরত থাকবেন।
- শিক্ষক নিজের পোষাক, ভাষা ও আচরণের ক্ষেত্রে নিজেকে শিক্ষার্থীদের সামনে অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করবেন।
- বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের আত্ন-মর্যাদাকে সম্মান করবেন।

অভিভাবকদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের অভিভাবকদের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিম্নে অভিভাবকদের প্রতি শিক্ষকদের দায়িত্ব-কর্তব্য তুলে ধরা হলো।

- শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা/অভিভাবকের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সবলতা এবং দুর্বলতা সম্পর্কে অভিভাবকদের নিয়মিত অবহিত করা।
- এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকা যা অভিভাবকদের সামনে শিক্ষার্থীদের আত্ন-বিশ্বাসকে কমিয়ে দেয়।
- সন্তানদের সময় দেওয়া এবং তাদের ভালো কাজকে উৎসাহিত করতে অভিভাবকদের সচেতন করা।
- সন্তানদের তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সেগুলোর নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন কতে উৎসাহিত করা।

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

শিক্ষক জাতি গড়ার কারিগর এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের ভিত রচনা করেন। তিনি সমাজ সংস্কারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সমাজ থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি শিক্ষকের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

- মানবসম্পদ উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে তথা জ্ঞান, তথ্য বিতরণ এবং দক্ষতা এবং আচরণ উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে নিয়োজিত থাকা।
- সামাজিক সমস্যাসমূহ অনুধাবনে সচেষ্ট হওয়া এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের উপযোগী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতির মাত্রা কমাতে সহায়তা করা।
- এমন কোন কর্মকান্ডে যুক্ত না হওয়া যা বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্মীয় বা ভাষা গোষ্টীর অনুভূতিতে আঘাত হানে বা তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে।
- তিনি নিজেকে কোন সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ রাখবেন না, বরং একটি অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের জন্য তিনি সকলের জন্য আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখবেন।
- জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে সক্রিয়ভাবে কাজ করা।
- জাতীয় দিবসসমূহ পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।
- বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয় উন্নয়নে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সেই লক্ষে শিক্ষক সকলের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রাখবেন যাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ বিদ্যালয় উন্নয়নে স্বতঃস্ফুতভাবে অংশগ্রহণ করেন।
- বর্তমান সময়ে কিশোর অপরাধ অনেক বেড়েছে। এই কিশোর অপরাধ প্রবনতা কমিয়ে আনতে এবং সামজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শিক্ষক অংশীজনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের সংস্কৃতির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।
- বিদ্যালয়, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির প্রতি সম্মান ও দায়িত্বশীল আচরণ করা।
- সমাজের মানুষকে দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতন করা।

পেশা, সহকর্মী এবং পেশাজীবী সংগঠনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

শিক্ষক হিসেবে একজন শিক্ষককে তাঁর পেশা, সহকর্মী এবং পেশাজীবী সংগঠনের প্রতি তাদের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। নিচে আলাদা করে সহকর্মী ও পেশা এবং পেশাজীবী সংগঠনের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য তুলে ধরা হলো।

ক সহকর্মী ও পেশার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

- তিনি তাঁর অন্য সহকর্মীদের সাথে এমন আচরণ করবেন যেমনটা তিনি তাঁর নিজের জন্য অন্যদের থেকে আশা করেন।
- সহকর্মী বা উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক কোন অভিযোগ গঠন থেকে বিরত থাকবেন।
- পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেমনঃ চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, কনফারেন্স, বা পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থী, অন্য কোন সহকর্মী, উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবকদের সামনে এমন কোন কথা বলবেন না যাতে তাঁর নিজের সহকর্মীর সম্মানহানি হয়।

- একাডেমিক এবং সহশিক্ষাক্রমিক সকল কাজে বিদ্যালয়ের মধ্যে বা বিদ্যালয়ের বাইরে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সহকর্মীদের সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথাযথ পন্থায় কর্তৃপক্ষকে অবগত করা।

খ পেশাজীবী সংগঠনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য

- বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করা এবং পেশাদার আচরণ আয়ত্ব করা।
- পেশাজীবী সংগঠনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম নির্ধারণে অংশগ্রহণ করা এবং সংগঠনের সক্ষমতা ও একতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- সকল পরিস্থিতিতে সংগঠনের নীতিমালা অনুযায়ি কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকদের বেশ কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। যেমনঃ

- নিজ পেশায় তাঁর টেকসই উন্নয়নে নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বিভাগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা।
- সকল পরিস্থিতিতে প্রচলিত আইন ও বিধি মেনে চলা।

শিক্ষককে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক বলা হয়। আর পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন একজন শিক্ষক তাঁর পেশার প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করবেন এবং পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন। পেশা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা এবং পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই একজন ব্যক্তিকে আদর্শ শিক্ষকে পরিণত করে।

শিক্ষকতা পেশার সীমাবদ্ধতাসমূহ

মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথেই সীমাবদ্ধতা শব্দটি জড়িত। ব্যক্তিগত কিংবা বস্তুগত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই সীমাবদ্ধতা থাকে। সীমাবদ্ধতা প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে একটি দেয়াল হিসেবে কাজ করে। যার একপাশে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা আর অপ্রাপ্তিগুলো নিয়ে চলতে থাকি দেয়ালের অন্যপ্রান্তের দিকে যেখানে আমাদের গন্তব্য। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় দেয়াল হয়ে দাড়িয়ে থাকা কিছু সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতাগুলো যেমন প্রত্যাশা পূরণে বাধা হয়ে দাড়ায় ঠিক তেমনি আবার ব্যক্তিকে বা ব্যবস্থাকে সর্বদা সক্রিয় রাখে তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো জয় করতে। শিক্ষকতা যদিও জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশা তথাপি অন্যান্য সকল পেশার মতো শিক্ষকতা পেশায়ও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

বাংলাদেশের শিক্ষকতা পেশার অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো মানবসম্পদের সীমাবদ্ধতা। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা স্তর পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা কম যা শিক্ষকতা পেশার অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা। প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় শ্রেণিকক্ষের আকার তথা ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত (student-teacher ratio) যৌক্তিক সংখ্যার (জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর সুপারিশ) তুলনায় অনেক বেশি। ফলে শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হয় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয় যা অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি, যুগের সাথে শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিয়েও সীমাবদ্ধতা আছে যা তাঁদের আর্থ-সামজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করছে। শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনে বিভিন্ন যুগোপযুগি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান থাকলেও গুনগত মনিটরিং-এর ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু বিষয়ে বিশেষ করে একীভূত শিক্ষা, শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নে ডোমেইনের ব্যবহার, মূল্যায়নে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত দুর্বলতা বিশেষ করে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য যে ধরনের অবকাঠামো প্রয়োজন তা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই নেই। অনেক স্কুলে প্রাক-

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের উপযোগী টয়লেট নেই যা খুবই অসুবিধা তৈরি করে। ফলে শিক্ষকদের সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সমস্যা পোহাতে হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক চর্চা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অভিভাবকদের সহযোগিতা, অংশীজনদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উদাসীনতা শিক্ষকতা পেশার অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত।

জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ এদেশে গুনগত শিক্ষা প্রসারে বাধা হয়ে আছে। এগুলো সমাধান না করলে শিক্ষা ক্ষেতের বৈষম্য প্রকট আকার ধারন করবে। যাদের টাকা আছে আর যাদের টাকা নেই তাদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য দেখা যাবে। সুতরাং বিদ্যমান সমস্যাসমূহের আশু সমাধান করা প্রয়োজন।

শিক্ষকতা পেশার সীমাবদ্ধতাসমূহ উত্তোরণের উপায়

জাতি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষকতা পেশার উপরে উল্লেখিত সীমাবদ্ধতাসমূহ সমাধান করা জরুরি। নিম্নে শিক্ষকতা পেশার সীমাবদ্ধকাসমূহ সমাধানের উপায়সমূহ তুলে ধরা হলো।

- শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর যুগোপযোগী করাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের (দেশে এবং বিদেশে) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাস ও কাজের চাপ কমাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও সহায়ক জনবল নিয়োগ দিতে হবে।
- তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক পদক্ষেপ নিতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিভাবকদের যোগাযোগ বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট আলোচনায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রীক উন্নয়নের লক্ষে এবং শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও নিরাপদ করার জন্য বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষকদের পেশাগত ও শিখন-শেখানো সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে তা সরলীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সকল ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে।
- পেশার প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে তাদের নিয়মিত মূল্যায়নের এবং পুরষ্কারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষকতা পেশা তবে কোন সাধারণ পেশা নয়। যেকোন জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশা হলো শিক্ষকতা। জাতির অন্যতম পথপ্রদর্শক। সুতরাং, শুধুমাত্র জাতি গঠনে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে ভূমিকা রাখতে চান শুধমাত্র তাদেরকেই শিক্ষকতা পেশায় আশা উচিত। শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকার পাশাপাশি তাদেরকে অবশ্যই শিক্ষকতা পেশার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে। তার উপর অর্পিত আমানত হিসেবে জাতি গঠনের এই মহান দায়িত্ব যেকোন পরিস্থিতিতে তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। তার কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখনোর দায়িত্ব হবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষতা, নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা ও যথাযথ জবাবদিহিতা যেকোন জাতিকে উন্নতির সঠিক পথে পরিচালিত করে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং শিক্ষকতা একটি মহান ও শ্রেষ্ঠ পেশা।

সহায়ক তথ্যপত্র

মালেক, ড. আব্দুল, বেগম, ড. মরিয়ম, ইসলাম, ড. ফখরুল, ও রিয়াদ, শেখ শাহবাজ (২০১৫)। শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ শিক্ষা (৫ম সংস্করণ)। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

উদ্দিন, মোঃ আয়েজ, ও দাস, সুভাষ চন্দ্র (২০১৪)। শিক্ষাদর্শন (৩য় সংস্করণ)। উপমা প্রকাশন, ঢাকা।

রায়, সুশীল (২০২২)। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন (ষোড়শ সংস্করণ)। সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা।

রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর (২০১৬)। প্রারম্ভিক শিক্ষাবিজ্ঞান। প্রভাতী লাইব্রেরি। ঢাকা।

Mangal, S.K. & Mangal, S. (2019). Learning and Teaching. PHI Learning Private Limited, Delhi.

Nag, S., & Nag, Dr. S. (2017). Pedagogy of Science Teaching: Life Science. Rita Book Agency, Kolkata.

Mangal, S.K. & Mangal, U. (2014). Essentials of Educational Technology. PHI Learning Private Limited, Delhi.

অধ্যায় ২
শিক্ষার মৌলিক ধারণা

শিক্ষা একটি ব্যাপক এবং জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যা মূলত একটি সামাজিক প্রপঞ্চ। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। শিক্ষা মানবসত্তাকে প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে সামাজিক ও মানবিক সত্ত্বায় উন্নীত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা নিছক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি মানুষের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও বৈদ্ধিক (বা বুদ্ধিবৃত্তিক) বিকাশের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষা ব্যক্তিকে তাঁর জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, আত্ম-উন্নয়নের পথ প্রদর্শন করে এবং জাতির অগ্রগতির জন্য অনিবার্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। শিক্ষা ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ প্রদানের মাধ্যমে তাকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অধ্যায়ে শিক্ষার মৌলিক ধারণা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে শিক্ষার সংজ্ঞা ও ধারণা-র পাশাপাশি এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মৌলিক উপাদান, কার্যাবলী, ধারা (ধরন) ও স্তরসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তদুপরি, শিক্ষাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা যথাযথ উদাহরণের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার ও গভীর ধারণা লাভে সক্ষম হয়।

শিক্ষার ধারণা

জ্ঞানই শক্তি। আর জ্ঞান অর্জনের অন্যতম উপায় হলো 'শিক্ষা' লাভ করা। শিক্ষা শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত কিন্তু আদৌ কি আমরা শিক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানি? শিক্ষা মানে কি শুধুই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কোন কিছু শেখা বা জানা? শিক্ষা মানেই কি শুধুমাত্র কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ালেখা শেষ করে সার্টিফিকেট অর্জন করা? সার্টিফিকেট থাকলেই কি শুধুমাত্র কোন ব্যক্তিকে শিক্ষিত বলা যাবে? যে কৃষক কোনদিন বিদ্যালয়ে যাননি তিনি কি কোন শিক্ষা লাভ করেন নি? যে মা'র কোন সার্টিফিকেট নেই তাকে কি শিক্ষিত বলা যাবে না?। শিক্ষার সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের উপরের প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদানে সাহায্য করবে। সুতরাং, শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক যা নিচে বিস্তারিত অলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা মানুষের জীবনব্যাপি একটি প্রক্রিয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ 'শাসন করা, নির্দেশ দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা, শৃঙ্খলিত করা, তিরস্কার করা, নির্দেশনা দেওয়া, শাস্তি দান। প্রাচীন ভারতীয় মুণি, ঋষিরা শিক্ষা বলতে কঠোর নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করাকে বুঝাতেন যার মাধ্যমে যেমন জ্ঞান অনুশীলন করা যায় তেমনি ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ সাধন করা যায়। সুতরাং শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। শিক্ষা শব্দের সমার্থক শব্দ বিদ্যা। 'বিদ্যা' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে যার অর্থ 'জানা' বা 'জ্ঞান আহরণ করা'। সুতরাং, ব্যুৎপত্তিগতভাবেও শিক্ষা মানে জ্ঞান অর্জন করা।

শিক্ষা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education', যার উৎপত্তি কয়েকটি ল্যাটিন শব্দ থেকে। সেগুলো হলো Educatum, Educere, Educare, Educo। ল্যাটিন শব্দ 'Educatum' এর অর্থ হলো শিক্ষা দান করা, শিক্ষাকর্ম বা শিক্ষকতা। এখানে শিক্ষা বলতে শিক্ষকতার নীতি ও পদ্ধতিকে বুঝায়। কারো কারো মতে Education শব্দটি ল্যাটিন 'Educare' থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার ভাবার্থ হল 'to lead out' বা 'to draw out'। এখানে শিক্ষা বলতে মূলত শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ সাধনকেই বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ 'Education' শব্দটি ল্যাটিন 'Educere' থেকে উৎপন্ন বলে মনে করেন যার ভাবার্থ হলো 'to bring up' অথবা 'to train' অথবা 'to mould' অর্থাৎ শিক্ষা বলতে শিশুকে 'লালন করা' বা 'প্রশিক্ষণ দেওয়া' বা কোন পূর্ব পরিকল্পনার আদলে তৈরি করাকে বুঝায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন ল্যাটিন 'Educo' থেকে 'Education' শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ 'পরিচালিত করা' বা 'বের করা' অর্থাৎ প্রতিভাকে বের করা। উপরের শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে 'Education' শব্দটি দ্বারা ব্যক্তির সহজাত বুদ্ধি বা প্রতিভাকে

বিকশিত করা বোঝায়। ব্যাপক অর্থে বলা যায়, ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ তথা শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, আধ্যাত্মিক বা দক্ষতার বিকাশের জন্য বা সমাজে টিকে থাকার জন্য বা মানিয়ে নেয়ার জন্য মানুষ যে জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত্ব করছে তাই শিক্ষা। এখন তাহলে উপরের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে ভাবুনতো?

ধরা যাক, কাশেম এবং রঞ্জন দুই বন্ধু। ছোট বেলা থেকেই তাদের একসাথে বেড়ে উঠা। কাশেম সম্প্রতি কৃষিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেছেন কিন্তু তাঁর বন্ধু রঞ্জন কৃষি কাজের সাথেই যুক্ত এবং বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল ফলায় কিন্তু সে কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি তথা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট নেয়নি। কাশেম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বা আধুনিক কৃষির কৌশলসমূহ আয়ত্ত করেছে, ডিগ্রী লাভ করেছে এবং তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু, রঞ্জনের ক্ষেত্রে কি হলো, তিনি কি কোন শিক্ষা লাভ করেননি? কোন কিছু না জেনেই বা কোন কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়াই কি তিনি বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করছেন? অবশ্যই না। তাকেও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে না শিখলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্যান্য কৃষকদের থেকে নানান বিষয় বা কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে। যার ফলে তিনি নানান ধরনের ফসল ফলাতে পারেন এবং কৃষিতে অবদান রাখতে পারছেন। তাহলে এখানে, আমরা কি শুধু কাশেম কেই শিক্ষিত বলবো নাকি কাশেম এবং রঞ্জন উভয়কেই শিক্ষিত বলবো?

শিক্ষার উৎপত্তিগত এবং বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দক্ষতার বিকাশের জন্য বা সমাজে টিকে থাকার জন্য বা মানিয়ে নেয়ার জন্য মানুষ যে জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করছে তাই শিক্ষা। সুতরাং, সেই অর্থে কাশেম এবং রঞ্জন উভয়েই শিক্ষা লাভ করেছে এবং তারা শিক্ষিত। অর্থাৎ শিক্ষা শুধু প্রতিষ্ঠান নির্ভর নয় বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে মানুষ নিজ প্রচেষ্টাতেই বিভিন্ন সুঅভ্যাস গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। তাই বলা হয়, স্বশিক্ষিত মানুষ মাত্রই শিক্ষিত। অর্থাৎ যে মা কখনো বিদ্যালয়ে জাননি তথাপি তিনি তাঁর সন্তানদের শেখান সদা সত্য কথা বলতে হয়, খাওয়ার আগে হাত ধুতে হয়, সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, পড়ার সময় পড়তে হয়, গুরুজনদের সম্মান করতে হয়, বিপদে অন্যকে সাহায্য করতে হয়, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা যায় না ইত্যাদি। মায়ের নির্দেশনা সন্তানকে সুঅভ্যাস গঠনে সাহায্য করে। শিক্ষা দার্শনিক রুশো বলেন, সুঅভ্যাস গঠনের নাম শিক্ষা। 'মা' তাঁর সুঅভ্যাসগুলো সন্তানের মধ্যে সঞ্চালন করেন। সুতরাং মা শিক্ষিত। মা তাঁর সন্তানকে যে অভ্যাসগুলো শিখিয়েছেন বা রঞ্জন যে দক্ষতা অর্জন করেছেন তাঁর সবগুলো সমাজের জন্য কল্যাণকর। অর্থাৎ, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে ইতিবাচক সামাজিক আচরণ তৈরি হয়। কেউ কেউ শিক্ষাকে এই বলে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন যে, ব্যক্তির অর্জিত সেই আচরণই শিক্ষা যা সমাজ কাঙ্ক্ষিত, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং ইতিবাচক। তবে সমাজ কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি বিতর্কিত। শিক্ষা সমাজ কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শেখায় আবার শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। তা না হলে সমাজে আজও ওলা বিবি'র (কলেরার জীবাণু) বিশ্বাস চলমান থাকতো, এখনো কলেরায় গ্রামের পর গ্রামের মানুষ পানিশূন্যতায় মারা যেত, আজও নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতো, আজও ডোবায় জ্বলে উঠা আগুনকে মানুষ ভূতের আগুন বলেই বিশ্বাস করতো। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, মানুষের আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং ইতিবাচক পরিবর্তনই শিক্ষা যা সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। সুতরাং শিক্ষা হলো শিখন (learning) প্রক্রিয়ার ফসল। আর শিখন হচ্ছে তাই যা কোন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত সচেতন বা অবচেতন মনে যা কিছু শিখছে তাই শিখন। কিন্তু সকল শিখনই কি শিক্ষা?

শিক্ষার ধারণায় স্পষ্ট হয়েছে যে, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। নেতিবাচক আচরণ শিক্ষা নয়। আমরা প্রত্যাহিক জীবনে মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে বলতে শুনি, 'লোকটার শিক্ষা হয়নি'। কখনো ভেবে দেখেছি কি, কেন এমনটা বলে? হয়ত লোকটা কোন অসামাজিক বা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে, যা তাঁর করা উচিত হয়নি। কিন্তু যে আচরণটি তিনি করেছেন তা অবশ্যই কোন না কোন জায়গা থেকে শিখেছেন। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুরা কথা বলার সময় এমন কিছু অশালীন ভাষা ব্যবহার করে যা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বাবা-মা বিব্রত বোধ করেন। ভাবেন, কোথা থেকে শিখলো? আমরাতো শেখায় নি। আপনার বেখেয়ালে বা অজান্তে আপনার শিশু আপনার অসচেতন কথোপকথন বা বিভিন্ন নাটক-সিনেমায় ব্যবহৃত অশোভন ভাষা শুনে শিখে ফেলেছে। ভাবুনতো, যে ব্যক্তি

সুকৌশলে আপনার প্যান্ট বা পাঞ্জাবির পকেট থেকে মানিব্যাগটি বের করে নিলো, তাকেও কিন্তু শিখতে হয়েছে এই কৌশলটি। আবার যে শিশুটি বড়দের দেখলে সালাম দেয় বা ময়লা দেখলে তা তুলে নিকটস্থ ডাস্টবিনে ফেলে দেয়, আবার যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বা বৃক্ষ নিধনের বিরুদ্ধে কথা বলে সেও কিন্তু এই অভ্যাসগুলো আয়ত্ত করেছে বা শিখেছে। আমরা কি তাহলে সবার আচরণকেই শিক্ষা বলবো? সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের যাচাই করতে হবে, উল্লেখিত আচরণগুলোর মধ্যে কোনগুলো ইতিবাচক আর কোনগুলো নেতিবাচক। ব্যক্তি যে আচরণগুলো আয়ত্ত করেছে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো ইতিবাচক সেগুলো শিক্ষা আর যেগুলো নেতিবাচক সেগুলো শুধুই শিখন, শিক্ষা নয়। সুতরাং বলা যায়, সকল শিক্ষাই শিখন কিন্তু সকল শিখন শিক্ষা নয়।

উপরের আলোচনায় আমাদের কাছে শিক্ষার ধারণা স্পষ্ট হলেও আমাদের মনে কোন প্রশ্ন এসেছে কি? কাশেম এবং রঞ্জন উভয়কেই শিক্ষিত বলছি যদিও কাশেম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছে অন্যদিকে রঞ্জনের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তাহলে শিক্ষার ধারণায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কি আলাদা কোন গুরুত্ব নেই? অবশ্যই আছে, যার আলোকে শিক্ষার ধারণাকে দুইটি বিশেষ চেতনায় ভাগ করা হয়।

(১) বিস্তৃত অর্থে শিক্ষা
(২) সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা

বিস্তৃত অর্থে শিক্ষাঃ ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে জীবনব্যাপী শিক্ষাকে বুঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তি প্রতিনিয়ত তাঁর নিকট পরিবেশ থেকে বিভিন্নভাবে শেখে। সে শিখছে তথা নানান আচরণ আয়ত্ত করছে। সেগুলোর মধ্যে হয়ত কিছু ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক। তথাপি কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, বাংলাদেশের শিক্ষার হার কত? বা বাংলাদেশের শিক্ষিত জনসংখ্যার হার কত? আপনি কী উত্তর দিবেন? ৭৯% বা ৮০% বা ৮২% বা অন্য কিছু। হ্যাঁ, বলতে পারেন। কিন্তু, আপনার ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার বিস্তৃত অর্থে 'অশিক্ষিত' বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ সকলেই শিক্ষিত। সুতরাং, সঠিক উত্তর হবে ১০০%। শিক্ষার বিস্তৃত ধারণায় অশিক্ষিত শব্দের কোন প্রয়োগ নেই। বিস্তৃত বা ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

- শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, মানুষ সারা জীবন বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত শেখে।
- শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার সংগঠন, যা তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলতে ও সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।
- শিক্ষা একটি মানবীয় প্রক্রিয়া, ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় ও নিজ প্রচেষ্টায় শিখতে হয়।
- শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের সামগ্রিক বিকাশ সাধন অর্থাৎ শিক্ষা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, আধ্যাতিক বা দক্ষতার বিকাশ সাধন করে।
- ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শুধু প্রতিষ্ঠান সর্বস্য নয়, প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতাও শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়।
- শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং শিক্ষা সমাজ সংস্কার ও সংরক্ষণ করে।
- শিক্ষা বাস্তব সমস্যার সমাধান করে।
- শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী আচরণ, যার মূল লক্ষ্য মানুষের মুক্তি।
- শিক্ষা হলো নির্দেশনা, যার আলোকে ব্যক্তিকে সুঅভ্যাস গঠন ও চর্চার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
- শিক্ষা হলো সঙ্গতি বিধান করা যেখানে সমাজিক কৃষ্টি, প্রথা এগুলোর সাথে যেমন মানিয়ে চলতে হয়, তেমনি সমাজে বিদ্যমান অসঙ্গতিগুলো সমাধানে কাজ করতে হয়।
- শিক্ষা মানুষের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রীক নয় এবং ব্যক্তি যেকোন উৎস থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারে তাই কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম থাকে না।

শিক্ষার বিস্তৃত ধারণাকে বিবেচনা করে বিভিন্ন যুগের শিক্ষাচিন্তাবিদগণ শিক্ষাকে নানানভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবীদ সক্রেটিস এর মতে,

"মিথ্যার অপনোদন ও সত্যর আবিস্কারই হল শিক্ষা।"

বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর মতে,

"শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি"।

শিক্ষা দার্শনিক এরিস্টটল বলেন,

"সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নাম শিক্ষা"।

শিক্ষা মনোবিদ জন ফেডারিক হারবার্ট এর মতে,

"শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন"।

শিক্ষা মনোবিদ জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী বলেন,

"শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম, ও প্রগতিশীল বিকাশ"।

শিক্ষা মনোবিদ মন্তেসরির মতে,

"শিক্ষার্থীর নৈতিক ও শারীরিক বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা"।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ইমান্যুয়েল কান্ট এর মতে,

"আদর্শ মনুষ্যত্ব অর্জনই হলো শিক্ষা"।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার ধারণা শিক্ষার বিস্তৃত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষার সংকীর্ণ বা সংক্ষিপ্ত অর্থে মানুষদের 'শিক্ষিত' এবং 'অশিক্ষিত' এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এই ধারণা অনুসারে তাদেরকেই শিক্ষিত বলা হয়, যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে। আর যাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদেরকে 'অশিক্ষিত' বলা হয়। এখানে স্বশিখনকে শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ফলে শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণা অনুযায়ি, সকল মানুষ শিক্ষিত নয়। এখানে একটা দেশের জনসংখ্যাকে সাক্ষর ও নিরক্ষর এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে এবং যারা মাতৃভাষায় মনের ভাব লিখে প্রকাশ করতে পারে, মাতৃভাষায় কোন লেখা পড়ে বুঝতে পারে এবং মাতৃভাষায় দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে পারে তারাই সাক্ষর বা Literate। আর যাদের এই সক্ষমতা নেই তারা নিরক্ষর (Illiterate)। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

- শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান বা দক্ষতাই শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
- শিক্ষা একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- এখানে শিক্ষা স্তর ভিত্তিক এবং শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ ও সামর্থ্যকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার স্তর ভিত্তিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় সনদ প্রদান করা হয় তথা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি থাকে।
- সাক্ষরতাই শিক্ষার মূল নির্দেশক। যাদের সাক্ষর জ্ঞান থাকে অর্থাৎ 3Rs (Reading skills, Writing Skills, Arithmetic Skills) থাকে শুধুমাত্র তারাই শিক্ষিত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর যাদের মধ্যে সাক্ষরতা নেই তারা নিরক্ষর হিসেবে বিবেচিত হয়।
- এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রীক বিধায় নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম থাকে।
- সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা জীবনব্যাপী নয় বরং বিদ্যালয় জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

অর্থাৎ বিস্তৃত এবং সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার ধারণার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। তথাপি, বিস্তৃত অর্থে সকল মানুষ অর্থাৎ যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়েছে বা নেয়নি তারা উভয়ই শিক্ষিত কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে শুধুমাত্র যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছে এবং যাদের সাক্ষরতার দক্ষতা আছে তারাই শিক্ষিত।

শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:

শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানুষের জীবনের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা অর্থাৎ ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, আধ্যাত্মিক ও দক্ষতার বিকাশের মাধ্যমে তাকে যুগের সাথে মানানসই একজন দক্ষ ও উৎপাদনশীল মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। শিক্ষা ব্যক্তিকে যেকোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকার উপযোগী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিন্তু এক বিষয় নয়। লক্ষ্য শিক্ষা ব্যবস্থার কোন একটি স্তরের সাধারণ গন্তব্য নির্দেশ করে যা সাধারণত ঐ স্তর শেষে অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। ফলে লক্ষ্য হয় বিস্তৃত এবং এটা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য। উদ্দেশ্য সাধারণত লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই বাস্তবতার নিরিখেই নির্ধারণ করা হয় যা অবশ্যই অর্জনযোগ্য হয়ে থাকে। তথাপি যুগের বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের চাহিদার নিরিখে যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানবসম্পদ পড়ে তোলার বিষয়টি শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

শিক্ষা যেহেতু মানুষের জন্য সেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় মানুষের প্রয়োজনকে বিবেচনা করে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল হকের মতে, "কোন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা সে সমাজের সামগ্রিক জীবনযাত্রা প্রণালী ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি। ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য, কাঠামো ও মান নির্ণীত হয়"। যেহেতু সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদায় নতুনত্ব আসে সেহেতু যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় ও বৈশ্বিক চাহিদা বিবেচনায় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্ব দেযা হয়।

- জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষা
- মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষা
- সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য শিক্ষা
- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশের জন্য শিক্ষা
- সুঅভ্যাস গঠনের জন্য শিক্ষা
- দেশত্ববোধ বিকাশের জন্য শিক্ষা
- বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশ এবং অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল নাগরিক তৈরির জন্য শিক্ষা
- সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শিক্ষা
- সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য শিক্ষা
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য শিক্ষা
- সামাজিক দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষা
- বৈজ্ঞানিক দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষা
- বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা, ইত্যাদি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশসমূহও বিবেচনা করা হয়। যেমন একবিংশ শতাব্দির শিক্ষা কেমন হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা কেন শিখবে বা শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে সে সম্পর্কে UNESCO কর্তৃক গঠিত Delor's Commission তাঁদের Learning: The Treasure Within (শিখন: অন্তর্নিহিত সম্পদ) শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে শিক্ষার চারটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলোঃ (১) জানার জন্য শেখা (Learning to know); (২) বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা (Learning to be); (৩) করার জন্য শেখা (Learning

to do); এবং (৪) মিলে মিশে বসবাস করার জন্য শেখা (Learning to live together)। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৪নং লক্ষ্যে শিক্ষা নিয়ে বলা হয়েছে এবং তাতে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করা হয়েছে সবার জন্য একীভূত, গুনগত এবং জীবনভর শিক্ষা। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যার আলোকে শিক্ষার স্তর ভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো-

শিক্ষার লক্ষ্যঃ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ আনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে যে বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। একই সাথে দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষা ব্যবস্থা পড়ে তোলা। উপরোক্ত বিষয়গূলো মাথায় নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনশীল, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
- মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বপরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- জ্ঞানভিত্তিক, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

- শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
- সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাথ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলীক বিষয়ে পাঠদান।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।
- শিক্ষার প্রতিটি স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদাসঙ্গাক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- সর্বস্তরে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উতসাহী করা এবং মৌলিক গান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
- পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিক বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।
- দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।
- সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।
- দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকা গুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর আলোকে বাংলেদেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ, ও আগ্রহকে এবং সময়, সমাজ, স্তানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদাকে বিবেচনা করে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যার আলোকে বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যার আলোকে পরবর্তিতে ঐ স্তরসমূহের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাঃ কোমলমতি শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্বে অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা আরম্ভ করার আগে তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপার বিস্ময়বোধ, কৌতূহল, আনন্দবোধ, মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেজন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন। এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন।
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃংখলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাঃ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিশুর জন্য মৌলিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করে। অনেকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই সর্বশেষ শিক্ষা, এরপর তারা কর্মে নিযুক্ত হয় এজন্য ৬$^{+}$- ১১$^{+}$ বয়সসীমার সকলের জন্য গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও রাষ্ট্রের প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের জন্য নিম্নোক্ত লক্ষ্য- উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ কর হলোঃ

- মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাথ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।
- কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্ঠাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহজ জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে পড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উতসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
- শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদা জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।
- সবধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে উপরে উল্লেখিত শিক্ষার লক্ষ্য, প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখুন, কিছু কি উপলব্ধি করেছেন? লক্ষ্যসমূহ ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা

যায়, শিক্ষার উল্লেখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রেক্ষিতে উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহের সাথে বেশ প্রাসাঙ্গিক।

শিক্ষার উপাদান:

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া এবং এটি একটি জাতির পরিচায়ক। শিক্ষা কোন একক বিষয় নয় বরং বেশ কিছু বিষয় এর সুসংগঠিত রূপ। শিক্ষা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরস্পর নির্ভরশীল কিছু উপাদানের প্রয়োজন, যেগুলোকে শিক্ষার উপাদান বলে। শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান রয়েছে যেমন-শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, পরিবেশ, বিদ্যালয়, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি। তবে কিছু উপাদান আছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে শিক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। উপাদানগুলো হলোঃ

- শিক্ষক
- শিক্ষার্থী
- শিক্ষাক্রম, এবং
- পরিবেশ

শিক্ষার্থীঃ আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উপাদান শিক্ষার্থী। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা আবর্তিত হয় শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে। শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হলো শিক্ষার্থীর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। মানব শিশু জন্মগতভাবে শিক্ষার্থী কারণ জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত সে শিখতে থাকে যা তাকে প্রাকৃতিক মানুষ থেকে সামজিক সত্ত্বা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তথাপি, নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী যারাই অধ্যয়ন করে তাদের শিক্ষার্থী বলে। একজন শিক্ষার্থী তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরে নতুন নতুন জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করে যা তাকে ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। একজন শিক্ষার্থীর কাছে এই শিক্ষা প্রক্রিয়াটি উদ্দেশ্যমূলক এবং এটি তার আগ্রহের জায়গাকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে।

শিক্ষকঃ শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি একটি জাহাজের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে শিক্ষক হবেন সেই জাহাজের নাবিক। নাবিক যেমন দায়িত্ব নিয়ে যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেন, তেমনি শিক্ষকের সঠিক ও গঠনমূলক নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্য পূরণের পথকে প্রসস্থ করে দেয়। শিক্ষকের হাতেই গড়ে উঠে একটি সমৃদ্ধ জাতি। শিক্ষককে এজন্য জাতি গড়ার কারিগর বলা হয়। শিক্ষকতা পেশার প্রতি আগ্রহী সঠিক জ্ঞান, দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন শিক্ষক বহুমাত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন। তিনি একাধারে একজন মডেল, শিল্পী, গাইড, এবং সহায়ক। বর্তমানে শিক্ষককে সহ-শিক্ষার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শিক্ষাক্রমঃ শিক্ষাক্রম হল একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার রূপরেখা বা পরিপূর্ণ পরিকল্পনা। শিক্ষাক্রমকে বাদ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা যায় না। শিক্ষাক্রম অবশ্যই লিখিত হতে হয় এবং সেটা পরিবর্তনশীল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক অনেকের কাছে শিক্ষাক্রম বলতে শুধুমাত্র কিছু পাঠ্যবিষয় মনে হলেও বর্তমানে শিক্ষাক্রমের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উপাদান চারটি। যথা উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও মূল্যায়ন। এই চারটি উপাদানই যে শিক্ষার কোন একটি স্তরের সামগ্রিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের ধারণা স্পষ্ট হবে। প্রশ্নগলো হলো-

- শিক্ষার্থীরা কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবে?
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে কী শিখবে?
- শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিখবে?
- কীভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন পারদর্শিতা যাচাই করা হবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার উদ্দেশ্যসহ তাদের অর্জন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের বর্ণনা দেয়া থাকে। শিক্ষাক্রম সুস্পষ্ট করে বলে দেয়, শিক্ষা আসলে কেমন হবে: শিক্ষককেন্দ্রীক হবে নাকি শিক্ষার্থীকেন্দ্রীক হবে। শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথকে সুগম করে দেয়।

পরিবেশঃ শিক্ষার অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষার্থীর শিখনে সাধারণত দুই ধরনের পরিবেশের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। যথাঃ (১) ভৌগোলিক পরিবেশ এবং (২) সামাজিক পরিবেশ।

(১) ভৌগলিক পরিবেশঃ শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশই তাঁদের ভৌগোলিক পরিবেশ। শিশুর শিক্ষার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন কি? উত্তর হ্যাঁ হলে, কী ধরনের প্রভাব আছে তা চিন্তা করুন। পরিবেশভেদে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে কারণ ভৌগোলিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তিকে প্রভাবিত করে ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে তাঁরা বিভিন্ন ভাবে শেখে । পরিপাটি, সুশৃঙ্খল এবং সহায়ক পরিবেশ শিশুর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

(২) সামাজিক পরিবেশঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে সামজিক পরিবেশ বলতে বিদ্যালয়ের ভিতরের ও বাইরের পরিবেশকে বুঝায়। বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ৩টি ক্ষেত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো মূলত বিদ্যালয়ের ভিতরের এবং বাইরের সামাজিক উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। ক্ষেত্রগুলো হলোঃ (১) ভৌত অবকাঠামোগত ক্ষেত্র (২) শিক্ষামূলক ক্ষেত্র (৩) সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র। নিচে প্রতিটি ক্ষেত্রের উপাদানসমূহ ছক আকারে তুলে ধরা হলোঃ

ভৌত অবকাঠমোর ক্ষেত্র	শিক্ষামূলক ক্ষেত্র	সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র
• বিদ্যালয়ের অবকাঠামো • শ্রেণিকক্ষের আয়তন • সুরক্ষা ও নিরাপত্তা	• শিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা মান • অভিভাবক সমাবেশের মান • নিয়মিত মনিটরিং • নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা • সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম • পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস	• অংশীজনদের পারস্পরিক ইতিবাচক সম্পর্ক (শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী,শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক, বিদ্যালয়-কমিউনিটি, ইত্যাদি) • সমতা নিশ্চিতকরণ • গণতন্ত্র ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ • ভালো কাজ বা কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান।

শিক্ষার উল্লেখিত উপদানসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল এবং উপাদানগুলোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় একটি কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

শিক্ষার উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

শিক্ষার উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য আমরা নিচের চিত্রটি বিশ্লেষণ করি।

উপরের ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? একটি বাস একটি রাস্তা ধরে চলছে। বাসে কী কী আছে? একজন চালক, বাস ভর্তি যাত্রী। বাসের ভিতরে এবং বাইরের পরিবেশটা চমৎকার। চালক রাস্তা ধরে যাত্রীদের গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। বাস চালকের লক্ষ্য কী? অবশ্যই যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। আচ্ছা, নিচের প্রশ্নগুলো ভাবুন:

- যদি গাড়িতে চালক না থাকতো তাহলে কী হতো?
- যদি গাড়ীতে কোন যাত্রী না থাকতো তাহলে কী হতো?
- যদি রাস্তাটা না থাকতো বা চালক রাস্তা অনুসরণ না করতেন তাহলে কী হতো?
- যদি বাসের ভিতরের বা বাইরের পরিবেশ অনিরাপদ বা অস্বাস্থ্যকর হতো, তাহলে কী হতো?

হ্যাঁ, আমরা বুঝতেই পারছি চালক না থাকলে গাড়িটি চালানোর কেউ থাকতো না, যাত্রীরা না থাকলে বাসটি স্টেশন থেকে ছাড়ার প্রয়োজন হতো না, রাস্তা না থাকলে গাড়িটি চালানো যেত না বা রাস্তাটি যথাযথভাবে অনুসরণ না করলে গাড়িটি নিশ্চিত দুর্ঘটনায় পড়ত ফলে যাত্রীরা নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌছাতে পারতো না। বাসের ভিতরের বা বাইরের পরিবেশ যদি স্বাস্থ্যকর বা নিরাপদ না হতো তাহলে যাত্রীরা এবং চালক কেউই নিরাপদবোধ করতেন না ফলে তাদের যাত্রা সুখকর হতো না। উপরের প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো থেকে আমরা কী কিছু বুঝতে পেরেছি? ছবিটির প্রতিটি উপাদান পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। একটি ছাড়া অন্যটি চলবে না বা অর্থহীন। এখন উপরের ঘটনাকে যদি আমরা শিক্ষার উপাদানগুলোর সাথে তুলনা করি তাহলে কার সাথে কার মিল করে সাজিয়ে দেখি।

উপরের চিত্র →	শিক্ষা ব্যবস্থা
চালক	পরিবেশ
যাত্রী	শিক্ষাক্রম
রাস্তা	শিক্ষক
বাস (বাসের ভিতর ও বাহির)	শিক্ষার্থী

উপরের ছবিটি যদি শিক্ষা ব্যবস্থা হয়, চালক যদি শিক্ষক হন, যাত্রীরা যদি শিক্ষার্থী হন, রাস্তা যদি শিক্ষাক্রম হয় এবং বাসের ভিতর এবং বাইরের পরিবেশ যদি শিক্ষার পরিবেশ হয় তাহলে চিত্রের প্রতিটি উপাদান যেমন পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ঠিক তেমনি শিক্ষার প্রতিটি উপাদানও পরস্পর-পরস্পরের সাথে ওতপ্রতভাবে সম্পর্কিত। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে তা উপস্থাপন করা হলোঃ

প্রশ্ন	শিক্ষার উপাদান
কে শেখাবেন?	শিক্ষক
কাকে শেখাবেন?	শিক্ষার্থীকে
কীসের আলোকে শেখাবেন?	শিক্ষাক্রম অনুসারে (কেন শেখাবেন, কী শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
কোথায় শেখাবেন?	একটি সুন্দর পরিবেশে।

উপরের ছক থেকে স্পষ্ট যে, শিক্ষার উপাদানসমূহ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষার কার্যাবলী:

শিক্ষার সমস্ত আয়োজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যেখানে ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নয়নকে বিবেচনা করা হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিকে তার পারিপার্শ্বিকতার নানান পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যেগুলো মোকাবেলা করার জন্য তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে হয়। ব্যক্তির এই সামগ্রিক পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে শিক্ষা। ব্যক্তি জীবনের সাথে যেসকল ক্ষেত্রের সম্পর্ক আছে তার প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে শিক্ষা আলোচনা করে। সুতরাং শিক্ষার কার্যাবলীও

বহুমাত্রিক এবং শিক্ষার কাজের পরিধি যেমন ব্যক্তি জীবনের সর্বত্র তেমনি শিক্ষা দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান জগতের প্রতিটি বিষয়ে বিস্তৃত। শিক্ষার কাজের পরিধি নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

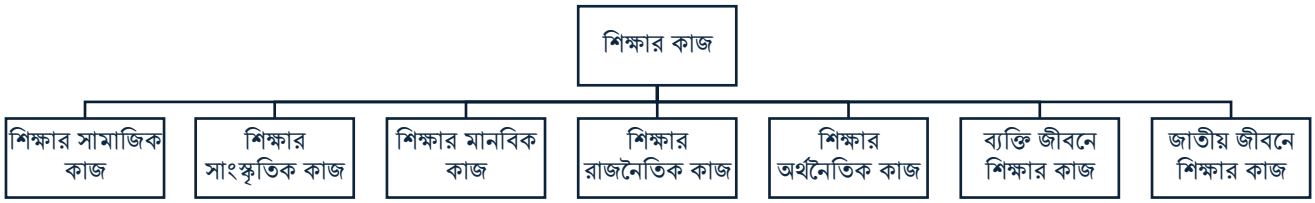

উপরে উল্লেখিত কাজগুলোর মধ্যে ব্যক্তি এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষার কাজের পরিধি ব্যাপক। যদি ব্যক্তি জীবনের সাথে শিক্ষার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক কাজের সরাসরি সম্পর্ক আছে তথাপি ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার কাজকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হলো। ব্যক্তি জীবনে শিক্ষার প্রধান প্রধান কাজসমূহ নিম্নরূপ।

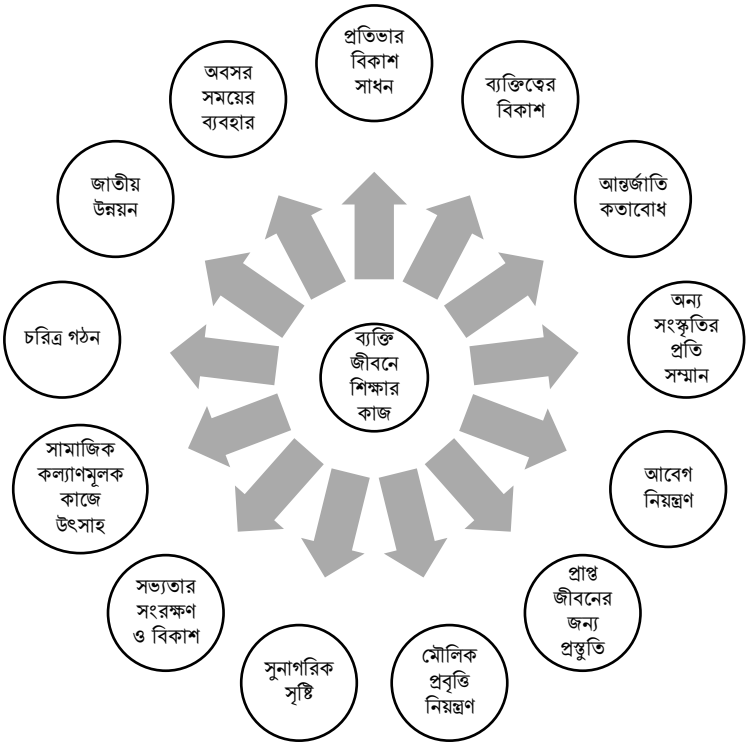

চিত্রঃ ব্যক্তি জীবনে শিক্ষার কাজ

ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি জাতীয় জীবনেও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে জাতীয় জীবনে শিক্ষার প্রধান প্রধান কাজসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

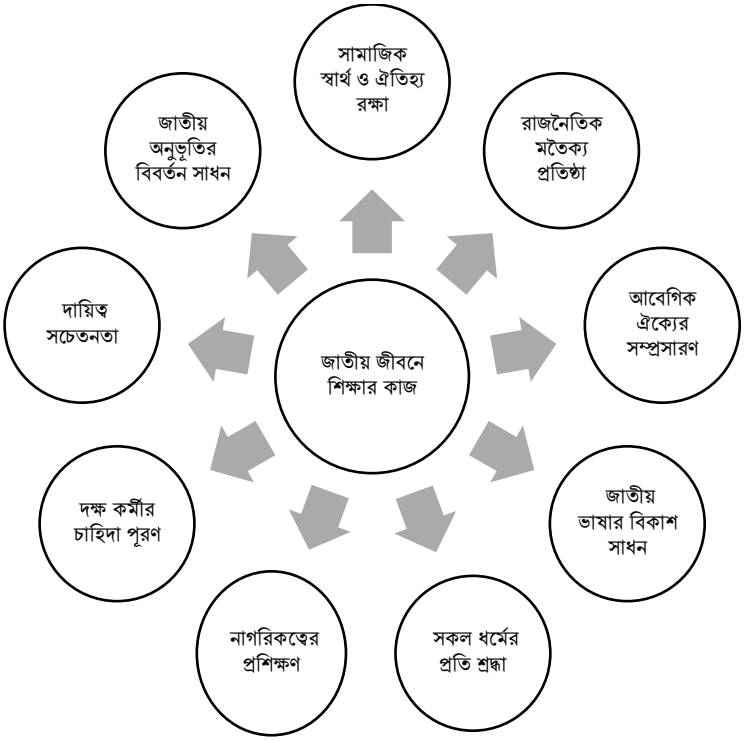

চিত্রঃ জাতীয় জীবনে শিক্ষার কাজ

শিক্ষার ধারাসমূহ:

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, একজন মানুষ জীবনে চলার পথে দেখে-শুনে, ঠেকে-ঠকে, প্রয়োজনে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করে বা শেখে যা তার আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় এবং যা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করে তাকেই শিক্ষা বলে। ব্যক্তির এই শিখন প্রক্রিয়া জন্মের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়। এবার আপনার নিজের কাছে নিচের প্রশ্নগুলো করুন,

- আপনার জীবনে প্রথম শেখা শুরু হয়েছিল কোথায়?
- আপনি কখন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন? কেন ভর্তি হয়েছিলেন? বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বে আপনি কোন কিছু কীভাবে শিখেছিলেন?
- আপনার কি এমন কাউকে জানেন, যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় লিখতে পারে না, বা পড়তে পারে না বা তার প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে করতে পারে না?

আমাদের সকলের জীবনে প্রথম শিক্ষা শুরু হয় আমাদের পরিবারে। ব্যক্তি প্রথমে তার পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে তথা পিতা-মাতার মাধ্যমে শিখতে শুরু করে যা তার আচরণকে পরিবর্তন করে। একটি স্বাধীন পরিবেশে শিশু তার নিজের মতো করে পিতা-মাতা,পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাধ্যমে সামাজিক আচরণ করতে শেখে। এই স্বাধীন পরিবেশে সে তার পরিবারের বাইরেও নিকট পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত শেখে এবং এই প্রক্রিয়া আজীবন চলতে থাকে। এখানে কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা নেই, নেই কোন কঠোর নিয়ম-নীতি। এরপর একসময় একটা নির্দিষ্ট বয়সে তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। সেখানে একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নির্দেশনায় এবং সহযোগীতার অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করে যা তাকে আবশ্যকীয় জীবন দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, আমাদের আশে-পাশে এমনও অনেক ব্যক্তি থাকেন যাদের হয়ত কখনো বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি বা ভর্তি হলেও শেষ করার আগেই নানান কারণে ঝড়ে পড়েছেন ফলে সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। তাদের জন্যে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্দ্যোগে শিক্ষার

বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয় যাতে তাঁরা সাক্ষরতার দক্ষতাসহ অন্যান্য দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পান। এখানেও শিক্ষার্থীকে কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হয়, তবে বয়স এক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নয়। যেকোন বয়সের যে কেউ এই শিক্ষা নিতে পারেন।

অর্থাৎ, উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ব্যক্তি প্রথমে তার পরিরার থেকে, তারপর সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শেখে। পাশাপাশি যাদের প্রয়োজন তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে কখনো সাক্ষরতা বিকাশের জন্য বা অন্য দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। ব্যক্তি জীবনে শেখার এই প্রক্রিয়াগুলোর অলোকে শিক্ষাকে ৩টি ধারায় ভাগ করা হয়।

- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal education)
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal education), এবং
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal education)।

নিম্নে শিক্ষার ধারা সমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলঃ

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

ব্যক্তি জীবনে শিক্ষার সূত্রপাত হয় এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইন দু'টি ভালো ভাবে লক্ষ্য করুন,

> "বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র
> নতুনভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবা-রাত্র"

কবিতার এই দুই লাইনে কবি যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হলো, আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় শিখছি। এখানে কোন শিক্ষাক্রম নেই, কোন নির্দিষ্ট শিক্ষক নেই, কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। এটাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এটা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার একটি বিপরীত রূপ। এটা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা বা নিয়ম-কানুন নেই। মানুষ তার জীবন থেকে প্রতিনিয়ত যা শিখছে তাই হল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারা। যেমন, একজন শিশু যখন পৃথিবীর বুকে আসে তখন সে থাকে প্রাকৃতিক কিন্তু সে ক্রমেই অনেক সামাজিক নিয়ম-কানুন, আদব, আচার-ব্যবহার আয়ত্ব করে এবং আস্তে আস্তে সমাজের একজন সদস্য হয়ে উঠে। অর্থাৎ, এটি এমন একটি শিক্ষা ধারা যা ব্যক্তির জন্মের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং মৃত্যুর মাধ্যমেই সমাপ্তি হয়। বিভিন্ন শিক্ষাবীদ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে নানানভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলোঃ

অধ্যাপক আবু হামিদ লতিফের মতে,

> 'জন্মলগ্ন হতে শুরু করে জঈবন ব্যাপী দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ দেখে, শুনে, আনুকরণ করে, এবং ঠেকে ঠকে যা শিখে, তাই হলো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।'

অধ্যাপক আব্দুল মালেক ও অন্যান্য তাদের বইতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন,

> 'প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবহির্ভূত শিক্ষা ধারাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা'

অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং আব্দুস সালাম এর মতে,

> 'মানুষের জন্মলগ্ন হতে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবার, পরিবেশ, প্রকৃতি, ও সমাজ হতে জীবনব্যাপী যে শিক্ষা অর্জন করে তাকেই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে'

সুতরাং, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনব্যাপী এবং মানুষ প্রতিনিয়ত এই শিক্ষা ধারার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে শিখছে।

নিচে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলঃ

- এই শিক্ষা জীবনব্যাপী চলমান।
- এই শিক্ষা ধারায় কোন সুনির্দিষ্ট বিদ্যালয় শিক্ষক কিংবা শিক্ষাক্রম নেই।

- এই শিক্ষায় শিখন পারদর্শিতার আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা হয় না।
- এই শিক্ষা বহুলাংশে অভিজ্ঞতাভিত্তিক যেখানে ব্যক্তি দেখে, শুনে, ঠেকে ঠকে, করে বা অনুকরণের মাধ্যমে শেখে।
- এই শিক্ষায় ব্যক্তি তার পরিবার, সমাজ, নিকট পরিবেশ, গণমাধ্যম বা বিভিন্ন মিডিয়া (অনলাইন, প্রিন্টিং বা সোস্যাল মিডিয়া) থেকে শেখে।
- ব্যক্তি সামাজিকীকরণের মূল শিক্ষা অর্জন করে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায়। তার খেলার সাথীরা তার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখে।
- এই শিক্ষা ধারায় কোন সনদ প্রদান করা হয় না।
- ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ শিক্ষাই অর্জিত হয় অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায়।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা ধারা। এই শিক্ষা ধারা সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ভর। সুতরাং, আমরা জীবনে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা লাভ করি তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এখানে নির্দিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম থাকে এবং এই শিক্ষা নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

প্রাচীন আমলে শিক্ষা ছিল মূলত ধর্ম কেন্দ্রিক। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, মিশরীয়, চৈনিক, পারস্য ও ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তখনকার দিনে ধর্মগুরুদের তত্বাবধানে এই ধর্মালয়গুলো পরিচালিত হত। ধর্ম শিক্ষার বাইরে পার্থিব শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় প্রাচীন গ্রীকের এথেন্সে মহান গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর হাত ধরে। তার প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর প্রথম বিদ্যালয় অ্যাকাডেমি (Oucadamy)। পরবর্তিতে প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল প্রতিষ্ঠা করেন পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় 'লাইসিয়াম (Lycium)' যা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তিতে ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশের মাধ্যমে আধুনিক যুগের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং, সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ব্যবহার করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। এ শিক্ষা সুনির্দিষ্ট কাঠামোভিত্তিক। বিভিন্ন শিক্ষাবীদ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

Ivan Elich এর মতে,

"Formal education means the education gained in structured school setting"

Chandra & Sharma এর মতে,

"The formal compresence education as it is provided in educational institutions according to a particular pattern"

অধ্যাপক আব্দুল মালেক ও অন্যান্য এর মতে,

"সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিক্ষা ধারাই হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা"।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করছি তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এখানে শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে চলতে হয় অন্যথায় সে সেই প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা

লাভ করতে পারেনা। যেমনঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি। এই শিক্ষা ধারার বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলঃ

- এই শিক্ষা স্তরভিত্তিক।
- এই শিক্ষা শ্রেণী ভিত্তিক হয়।
- এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক, রয়েছে সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী।
- এটি সনদ ভিত্তিক শিক্ষা ধারা।
- এই শিক্ষা কাঠামো অনমনীয় ।
- এর শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পূর্ব নির্ধারিত থাকে।
- এই শিক্ষা ধারায় নির্দিষ্ট বয়সের বাইরে অংশগ্রহণ করা যায়না।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

সাধারণত শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা নানা সমস্যার কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের জন্য এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারা। এই শিক্ষায় বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোন বয়সের যেকোন ব্যক্তি এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এই শিক্ষাও প্রতিষ্ঠান নির্ভর এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মতো শিক্ষক ও শিক্ষাক্রম থাকে। তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক হলেও তা নমনীয় প্রকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দলের চাহিদা অনুসারে পরিকল্পিতভাবে প্রবর্তিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষাবীদ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে নানানভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

অধ্যাপক আবু হামিদ লতিফ এর মতে,

> “আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী দলের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই হল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা”

অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমানের মতে,

> “Non-formal education denotes any deliberately organized systematic educational activities outside the graded age specific and certificate oriented time bounded formal system”

অধ্যাপক আব্দুল মালেক ও অন্যান্য এর মতে,

> “আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অনমনীয় বাধ্যবাধকতা ও নিয়মনীতির বাইরে সুনির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই হল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা”

সুতরাং, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পূরক শিক্ষাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। নিম্নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- এটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- পরিকল্পিত কিন্তু নমনীয়
- এই শিক্ষা ধারা স্তর ভিত্তিক নয়।
- এতে শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনটা রয়েছে।
- এই শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট লক্ষ্য দল কেন্দ্রিক।

- তুলনামূলকভাবে এই শিক্ষায় ব্যয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে কম।

অনানুষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক, ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ধারণা গুলো স্পষ্ট করা হলো।

সূচক	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা	আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
লক্ষ্যদল	সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যদল নেই।	নির্দিষ্ট বয়স ভিত্তিক লক্ষ্যদল।	নির্দিষ্ট লক্ষ্যদল থাকে।
বয়স	কোন নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই এই শিক্ষার শিক্ষার্থী।	স্তর ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট বয়স থাকে।	কোন সুনির্দিষ্ট বয়স সীমা থাকে না।
নিয়ম-নীতি	সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-নীতির কোন প্রয়োজন হয় না।	সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির প্রয়োজন এবং নিয়মের ক্ষেত্রে খুব কঠোর।	সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি থাকে তবে তা নমনীয়।
পরিসর	এ শিক্ষার পরিসর জীবনব্যাপী।	এ শিক্ষার পরিসর ব্যাপক প্রতিষ্ঠান নির্ভর।	এ শিক্ষার পরিসর সংক্ষিপ্ত এবং লক্ষ্যদল ভিত্তিক।
প্রতিষ্ঠান নির্ভরতা	কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন নেই।	সুনির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।
ব্যয়	কোন ব্যয় নেই।	ব্যয়বহুল।	অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল।
শিক্ষাক্রম	কোন শিক্ষাক্রম নেই।	সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম থাকে।	সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম থাকে।
শিক্ষক	কোন নির্দিষ্ট শিক্ষক নেই। পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা শিক্ষক হিসেবে কাজ করে।	নির্দিষ্ট শিক্ষক থাকে।	নির্দিষ্ট শিক্ষক থাকে।
শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা	শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।	শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা কম থাকে।	শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।
মূল্যায়ন	কোন কাঠামগত মূল্যায়ন নেই।	সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত মূল্যায়ন আছে।	মূল্যায়ন আছে।
সনদ	কোন সনদ প্রদানের সুযোগ নেই।	সনদ প্রদান করা হয়।	সনদ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান যে কাঠামোটি আমরা দেখছি তা সুদীর্ঘ সময়ের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফসল। এটি মূলত বৃটিশ শাসন পূর্ববর্তী পাশ্চত্য প্রভাব মুক্ত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, মিশনারী শিক্ষা, বৃটিশ শাসনাধীন পাশ্চত্য শিক্ষা ব্যবস্থা, এবং বৃটিশ পরবর্তী পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ব্যবস্থারই সম্মিলিত ফল। বৃটিশ শাসন পরবর্তী পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৮ সালে গঠিত শরীফ কমিশনে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, নারী শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কমিশনসমূহের ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ পর্যন্ত বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি রিপোর্টে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা শিক্ষার কাঠামো নিয়ে বিভিন্ন সুপারিশ করা। বাংলাদেশের শিক্ষার প্রধান স্তর তিনটি। যথা-

- প্রাথমিক শিক্ষা
- মাধ্যমিক শিক্ষা
- উচ্চশিক্ষা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে আবার প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক এই দুই স্তরে ভাগ করা হয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে আবার তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। তথা (১) নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি); (২) মাধ্যমিক শিক্ষা (৯ম-১০ম শ্রেণি); (৩) উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলত তিন ধরনের শিক্ষা চলমান আছে। তথাঃ

- সাধারণ শিক্ষা
- মাদ্রাসা শিক্ষা, এবং
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোটি নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

সাধারণ শিক্ষা			
স্তর	শ্রেণি	বয়স	সময়
প্রাক-প্রাথমিক		৩-৫	৩ বছর
প্রাথমিক	১-৫	৫-১০	৫ বছর
নিম্ন মাধ্যমিক	৬-৮	১১-১৩	৩ বছর
মাধ্যমিক	৯-১০	১৪-১৫	২ বছর
উচ্চ মাধ্যমিক	১১-১২	১৬-১৭	২ বছর
উচ্চ শিক্ষা (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)	১৩-১৭	১৮-২২	৫ বছর

সাধারণত উচ্চ শিক্ষাস্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর ২ বছর মেয়াদী মাস্টার অব ফিলোসফি (এম.ফিল) এবং ৩ বছর মেয়াদী ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয় যার প্রেক্ষিতে ২০১৪ সাল থেকে সারা দেশের ১২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বর্তমানে দেশের ৬৫ হাজার ৫৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫১১ টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি চলছে যা ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলমান আছে । পাশাপাশি, উচ্চ শিক্ষায় তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (পাশ) ডিগ্রীধারীদের জন্য দুই বছর মেয়াদী মাস্টার্স শিক্ষাক্রম চালু আছে।

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো

মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম অংশ। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা কমিশন, কমিটি রিপোর্ট এবং জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এবং যুগোপযোগী করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার সরকার স্বীকৃত পাঁচটি স্তর রয়েছে। বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোটি নিচে উল্লেখ করা হলো

মাদ্রাসা শিক্ষা	
স্তর	সময়
ইবতেদায়ি মাদ্রাসা (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান)সংযুক্ত ইবতেদায়িসহ	৫ বছর
দাখিল মাদ্রাসা (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমমান)	৫ বছর
আলিম মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিকের সমমান)	২ বছর
ফাজিল মাদ্রাসা (স্নাতক এর সমমান)	৩ বছর
কামিল মাদ্রাসা (স্নাতকোত্তর এর সমমান)	২ বছর

উপরে উল্লেখিত মাদ্রাসা ছাড়াও বাংলাদেশে আরও কিছু মাদ্রাসা আছে। যেমন কাওমী মাদ্রাসা, মাযার/মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসা, হাফেযি মাদ্রাসা, এবং কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসাগুলোতে ইসলামী তথা দ্বীনী জ্ঞান প্রসারের পাশাপাশি ইহলৌকিক জ্ঞান ও দক্ষতার প্রসারে আরবি, বাংলা, ও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কাঠামো

বাংলাদেশে সাধারণত ৩টি পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তথাঃ এসএসসি পর্যায়, এইচএসসি পর্যায় এবং ডিপ্লোমা পর্যায়। বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোটি নিচে উল্লেখ করা হলো

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	
স্তর	সময়
এসএসসি (ভোকেশনাল)	২ বছর
এইচএসসি (বিএম)	২ বছর
ডিপ্লোমা	৪ বছর

উপরোক্ত প্রোগ্রামসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স চালূ আছে। যেমনঃ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপক্ষ কতৃক প্রদত্ত ৩৬০ ঘন্টার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।

নিম্নে বাংলাদেশের শিক্ষার স্তর নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর মূলত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা এই দুই স্তর নিয়ে গঠিত।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার আগে ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন তাকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট, কমিশন, এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪, ১৯৮৮, ২০০৩, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০০ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাক-প্রাথমিক নিয়ে বিশেষভাবে সুপারিশ করা হলেও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ এই শিক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াসহ উল্লেখ করা হয়েছে। কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিসহ তাদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন করা, সহনশীলতা এবং আচরণিক শৃঙ্খলাবোধ উন্নয়নের মাধ্যমে পরবর্তী স্তরের শিক্ষার জন্য প্রস্তুতিকে লক্ষ্য বিবেচনা করে বাংলাদেশে সরকারিভাবে স্বল্প পরিসরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় ২০১০ সাল থেকে। ২০১৪ সাল থেকে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০১ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়। ২০২০ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে ০২ বছর মেয়াদি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং ২০২৩ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ৪+ বছর বয়সীদের জন্য ০২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যেই ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়। সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাশ করা হয় এবং ১৯৯৩ সাল থেকে দেশব্যাপি তা বাস্তবায়ন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য সহজলভ্য ও আকর্ষনীয় করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। তাছাড়া বিনা মূল্যে বই প্রদান, উপবৃত্তি প্রদান, পুষ্টিকর খাবার প্রদানসহ নানামুখী উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী ৬$^{+}$-১১$^{+}$ বয়সীদের জন্য ০৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি বাংলাদেশে ৬-১০ বছর বয়সীদের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

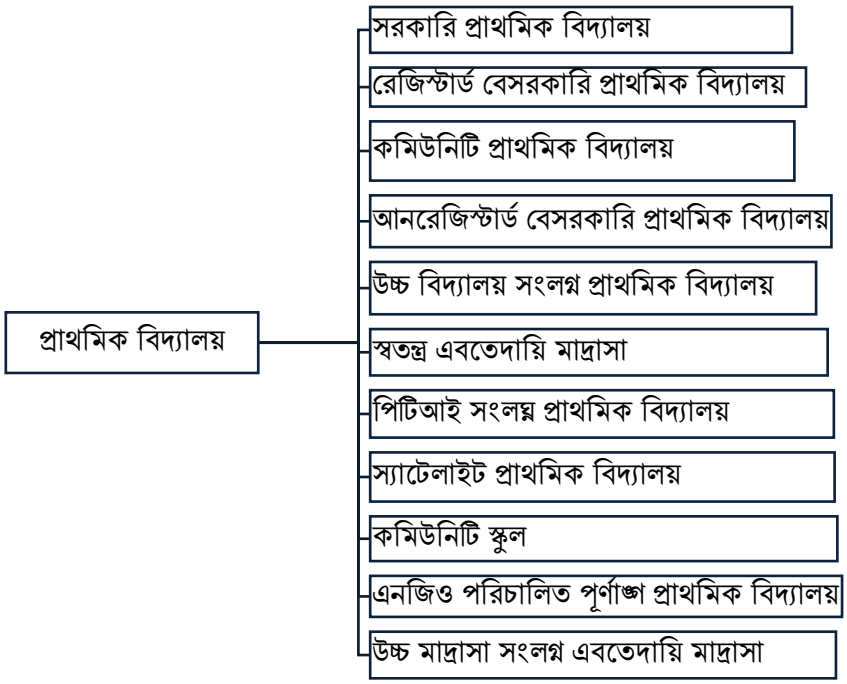

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য গুনগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পেক্ষাপটে অনেকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই শেষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রান্তিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয় কারণ জীবিকার জন্য অনেকে প্রাথমিকের পরে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এজন্য বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা হয়ে উঠেনি।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্তী স্তর। এই স্তরকে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের মাঝে সংযোগস্থাপনকারী স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা অনেকের জীবনে প্রান্তিক শিক্ষাস্তর হিসেবেও পরিগণিত হয় যেহেতু অনেক শিক্ষার্থী এই স্তরের পর কর্মজীবনে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা মূলত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে প্রচলিত ভাবে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়- নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক। উপরন্তু বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধাণত সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারায়

বিভক্ত। যদিও প্রতিটি ধারার কাঠামো এক নয় কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও নীতিমালায় পরিচালিত সাধারণ, মাদ্রাসা, কারগরি এবং ব্যবসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের কাঠামো সুসংগঠিত।

উচ্চশিক্ষা স্তর

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর সফলভাবে অতিক্রম করার পর যে শিক্ষা উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করে সেই স্তরকে শিক্ষার উচ্চ স্তর বলা হয়। উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটির উপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। উচ্চ শিক্ষা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভরশীল যার ফলে অনেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে পাড়ি জমান। উচ্চশিক্ষা বলতে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকেই বুঝায়। পৃথিবীর সকল দেশের উচ্চ শিক্ষা ধারা প্রায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার কতগুলো ধারা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাধারণ শিক্ষা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা সাধারণত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের মূল ধারার অন্যতম একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রথম শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর ভিত্তিক সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং দ্বীনী জীবন বিধান সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (২০০০) এর প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর রাসূল (স) এর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি তাদের সার্বিক বিকাশ এবং ইসলামের প্রকৃত সেবক হিসেবে গড়ে তোলাকে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে ফলে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি এ শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষার মতো ইংরেজি ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পাঠদান করা হয়।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

বর্তমান পৃথিবী বিজ্ঞান নির্ভর ও উন্নত প্রযুক্তির বিশ্ব। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এবং দেশকে অর্থনীতিতে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে শুধু সাধারণ শিক্ষার উপর নির্ভর করলে হবে না। এক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেও সমানভাবে প্রাধান্য দিতে হবে। কারিগরি শিক্ষা এমন একটি বিশেষায়িত শিক্ষা ব্যবস্থা যা জনসম্পদকে দ্রুত জনশক্তিতে রূপান্তর করে অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পেশা কিংবা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বিভিন্ন রকম শিক্ষাক্রম যেমন- ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন-জুট টেকনোলজি, ডিপ্লোমা-ইন-লেদার টেকনোলজি, ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি টেকনোলজি, ডিপ্লোমা-ইন-মেরিন টেকনোলজি, ডিপ্লোমা-ইন-হেলথ টেকনোলজি, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরিচালনা করে আসছে। এগুলো ছাড়াও নানারকমের স্বল্প মেয়াদের শর্ট কোর্স পরিচালনা করছে যা দেশের গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রোগ্রামগুলো সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মূল লক্ষ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি করা। ফলে দেশের শ্রম বাজারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারেও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা যাবে, তাতে ব্যক্তির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে।

শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহ

সাক্ষরতা (Literacy)

সাক্ষরতা মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের একটি। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মৌলিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৬ নং ধারায় এই অধিকারের কথা সুস্পষ্ট করে বলা আছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানের ১৭ নং ধারায় প্রতিটি নাগরিকের সাক্ষরতা প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের পেক্ষাপটে সাক্ষরতা শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ১৯০১ সালে লোক গণনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টে।

সাক্ষরতা শব্দটি ইংরেজি প্রতিশব্দ "Literacy" । সাক্ষরতা সম্পন্ন ব্যক্তিই সাক্ষর যিনি মাতৃভাষায় মনের ভাব লিখে প্রকাশ করতে পারেন, মাতৃভাষায় কোন লেখা পড়ে বুঝতে পারেন এবং মাতৃভাষায় দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব কষতে পারেন। সাক্ষরতার মৌলকি দক্ষতা ৩টি যেগুলোকে সংক্ষেপে 3Rs (Reading, writing and Arithmetic skills) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

১৯৮৯ সালে সাক্ষরতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে মাতৃভাষায় লেখা কোন কিছু পড়ে বুঝতে পারা, মৌখিক ও লিখিতভাবে মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা এবং প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করে ও লিখে রাখার ক্ষমতাই সাক্ষরতা। বাংলায় 'সাক্ষরতা'কে কেউ কেউ 'স্বাক্ষর' এর সাথে এক মনে করেন কিন্তু ধারণা দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বাক্ষর শব্দটি দ্বারা 'সই করার দক্ষতা' বোঝালেও সাক্ষরতা দ্বারা মাতৃভাষায় মনের ভাব লিখে প্রকাশ করতে পারা, মাতৃভাষায় লেখা কোন কিছুর অর্থ পড়ে বুঝতে পারা এবং মাতৃভাষায় দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে পারার দক্ষতাকে বুঝায়। যেমন- বিষয়টি আমরা দুইজন সবজি বিক্রেতার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আরো ভালো করে বুঝতে পারি। ধরা যাক, একজন বিক্রেতা তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস পড়তে, লিখতে এবং হিসাব করতে পারেন। পক্ষান্তরে, অন্যজন শুধুমাত্র তাঁর নামটা লিখতে পারেন কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে, লিখতে কিংবা হিসাব- নিকাশের কাজ করতে পারেন না। তাহলে আমরা কী বলবো? অবশ্যই ১ম জন সাক্ষরতা সম্পন্ন আর ২য় জন শুধু স্বাক্ষর করতে পারেন কিন্তু সাক্ষর নন, তিনি নিরক্ষর।

সাক্ষরতার ধারণার ধারাবাহিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাক্ষর জ্ঞান তথা অক্ষরজ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিকে সাক্ষর মনে করা হতো যারা তাঁর নাম লেখার জন্য যে ক'টি বর্ণমালা প্রয়োজন তা ছাড়া অন্য কোন বর্ণ জানতো না। শুরুতে সাক্ষরতার এই ধারণা থাকলেও ১৯৪০ এর দশকে সাক্ষরতা বলতে পড়ার ও লেখার দক্ষতাকে বোঝাতো। ১৯৬০ এর দশকে সাক্ষরতা বলতে পড়া, লেখা ও হিসাব নিকাশের দক্ষতাকে বোঝাতো। ১৯৭০ এর দশকে পড়ার দক্ষতা, লেখার দক্ষতা, হিসাব-নিকাশের দক্ষতার সাথে সচেতনতার দক্ষতাকে সাক্ষরতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৯৮০ এর দশকে পড়ার দক্ষতা, লেখার দক্ষতা, হিসাব-নিকাশের দক্ষতা, সচতেনতার দক্ষতার সাথে দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পঠনের দক্ষতাকে সাক্ষরতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৯৯০ এর দশকে পড়ার দক্ষতা, লেখার দক্ষতা, হিসাব-নিকাশের দক্ষতা, সচেতনতার দক্ষতা, দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পঠনের দক্ষতা, যোগাযোগের দক্ষতা, ক্ষমতায়নের দক্ষতা, জীবন নির্বাহের দক্ষতা, প্রতিরক্ষার দক্ষতা, সাংগঠনকি দক্ষতা বলতে সাক্ষরতাকে বুঝতো। তথাপি, সাক্ষরতার মূল বৈশিষ্ট্য উপরে উল্লেখিত ৩টি। পড়ার, লেখার ও হিসাব করার দক্ষতা। ১৯৬৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ইরানের তেহরান শহরে এক সম্মেলনে ৮ সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিলো প্রত্যেক নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করে তোলা।

সাক্ষরতার পর্যায়: ৩টি [ইউনেস্কো: এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল]-মৌলিক পর্যায়, মধ্যবর্তী পর্যায়, স্ব-শিখন পর্যায়। নিম্নে উল্লেখিত ৩টি পর্যায়ের মধ্যে তুলনা করা হলো:

	মৌলিক পর্যায়	মধ্যবর্তী পর্যায়	স্ব-শিখন পর্যায়
লক্ষ্যদল	নিরক্ষর ব্যক্তি। যারা কোনদিন শিক্ষাকেন্দ্রে যায়নি বা সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনের পূর্বে ঝরে পড়েছে।	যারা মৌলিক পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করেছে।	যারা মৌলিক ও মধ্যবর্তী পর্যায়ের দক্ষতা সম্পন্ন।
সহযোগিতা	প্রয়োজন।	প্রয়োজন।	প্রয়োজন হয় না।
অর্জিত দক্ষতা	বর্ণ-চিহ্ন চেনা ও লিখতে পারা। -বড় ছাপার অক্ষরে লেখা খবরের কাগজের শিরোনাম, পোস্টারের বক্তব্য ও সংখ্যা পড়া, নিজের নাম-ঠিকানা, সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত চিঠি এবং সংখ্যা লিখতে পারা, ছোট যোগ-বিয়োগ করতে পারা।	-মৌলিক পর্যায়ের দক্ষতা ব্যবহার করে আরো জটিল শব্দ, বাক্য ও হিসাবের দক্ষতা অর্জন করা। -ছোট অক্ষরে লেখা গল্প ও নির্দেশনা পড়তে পারা, পঠিত বিষয়ের ভাবার্থ বুঝতে পারা, চিঠি লেখা, নোট নেয়ার পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত জটিল যোগ-বিয়োগ ও গুণ করতে পারে। পরিমাপের মৌলিক ধারণা লাভ করা ও নিজের দৈনন্দিন হিসাব করতে পারা ।	যেকোন সাইজের ছাপার অক্ষরে লেখা পড়তে পারা, নিজের মনের ভাব লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং পারিবারিক হিসাব করতে পারা।

কার্যকর সাক্ষরতা (Functional Literacy)

যে সাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মৌলিক শিখন দক্ষতা অর্জিত হয় তাকেই কার্যকর সাক্ষরতা বলে। কার্যকর সাক্ষরতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি সাধারণ সাক্ষরতার আলোকে পড়তে, লিখতে ও হিসাব করতে পারার পাশাপাশি চিন্তা করতে পারে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। যেমন- কোন ওষুধ কেনার পূর্বে সেটার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পড়ে বুঝতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সুতরাং বলা যায় যে, ব্যক্তির মধ্যে যখন মৌলিক সাক্ষরতা এবং জীবন দক্ষতার সমন্বয় ঘটে তখন তাঁকে কার্যকর সাক্ষরতা বলা হয়। অর্থাৎ কার্যকর সাক্ষরতা=মৌলিক সাক্ষরতা + জীবন দক্ষতা। কার্যকর সাক্ষরতার প্রভাব সর্বজনিন। উপরের আলোচনা হতে আমরা কার্যকর সাক্ষরতা বলতে বুঝি-

- মৌলিক শিক্ষা অর্জন।
- জীবন দক্ষতা অর্জন।
- জীবন সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন।

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- শিক্ষিত জাতি গঠন।

জীবন দক্ষতা (Life Skills)

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ন্যূনতম যতটুকু জ্ঞান সচেতনতা এবং দক্ষতা অর্জন করা দরকার এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনে যে দক্ষতা বা যোগ্যতা অপরিহার্য তাই জীবন দক্ষতা। সাধারণ জীবন দক্ষতা হিসেবে জ্ঞান, সচেতনতা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে বুঝায়। জীবন দক্ষতার মাধ্যমে একজন মানুষ সুরক্ষামূলক আচরণ করতে পারে এবং ঝুঁকিপূর্ন আচরণ পরিহার করতে পারে। জীবন দক্ষতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি তার আচরণে ভারসাম্য বিধান করতে সক্ষম হয়। জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষতার মাঝে সমন্বয় করে কাঙ্খিত আচরণ করতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র (World Health Organization-WHO) মতে, "Life skills are abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life"

WHO ১০টি মূল জীবন দক্ষতা চিহ্নিত করেছে। সেগুলোকে জীবন দক্ষতার উপাদান বলা হয়। যথা:

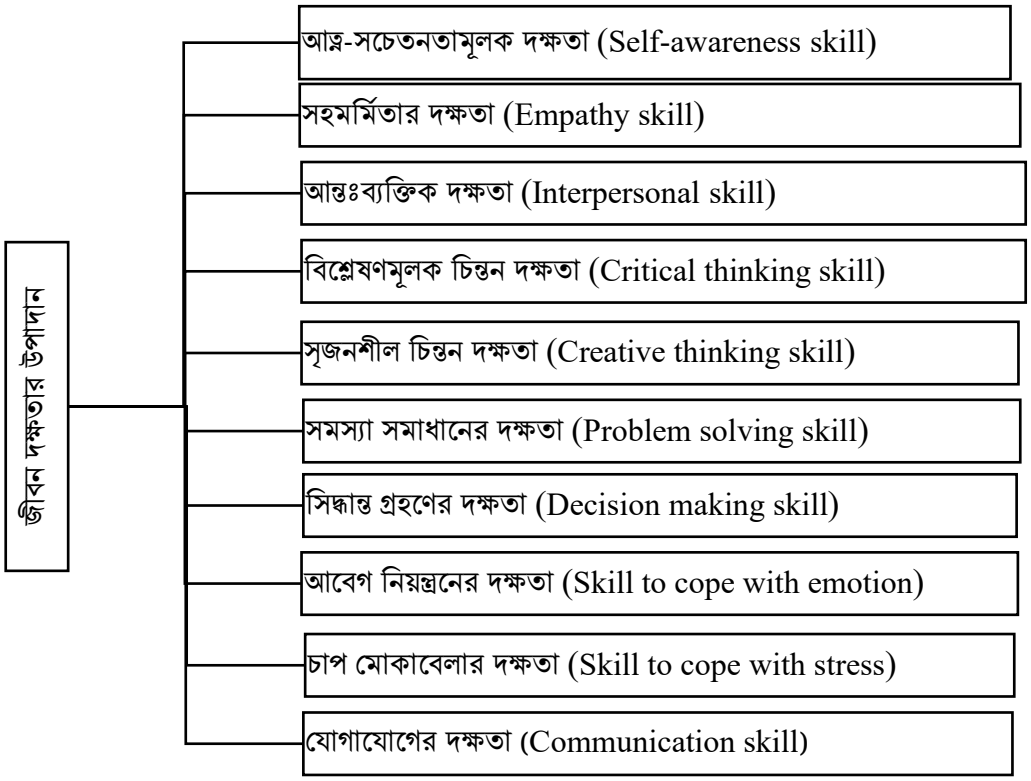

সর্বজনীন শিক্ষা (Universal Education)

একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষাই হলো সর্বজনীন শিক্ষা। রাষ্ট্রের নিকট থেকে নাগরিকের যে স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকার আছে, তাই সর্বজনীন শিক্ষা (Universal education) । রাষ্ট্র এক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষা (Basic education) প্রদান করে। ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের ১৭তম অধিবেশনে সর্বজনীন শিক্ষাকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং মৌলিক শিক্ষা (Basic education) এর উপর জোর দেয়া হয়।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (Universal Primary Education)

একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তার নিজ রাষ্ট্র থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকার রাখে, তাই প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন হিসেবে রাষ্ট্র স্বীকৃত। ১৯৩৫ সালে এই ধারণার সূত্রপাত হয় যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের ১২ দফা ঘোষণা করা

হয়। সেই ১২ দফার ৩য় দফা ছিল, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। এর মূল লক্ষ্য হলো, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপিত হয়।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা (Compulsory Education)

মূলত আইন প্রণয়ন এবং উদ্বুদ্ধকরণের দ্বারা নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমের সকলের জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক তাই বাধ্যতামূলক শিক্ষা। স্কুল গমনোপযোগী সকল শিক্ষার্থীর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষা সম্পন্নের যে বাধ্যবাধকতা তাই বাধ্যতামূলক শিক্ষা। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ঐ বছর ১৩ ফেব্রুয়ারী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাশ করা হয়। প্রথম ধাপে ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে দেশের ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখ থেকে সারাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হয়।

সবার জন্য শিক্ষা (Education for All)

সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটি একটি শ্লোগান। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে বলা হয়, Everyone has the right to education"। ১৯৯০ সালের ৫-৯ মার্চ থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন থেকে এই ঘোষণা দেয়া হয়। বাংলাদেশ উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং সম্মেলনের ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে এ সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের জন্য ২০০০ সাল নাগাদ জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়।

অব্যহত শিক্ষা (Continuing Education)

মৌলিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে এ শিক্ষা শুরু হয়। এটি একটি চলমান শিক্ষা প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার শুরু আছে শেষ নেই, আজীবন চলতে থাকে তাই অব্যাহত শিক্ষা। এটাকে জীবনভর শিক্ষাও বলা হয়। ইউনেস্কোর মতে, "মৌলিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে যে-সব শিক্ষার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোকে অব্যাহত শিক্ষা বলা হয়।

গণশিক্ষা (Mass Education)

সাধারণত গণমানুষের শিখনের প্রক্রিয়াকে গণশিক্ষা বলে। এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার অন্ত:র্ভুক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাধারার বাইরে দেশের বেশিরভাগ মানুষ যে শিক্ষার আওতায় লেখাপড়ার চর্চা করছে তা গণশিক্ষা নামে পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষার বয়স অতিক্রান্ত হলে যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় নিরক্ষর শিশু-কিশোর ও বয়স্ক মানুষদের স্বল্প ব্যয়ে সাক্ষরতামূলক শিক্ষা দেয়া হয় তাকে গণশিক্ষা বলে। ৬+ থেকে ৪৪+ বছর পর্যন্ত গণশিক্ষা। গণশিক্ষা ধারণার বিকাশ ঘটে ১৯২৬ সালে যখন অবিভক্ত বাংলার শিশু ও বয়স্ক উভয়ের জন্য সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি উঠে। চল্লিশ থেকে ষাটের দশকে 'গণ' বলতে 'রাজনীতি সচেতন বয়স্ক মানুষ' বিবেচনায় বয়স্ক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। সত্তরের দশকে গণশিক্ষার ধারণার প্রসার ঘটে এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে গণশিক্ষা ও সর্বজনীন শিক্ষা নিয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। গণশিক্ষার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৬ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। গণশিক্ষা হল এমন একটি শিক্ষা কার্যক্রম যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে একটি দেশ বা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সকল মানুষের জন্য পরিচালিত হয়। যেমনঃ বয়স্ক শিক্ষা, নিরক্ষতা দূরীকরণ শিক্ষা ইত্যাদি। এটাকে বিসশের একেক দেশে একেক ভাবে অবিহিত করে। যেমন- ইংল্যান্ড-এ Father Education, ফ্রান্স-এ Popular Education, আমেরিকা-তে Adult Education ইত্যাদি।

পেশাগত শিক্ষা (Professional Education)

পেশাজিবিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাই পেশাগত শিক্ষা। যেমন- চাকুরিকালিন সময় বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং দেয়া হয় ফলে কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই শিক্ষায় সাধারণ বা মৌলিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে না। এই শিক্ষার আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ ব্যক্তির পেশা নির্ভর। তাই একেক পেশার জন্য একেক রকমের পেশাগত শিক্ষা। যেমন- শিক্ষকতার শিক্ষা, পুলিশ একাডেমীর শিক্ষা, মেরিন একাডেমীর শিক্ষা ইত্যাদি। এটি ব্যক্তির পেশাগত জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কারিগরি শিক্ষা (Technical Education)

যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি, শিল্প কিংবা যন্ত্রকৌশল শিক্ষায় হাতে কলমে শিক্ষার্থীরা দক্ষ করে তোলা হয় তাকে বলে কারিগরি শিক্ষা। এটি একটি প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা যেখানে দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান এর সুযোগ তৈরি করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে গণমুখী করা সম্ভব। বর্তমানে এই শিক্ষার কর্মসংস্থানের সুযোগ সাধারণ শিক্ষার চেয়ে বেশি। এই শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব এবং এই শ্রমকে বিদেশেও রপ্তানি করা যায়। কারিগরি

শিক্ষার পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত। যেমন- ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, খামার প্রযুক্তি, আর্টস এন্ড গ্রাফ ডিপ্লোমা ইত্যাদি।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education)

যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোন বৃত্তি অবলম্বনের যোগ্য করে তোলা হয় তাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা হয়। অর্থাৎ, এটি এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পেশার উপযোগী ও দক্ষ হিসেবে তৈরি করা হয়। এখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।

শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ (Second chance of Education)

অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে যারা বিভিন্ন কারনে নির্দিষ্ট বয়সে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহন করতে পারে না কিংবা কোন একটি শিক্ষা স্তর সম্পন্ন করার পূর্বেই ঝরে পড়ে। তাই এইসব শিক্ষার্থীদের পুনরায় শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করার জন্য দেশব্যাপি যেই কর্মসূচী তাই হল শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ। যেমনঃ ROSC প্রকল্প।

জীবনব্যাপী শিক্ষা (Lifelong Education)

যে শিক্ষা কার্যক্রম মানুষের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনব্যাপী চলমান থাকে তাই হল জীবনব্যাপী শিক্ষা। এটা অনানুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় অর্জিত হয়ে থাকে। এই শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম নেই কারণ এটি একটি জীবনভর প্রক্রিয়া। যেমন- একজন বয়স্ক মানুষ ৫০ বছর বয়সে এসেও অক্ষর জ্ঞান অর্জন করছে আবার প্রয়োজনে সে সেলাইয়ের কাজও শিখছে। অর্থাৎ, ব্যক্তি তার প্রয়োজনে শিখে চলছে এটাই জীবনব্যাপী শিক্ষা।

ভর্তি হার (Enrollment Rate)

শিক্ষার কোন একটি স্তরে ভর্তির হার বলতে ঐ নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের শতকরা হারকে বুঝায়। ভর্তির হার নির্ণয় করার জন্য ঐ নির্দিষ্ট স্তরে মোট ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ঐ স্তরের মোট ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা জানা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে সহজে ভর্তির হার পাওয়া যায়।

$$\text{ভর্তির হার} = \frac{\text{মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী}}{\text{মোট ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থী}} \times ১০০$$

নেট ভর্তি হার (Net Enrollment Rate: NER)

একটি নির্দিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট বয়সসীমার ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে যত জন ভর্তি হয় তার শতকরা হারকে নেট ভর্তি হার বলে। এই সংখ্যা সবসময় ১০০ বা তার নিচে হয়। নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্য সহজে নেট ভর্তি হার নির্ণয় করা যায়।

$$\text{নেট ভর্তির হার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট স্তরের ভর্তিযোগ্য বয়সসীমার মধ্য থেকে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী}}{\text{ঐ নির্দিষ্ট স্তরের নির্ধারিত বয়সসীমার ভর্তিযোগ্য মোট শিক্ষার্থী}} \times ১০০$$

উপরোক্ত সূত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা যে কোন স্তরের শিক্ষার্থীর নেট ভর্তি হার নির্ণয় করা সম্ভব।

মোট ভর্তি হার (Gross Enrollment Rate: GER)

একটি নির্দিষ্ট স্তরে যত জন ভর্তি হয় যেখানে বয়স বিবেচ্য নয় অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট স্তরের নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে এবং ঐ নির্দিষ্ট স্তরের নির্দিষ্ট বয়সসীমার বাইরের মোট যতজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তার শতকরা হারকে মোট ভর্তি হার বলে।

এই সংখ্যা ১০০ এর বেশি হতে পারে। নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্য সহজে নেট ভর্তি হার নির্ণয় করা যায়।

$$\text{মোট ভর্তির হার} = \frac{\text{বয়স ব্যতিরেখে একটি নির্দিষ্ট স্তরে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থী}}{\text{ঐ নির্দিষ্ট স্তরের নির্ধারিত বয়সসীমার ভর্তিযোগ্য মোট শিক্ষার্থী}} \times ১০০$$

উপরোক্ত সূত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা যে কোন স্তরের শিক্ষার্থীর মোট ভর্তি হার নির্ণয় করা সম্ভব।

ঝরে পড়া (Drop-out)

বাংলাদেশের শিক্ষায় ঝরে পড়া ভয়াবহ একটি সমস্যা। শিক্ষার্থী কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তর শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করছে। এই ঘটনাকে ঝরে পড়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত নির্ধারিত শিক্ষাস্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করার আগে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলে তাকে ঝরে পড়া বলে। ড. আলী আজম বলেন, "নির্ধারিত শিক্ষাক্রমের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিসমাপ্ত না করেই শিক্ষাজীবনের পিছু টানার প্রক্রিয়াই ঝরে পড়া"। প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত ঝরে পড়ার চিত্র লক্ষ্য করা যায়। তবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার বেশি।

পেডাগজি (Pedagogy), এন্ড্রাগজি (Andragogy), হিউটাগজি (Heutagogy)

পেডাগজি শব্দের শাব্দিক অর্থ 'শিখন বিজ্ঞান'। যে সকল বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিশুদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাকে পেডাগজি বলে। পক্ষান্তরে বয়স্কদের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় যে সকল বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে এন্ড্রাগজি বলে। কিন্তু হিউটাগজিতে বয়স কোন বিষয় নয় কারণ এখানে স্ব-শিখন প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি (শিশু কিংবা বয়স্ক) নিজে থেকে নিজের ইচ্ছার ও প্রচেষ্টায় শেখে তাকে হিউটাগজি বলে।

শিক্ষণের সাধারণ নীতি বা ম্যাক্সিম (Maxims of Teaching)

'ম্যাক্সিম' অর্থ নীতি। অর্থাৎ যে সকল নীতি অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাকে ম্যাক্সিম বলে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুই ধরনের নীতি ব্যবহার করা হয়। যথা: (১) সাধারণ নীতি, (২) মনোস্তাত্ত্বিক

নীতি। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় উভয় ধরনের নীতি আবশ্যকীয় হলেও ম্যাক্সিম মূলত শেখানো প্রক্রিয়ায় মনোস্তাত্ত্বিক নীতি নিয়ে আলোচনা করে। নিম্নে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য সাধারণ ও মনোস্তাত্ত্বিক নীতিসমূহ উল্লেখ করা হলো।

উল্লেখযোগ্য সাধারণ নীতিসমূহ

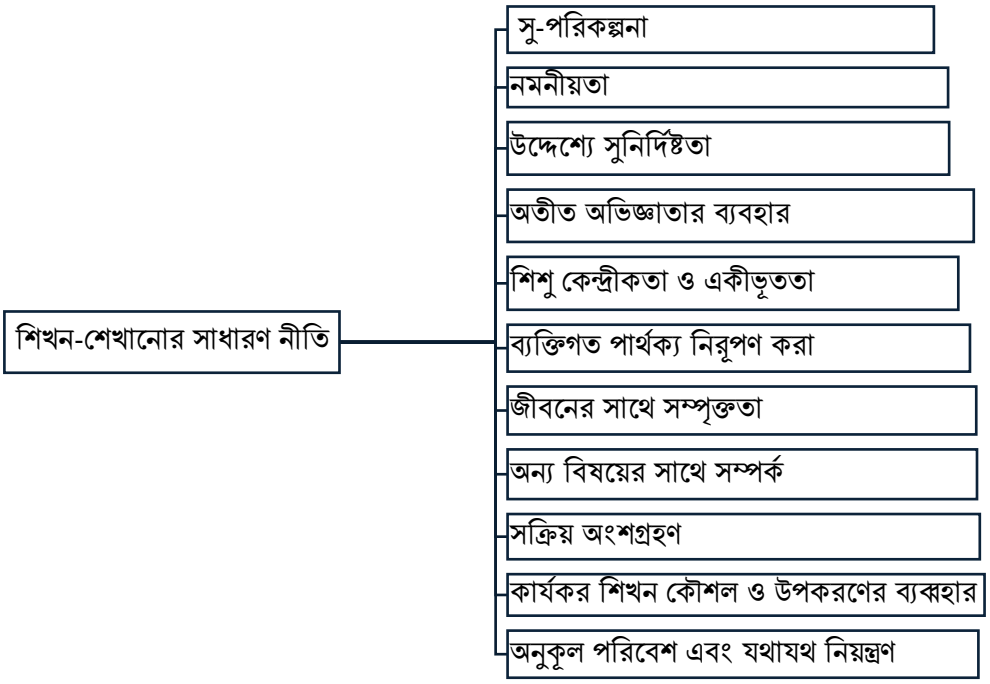

উল্লেখযোগ্য মনোস্তাত্ত্বিক নীতিসমূহ

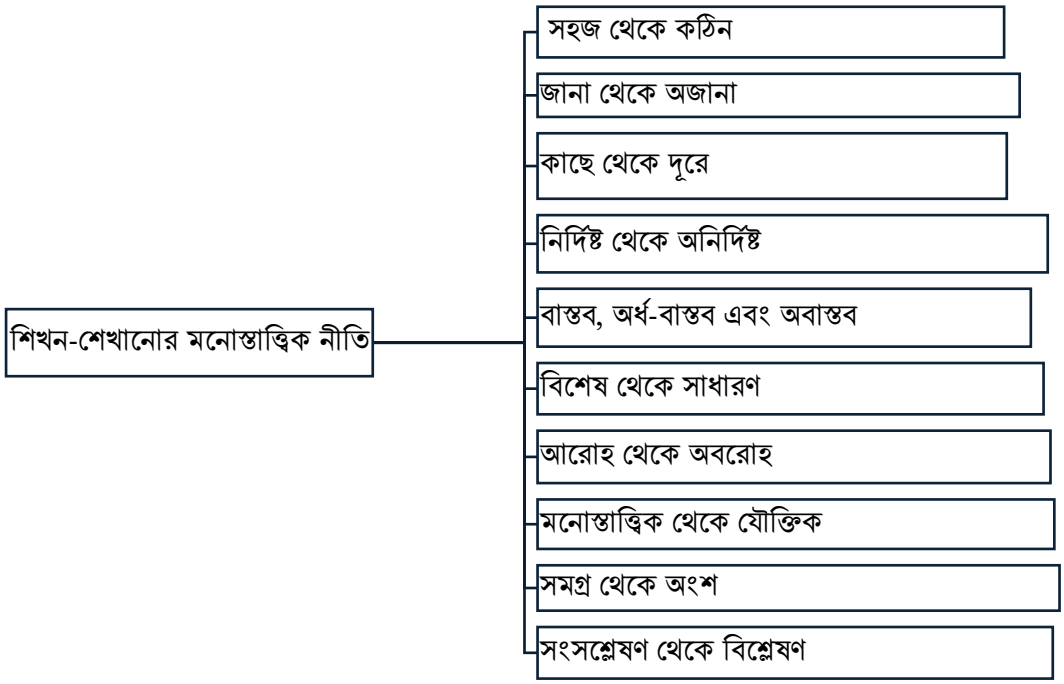

উপরোক্ত মনোস্তাত্ত্বিক নীতিগুলোই ম্যাক্সিম। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় আরও কিছু নীতি অনুসরণ করা হয় যেমন: প্রেষণা ও আগ্রহ সৃষ্টি, আলোচনার বা কাজের পুন:রাবৃত্তি ও অনুশীলন, পরিবর্তন, বিশ্রাম ও বিনোদন, ফলাবর্তন ও বলবর্ধক

প্রদান, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা, স্ব-শিখনকে উৎসাহিত করা, সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা, নিরাময়মূলক শিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি।

শিক্ষায় যৌক্তিক দর্শন (Thoughts of Education)

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া মনোবৈজ্ঞানিক নীতি নির্ভর হলেও এটি দর্শন বিবর্জিত নয়। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় যৌক্তিক দার্শনিক চিন্তা-চেতনার সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। আধুনিক দর্শন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থী বান্ধব, সক্রিয়, আনন্দদায়ক করার জন্য প্রতিনিয়ত নানান ধরনের মতবাদ দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায় দার্শনিক মতবাদগুলো শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সর্বদা নতুনত্ব সৃষ্টি করে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যুক্তিপূর্ণ ধ্যান-ধারণা গুলোকে যৌক্তিক দর্শন বা Thoughts of Education বলে। নিম্নে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কিছু Thoughts উল্লেখ করা হলো।

- করে শেখা।
- আনন্দঘন পরিবেশে শেখা।
- শিখনে বলবর্ধক (Reinforcement) প্রদান।
- শিখন হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।
- কর্মতৎপরতা ভিত্তিক শিখন।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক
- শিখনে জীবন-অভিজ্ঞতার ব্যবহার
- শিক্ষার্থী কী শিখবে তাঁর থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো সে কীভাবে শিখবে।
- শিক্ষক সর্বদা একজন শিক্ষার্থী কিন্তু ভাল শিক্ষার্থী, ইত্যাদি।

বৈচিত্রতা (Diversity)

বৈচিত্রতা বলতে ভিন্নতা বোঝায়। আমাদের শ্রেণিতে সাধারণত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে। ধরা যাক, একটি শ্রেণিতে ৩০ জন শিক্ষার্থী আছে। তাদের মধ্যে কেউ খুব মেধাবি, কেউবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কারো মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে, কেউবা খুবই গরীব, আবার প্রান্তিক শিক্ষার্থী থাকতে পারে, মাইগ্রেটেড বা রিফিউজি শিক্ষার্থী থাকতে পারে, এতিম বা কর্মজীবী শিক্ষার্থী থাকতে পারে, বর্ণ বা গোত্রগত পার্থক্য থাকতে পারে, নারী শিক্ষার্থী থাকতে পারে, অপরাধপ্রবণ শিক্ষার্থী ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের বা ভিন্নতার শিক্ষার্থী থাকতে পারে। এই যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিক্ষার্থী, এদেরকেই বৈচিত্রপূর্ণ শিক্ষার্থী বা শিক্ষায় বৈচিত্রতা বলে। UNESCO বৈচিত্রতাকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, “Diversity corresponds to people’s differences which may relate to their race, ethnicity, gender, sexual orientation, language, culture, religion, mental and physical ability, class, and immigration status”।

একীভূত শিক্ষা (Inclusive Education)

বৈচিত্রতাই একীভূত শিক্ষার মূল প্রেক্ষাপট। শিক্ষার্থীদের বৈচিত্রতাকে বিবেচনা করে সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করাই একীভূত শিক্ষা। ১৯৯৪ সালে ৭-১০ জুন স্পেনের সালামানকায় একীভূত শিক্ষা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। একই শ্রেণি, একই পাঠ্যবিষয়, একই পদ্ধতি ও কৌশল, একই মূল্যায়ন পদ্ধতি তবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থী অর্থাৎ বৈচিত্রতাকে গুরুত্ব দিয়ে যে শিক্ষা তাই একীভূত শিক্ষা। এই শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য “Every learner matters

and matters equally" অর্থাৎ কোন বৈষম্য নয়। বিদ্যালয়ে সকল শিশুর শিক্ষার যেমন সমান সুযোগ দিতে হবে তেমনি শ্রেণি কক্ষেও কোনভাবেই কোন শিক্ষার্থীর সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। স্পেন এবং ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত এ সম্মিলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, প্রত্যেক শিশুর শিক্ষা লাভ করা তার মৌলিক অধিকার। শিশুকে এ অধিকার অর্জনের জন্য ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ দিতে হবে। প্রতিটি শিশু অদ্বিতীয়। অনন্য বৈশিষ্ট্যধারী প্রতিটি শিশুকে তার সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়ে শিখনে উৎসাহ দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে প্রণয়ন করা দরকার যাতে তা সকল শিশুর বহুমুখী শিখন চাহিদা পূরণ করে তার সামগ্রিক বিকাশ ঘটায়। যেসব শিশুর বিশেষ শিখন চাহিদা রয়েছে তারা যেন নিয়মিত বিদ্যালয়ে পড়ালেখায় উৎসাহিত হয় সে ব্যাপারে নজর দিতে হবে এবং শিক্ষণে 'শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি' ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত স্কুলে একীভূত শিক্ষা অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীভূত হয়। ফলে সৃজনশীল একীভূত সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হয়।

বিশেষ শিক্ষা (Special Education)

শারিরীক ও মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে প্রণীত শিক্ষাধারাকে বিশেষ শিক্ষা বলে। একই শ্রেণিতে বিশেষভাবে প্রণিত পাঠ্যবিষয়, বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে, বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা যে শিক্ষা তাকে বিশেষ শিক্ষা বলে। এখানে মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। দেশের প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার বাইরে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে যত্ন সহকারে এই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

শিক্ষায় সমতা এবং সাম্যতা (Equity and Equality in Education)

শিক্ষায় সমতা: শিক্ষায় সমতা বলতে মূলত, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে বৈচিত্রপূর্ণ সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যত ধরনের সুযোগ/সুবিধা থাকে তা উপভোগে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ প্রদান করা হয়। শিক্ষক শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীকে সমান চোখে দেখবেন। কাউকে কোন অতিরিক্ত সুবিধা দিবেন না। এখানে, সকলেই সমান সুযোগ পাবে এবং শারীরিক, আবেগিক, বা আর্থ-সামাজিক কোন বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে কোনভাবেই বিবেচনা করা হবে না বরং সমান অবস্থান নিশ্চিতের জন্য প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, নিয়ম, ধারণা ইত্যাদিকে বিবেচনায় আনতে হবে।

শিক্ষায় সাম্যতা বা ন্যায্যতা: সাম্যতা মূলত সমতা অর্জনের প্রক্রিয়া। সাম্যতা সাধারণত চাহিদা ভিত্তিক যোগানের একটি প্রক্রিয়া। শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার্থীরা থাকে। যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং যাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আছে তাদের শ্রেণিকক্ষে বিশেষ সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। যারা শ্রেণিকক্ষে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকে তাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ি বিশেষ/অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অন্য শিক্ষার্থীদের সমঅবস্থানে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে

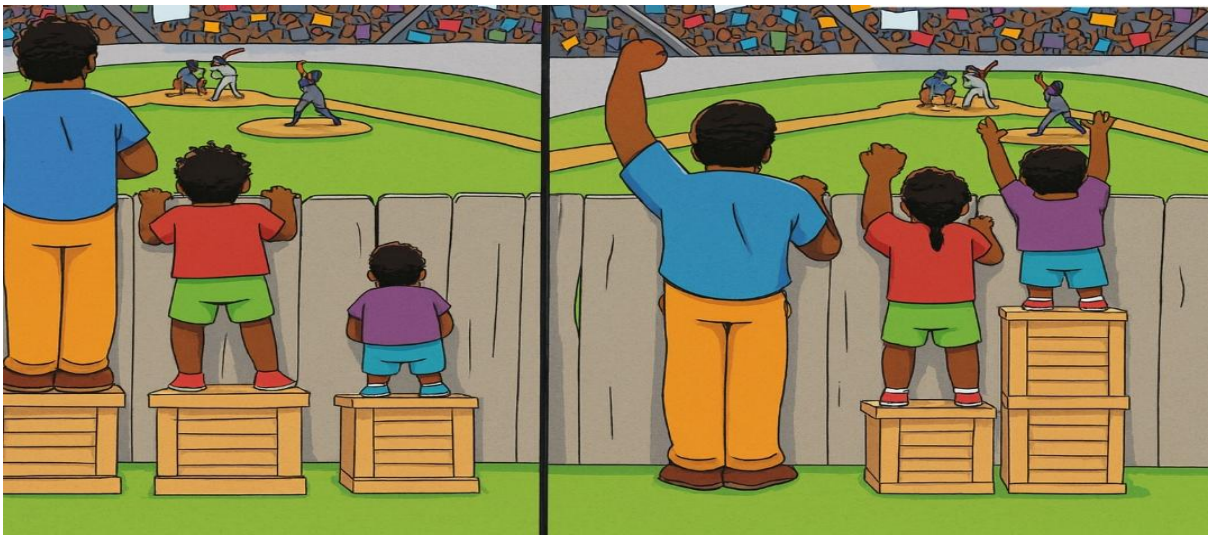

শিক্ষায় সাম্যতা বলে। এতে শ্রেণিকক্ষে সকলে শিক্ষার সমান সুযোগ পায়, তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্মানের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকের আত্মতৃপ্তি বাড়ে এবং বৈষম্যহীন সমাজ তথা জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন করা সহজ হয়। নিচের ছবি দুইটি লক্ষ্য করুন এবং কোনটি সমতা আর কোনটি সাম্যতা নির্দেশ করে তা ছবির নিচে লিখুন।

মূল্যবোধ শিক্ষা (Value Education)

মানব সমাজের কাঙ্ক্ষিত নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষাকেই মূলত মূল্যবোধ শিক্ষা বলে। মূল্যবোধ শিক্ষার সুত্রপাত হয় পরিবার থেকেই। এই শিক্ষা দ্বারা সমাজের প্রচলিত ও ঐতিহ্যবাহী স্বীকৃত আচরণের অনুশীলন হয়ে থাকে। ক্রাইডার ও অন্যান্যদের মতে, সমাজ কাঙ্ক্ষিত কল্যাণকর আচরণ অনুশীলনের নাম হল মূল্যবোধ শিক্ষা। সামাজিক অবক্ষয় রোধে ও সমাজ উন্নয়নে এই শিক্ষার অনেক তাৎপর্য রয়েছে। যেমন- পারস্পারিক সহানুভূতিশীলতার চর্চা, নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো, দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করা, আচরণে বিবেকবোধ কাজে লাগানো, জনকল্যাণমূলক কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষা মানুষের জীবনের সাথেই সমর্থক। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় মানুষ নানানভাবে শেখে। সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব এবং ব্যক্তির নিজের প্রয়োজনেই এই শিক্ষা অব্যহত থাকে। মানুষ শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে। মানুষ যে ধারায় শিক্ষা লাভ করুক বা শিক্ষার যে স্তরেই সে থাকুক না কেন, শিক্ষার সকল আয়োজন ঐ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে চিত্রায়িত হয়। বর্তমান পেক্ষাপটে, জ্ঞান ভিত্তিক, দক্ষতা নির্ভর সমাজ বিনির্মাণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, শিক্ষা সবার জন্য, সবাইকে নিয়ে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য।

সহায়ক তথ্যপত্র

১. মালেক, ড. আব্দুল, বেগম, ড. মরিয়ম, ইসলাম, ড. ফখরুল, ও রিয়াদ, শেখ শাহবাজ (২০১৫)। শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ শিক্ষা (৫ম সংস্করণ)। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

২. উদ্দিন, মোঃ আয়েজ, ও দাস, সুভাষ চন্দ্র (২০১৪)। শিক্ষাদর্শন (৩য় সংস্করণ)। উপমা প্রকাশন, ঢাকা।

৩. রায়, সুশীল (২০২২)। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন (ষোড়শ সংস্করণ)। সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা।

৪. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর (২০১৬)। প্রারম্ভিক শিক্ষাবিজ্ঞান। প্রভাতী লাইব্রেরি। ঢাকা।

৫. রহমান ও অন্যান্য (২০০৩)। শিক্ষাকোষ, সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোওপারেশন (এসডিসি), ঢাকা।

6. Mangal, S.K. & Mangal, S. (2019). Learning and Teaching. PHI Learning Private Limited, Delhi.

7. Mangal, S.K. & Mangal, U. (2014). Essentials of Educational Technology. PHI Learning Private Limited, Delhi.

8. Nag, S., & Nag, Dr. S. (2017). Pedagogy of Science Teaching: Life Science. Rita Book Agency, Kolkata.

9. OECD (2023), Equity and Inclusion in Education: Finding Strength through Diversity, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e9072e21-en.

অধ্যায়: ৩
বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা নীতি পর্যালোচনা

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষার ধারণা, বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে থাকে। সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় অনেকগুলো শিক্ষা কমিশনের প্রণীত প্রস্তাবনার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজকের এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতাত্তোর শিক্ষা খাতে সামগ্রিক সংস্কার ও মানোন্নয়নের জন্য সময় সময়ে গঠিত হয়েছে শিক্ষা কমিশনসমূহ। বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস ও গতি-প্রকৃতি জানতে হলে বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিটি, শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতিগুলোর উপর একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আজকের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন আমল, মুঘল ও সুলতানি আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও সর্বশেষ বাংলাদেশ আমল। ২০২১ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ প্রণয়নের আগ পর্যন্ত অনেকগুলো শিক্ষা কমিটি, শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য এ সকল কমিশন ও কমিটিগুলো হলো, ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২), প্রফেসর শামসুল হুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৮, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি সুপারিশ (১৯৭৯), মজিদ খান শিক্ষা কমিশন (১৯৮৩), মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন (১৯৮৭), শামসুল হক শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭), জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০, ড. এম এ বারী শিক্ষা কমিটি (২০০১), মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন (২০০৩) এবং সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ (হুসাইন, ২০২২)।

এসকল কমিশনসমূহের লক্ষ্য ছিল দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার আলোকে একটি মানবিক, বৈষম্যহীন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বিশেষ করে, ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২) প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনীকরণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দেয়, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো তৈরীতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮)।

এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতির প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য,উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও সুপারিশ সম্পর্ক স্পষ্ট ধারণা দেওয়া, যাতে তারা বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের সংস্কার ও উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা রাখতে পারে।

ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭২

সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পূনর্গঠন ও আধুনিকায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। স্বাধীনতার আদর্শ ও সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সার্বিক ও মানবিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে কমিশন উদ্বোধন করেন। এই কমিশনের নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট রসায়নবিধ ও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ-খুদা(আউয়াল,২০০৫)।

কমিশন ১৯৭২ সালে তাদের রির্পোট দাখিল করে। দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এই রির্পোট প্রণয়ন করা হয়। রির্পোট তৈরিতে সমসাময়িক বিশ্বের অন্যান্য দেশের অবস্থা ও বিবেচনা করা হয়। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রির্পোটে বাংলাদেশের নতুন প্রণীত সংবিধানের মৌলিক বিষয় প্রতিফলিত হয়। রির্পোটটি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অনিবার্যকারণবশত কমিটি'র সুপারিশ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়(শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮)।

এ কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৯৭৪ সালের প্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত প্রতিবেদনটি ১৯৭৪ সালের ৩০ মে '৭' খন্ডে "বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট" নামে প্রকাশিত হয় যা পরবর্তীতে "ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট" নামে পরিচিত হয় (খালেদুজ্জামান, ২০২০)।

এই কমিশনের সুপারিশের আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং সিলেবাস প্রণয়নের জন্য দেশের ৪৭ জন সুনামধন্য শিক্ষাবিদকে নিয়ে প্রফেসর সামছুল হুদা কে প্রধান করে ১৯৭৬ সালে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৭৬, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৮ সালে মোট ৭টি ভলিউমে রির্পোট সরকারের নিকট দাখিল করে (হুসাইন, ২০২২)।

ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে। এতে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা, নারীশিক্ষার উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের চর্চা, এবং স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় (শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৪)।

মোট ৩৬টি অধ্যায় ও ৪৩০ পৃষ্ঠায় গঠিত এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোকে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমুখী ব্যবস্থায় রূপান্তরের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সমাধানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়। শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান ও সংগ্রহের উৎসের সন্ধানের কথাও উল্লেখ করা হয়। ক্ষেত অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়।

একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০১০, যোগ্যতাভিত্তিক কারিকুলাম ২০১১ ও ২০২১ প্রণয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে এই কমিশন রিপোর্টের অবদান অনস্বীকার্য। এই কমিশনে মোট ৩৬ টি অধ্যায় আছে। এর কমিটিতে মোট ২৮ জন সদস্য ছিল।

কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে বর্ণিত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক সুনাগরিকরূপে গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে।

২. একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টির বন্দোবস্ত করতে হবে। নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতির অবসানের অনুকূল বিজ্ঞানমুখী আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

৩. বিপুল জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন করলে অনিবার্যভাবে জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ হবে। জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের সেই শিক্ষা এবং উপযুক্ত দক্ষতা দানের সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায়।

৪. দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সাথে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে। কৃষি, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে।

৫. শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয় বরং উপলব্ধি বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণাবলি বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য তারুণ্যের সৃজনশীলতা ও কর্মশক্তির যথাযথ মর্যাদাদান এবং শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

১. শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

২. শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতূহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলির সম্যক বিকাশ সাধন।

৩. মাতৃভাষায় লিখন, পঠন ও হিসাব রক্ষণের ক্ষমতা অর্জন, তদুপরি ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে যেসন মৌলিক জ্ঞান ও কলা-কৌশলের প্রয়োজন হবে সে সবের সাথে কিছুটা পরিচিতকরণ।

৪. পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা:

(ক) জীবনকেন্দ্রিক বাস্তবমুখী শিক্ষাসূচির অভাব।

(খ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং উদ্যোগী শিক্ষকের অপ্রতুলতা।

(গ) প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের অভাব।

(ঘ) সুলিখিত এবং চিত্তাকর্ষক পাঠ্যপুস্তকের অভাব।

(ঙ) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণ, খেলার সরঞ্জাম ও লাইব্রেরীতে পুস্তকের অভাব।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এ কমিশনে দেশের জনগণকে জাতি গঠনে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষিত করে তুলতে হলে একটি সর্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতির আবশ্যকীয়তা অনুভব করে। প্রাথমিক শিক্ষা হতে হবে বাধ্যতামূলক । এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এমন পর্যায়ের হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে স্বাধীন নাগরিকের সুযোগ সুবিধা সদ্ব্যবহার ও তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। আট বছরের কম মেয়াদী স্কুল শিক্ষায় এসব উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয়। সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য এই আট বছরের শিক্ষা অত্যাবশ্যক (আউয়াল,২০০৫)। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে আট হতে বার বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ চালু রয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশকে-

- প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সর্বজনীন করতে হবে।
- প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে।
- অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্পর্ণ অবৈতনিক, সর্বজনীন ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হয়।

১. দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক কারণে পাঁচ থেকে তের বছর বয়সী অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে পরিবারের আর্থিক উপার্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বলে তাদের পক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না। এ ধরণের শিক্ষার্থীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে তাদের জন্য প্রয়োজনবোধে নৈশ স্কুলে শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

২. মেয়ে শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যায় স্কুলেরগামী করার জন্য প্রাথমিক স্তরে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার উদ্দেশ্যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা ছাড়াও পাঠ্যসূচি ও স্কুলের পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

৪. দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সামাজিক চাহিদা, শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক স্বক্ষমতা এবং রুচির সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাক্রমের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৫. প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা পদ্ধতি হবে ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক।

৬. পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের চাইতে হাতে-কলমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সমগ্র দেশে সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক শিক্ষাক্রমভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।

৭. প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাধিক। এজন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক।

৮. গতিশীল ও বাস্তবত সম্মত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে যথার্থ ও জীবনঘনিষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পঠিতব্য বিষয় হচ্ছে: (১) বাংলা, (২) অংক, (৩) ইতিহাস, (৪) ভূগোল, (৫) বিজ্ঞান, (৬) দ্বিতীয় ভাষা, (৭) শরীরচর্চা ও খেলাধুলা, (৮) কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত, (৯) চিত্রাংকন, (১০) ধর্মশিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষা, (১১) হাতের কাজ, (১২) কৃষি সম্প্রসারণ কাজ। প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচি কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটির দ্বারা প্রণয়ন করা হবে।

৯. প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে সুসমন্বিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা দরকার।

১০. প্রাথমিক শিক্ষার সংগঠন, পরিচালনা, তত্ত্বাবদান ও উন্নয়ন এবং পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে "জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ" গঠন করতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৭

দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়নের উপায় পুণর্বিবেচনার লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার এস-৮/১০ এম-৮/২৭৬(১৫০) শিক্ষা আদেশে ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় **(ঢালী,২০০২)**। কমিশন বিভিন্ন সেমিনার, বৈঠক ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের পরামর্শ গ্রহণ করে। কমিশন ইউনেস্কোর সৌজন্যে কমিশনের দুই সদস্যের দুটি কমিটি থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপিনস এবং জাপান ভ্রমণ করে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন**(হুসাইন,২০২২)**। অতঃপর ১৯৮৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশের শিক্ষা সংস্কার, পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়নের দিকনির্দেশনা সংবলিত সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করেন ।

মফিজউদ্দিন কমিশন গঠনের প্রক্ষাপট

১৯৭৮ সালে সরকার কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং শিক্ষার সমস্যাবলি নতুনভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে একটি উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ দেওয়া হয়। এই কমিটি ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি 'অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি সুপারিশ' শিরোনামে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যাতে জনগণ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত কাঠামোকে তিনটি উপ-পর্যায়ে ভাগ করা হয়, নিম্ন মাধ্যমিক ৩ বছর, মাধ্যমিক ২ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর। এরপর ১৯৮৩ সালে মজিদ খান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু এই কমিশনের রিপোর্ট ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেনি এবং তা বাস্তবায়নের কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্যোগও নেয়া হয়নি। ফলে ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১. দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন করে তোলা।

২. দেশে নিরক্ষরতার অবসান ঘটান।

৩. সমাজের প্রতি স্তরের মানুষকে নিজ নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া।

৪.. নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চার করে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

৫. আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।

৬. বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মানুরাগ বৃদ্ধি করে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে জাতীয়সম্পদে পরিণত করা।

৭. শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা।

৯. বিশ্বের সকল দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একাত্মবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের বস্তুনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক ও সমাজ-সচেতন মানুষে পরিণত করা।

১০. মৌলিক চিন্তার স্বাধীন মত প্রকাশে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটান।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করা। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল-

(১) সাক্ষরতা, সংখ্যা ও সংখ্যা ব্যবহার সম্বন্ধে মৌলিক যোগ্যতা অর্জন।

(২) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুধাবন।

(৩) শিক্ষা ও কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং কাজ ও শ্রমের মর্যাদার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

(৪) স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের জন্য অভ্যাস ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

(৫) পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ সাধন।

(৬) সকল নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি।

(৭) সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও কর্মপ্রেরণার উৎস হিসাবে সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।

(৮) ব্যক্তি, পরিবার-সদস্য, সমাজ-সদস্য ও সুনাগরিক হিসাবে অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।

(৯) দেশ, দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।

(১০) জাতীয় সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া ও শ্রদ্ধাবোধ জাগানো।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো দুটি মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হবে।

(১) দুই হাজার সালের মধ্যে ৬-১০ বছর বয়সী সকল ছেলেমেয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

(২) আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ করা এবং এর গুণগত মানোন্নয়ন করা।

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান প্রেক্ষিতঃ

৬-১১ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এটা শিশুর সার্বিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে দ্রুত শিল্পায়ন সুনিশ্চিত করার জন্য সাক্ষরতা প্রয়োজন। তদুপরি ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ এবং পরিবার ও সমাজের কার্যকর সদস্য হিসেবে জীবনযাপন, নাগরিকের দায়িত্ব ও ধর্মীয় কর্তব্য পালনে সচেতনতা সৃষ্টি এবং জাতি ও বিশ্বমানবতার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্যও প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রায় এক কোটি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে এবং অধিকাংশ পঞ্চম শ্রেণী ও তার পূর্বে বিদ্যালয় ত্যাগ করে।

সুপারিশ:

১. বর্তমানে প্রচলিত পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে, ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য প্রবর্তন করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে ২০০০ সাল নাগাদ ৮বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী সকল স্তরের শিক্ষার ভিত্তি এবং অনেক শিক্ষার্থীর জন্য সমাপনী শিক্ষা বিধায় এই স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে অর্জিত শিক্ষা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে। বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, কর্ম অভিজ্ঞতা, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। শিক্ষকদের চাকুরীপূর্ব এবং চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৪. বিদ্যালয়গুলি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৫. বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদারকি ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৬. ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি উন্নয়নে, প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুতকরণে ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

৭. দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা সম্ভব। সুতরাং স্থানীয় সরকার ও জনগণের সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডে তাদের জড়িত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়স হবে ৩-৪ বছর। শিশু শিক্ষার জন্য এ সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এ সময়টা শিশুর জীবনের গঠনমূলক অধ্যায়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তির ফুরণের অনুকূল পরিবেশ এবং শিক্ষা অত্যাবশ্যক। মাতাপিতার সান্নিধ্যে গৃহ পরিবেশ তার সঠিক বিকাশে সহায়ক। তাই বিশ্বের অনেক দেশে ৫ বছর পর্যন্ত গৃহ পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে তা সম্ভব নয়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমান অবস্থা:

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় হলেও আমাদের দেশে এ পর্যায়ে সার্থক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

২. প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু শ্রেণীর শিক্ষা মোটেই সন্তোষজনক নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেনের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

৩. ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে অপরিকল্পিতভাবে অনেক কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে। তাদের বেশির ভাগ বিদ্যায়তনের সামগ্রিক পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী নয়।

৪. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্বল্প পরিসরে গৃহে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পরিচালিত হয় বলে এখানে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

৫. সরকারি নিয়মের প্রতি তোয়াক্কা না করে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মতানুসারে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়।

৬. শিশুর বিকাশ ও মনোবিজ্ঞানের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুদের ওপর অসম্ভব পড়ার চাপ সৃষ্টি করে থাকেন।

৭. কিন্ডারগার্টেনসমূহের শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ এবং শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়ক নয়।

৮. অনেক কিন্ডারগার্টেনে প্রাক প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

৯. উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ চালু থাকা কিন্ডারগার্টেনসমূহে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল করার প্রচেষ্টায় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হয় এবং একই প্রতিষ্ঠানে থাকায়, উপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের চালচলন শিশুদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

১০. এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতনের হার অত্যধিক। কিন্তু শিক্ষকদের কোনো বেতনক্রম ও নিয়োগনীতি নেই বলে শিক্ষকগণ অসন্তুষ্ট থাকেন এবং শিশুদের প্রতি সঠিক মনোনিবেশ করতে পারেন না। ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশে সহায়তা, আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষাদান, সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে পরবর্তী জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ শিক্ষা ব্যর্থ হচ্ছে।

সুপারিশ:

১. অনতিবিলম্বে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী খুলতে হবে।

২. এই কাজের জন্য শিক্ষাবিভাগ ছাড়াও সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিল্প ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

৩. প্রত্যেকটি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে পদ্ধতিগত ব্যবহারিক জ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান অঙ্কন, হাতের কাজ, খেলাধুলা, উপকরণ তৈরি এবং ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

৪. শহরাঞ্চলে কিন্ডারগার্টেনগুলোর সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে সরকারি নিবন্ধীকরণ রীতি ও নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। শহরে এবং শিল্পাঞ্চলে 'শিশু নীড়' গড়ে তুলে শ্রমিকদের সন্তানদের পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা:

১. ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৫ বছরমেয়াদী এবং পর্যায়ক্রমে ২০০০ সাল নগাদ ৮ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

২. বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী) ১৯৯৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতি বছর এক শ্রেণী করে বাধ্যতামূলক করতে হবে (১৯৯১ সালে ১ম, '৯২ সালে ২য়, '৯৩ সালে ৩য়, '৯৪ সালে ৪র্থ এবং '৯৫ সালে ৫ম শ্রেণী)।

৩. বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার জাতীয় সরকারকে সহায়তা করবে। বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। আর্থিক ব্যাপারে উভয় সরকার যৌথ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে। দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা থাকবে।

৪. দারিদ্র্যের নীচু স্তরের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বইপত্র, ইউনিফর্ম ও শিক্ষার উপকরণ দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

৫. স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিডার প্রাথমিক স্কুল স্থাপন এবং প্রয়োজনে শিফট ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ফসলের মৌসুমে ক্ষেতে-খামারের কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগের জন্য ছুটি বিন্যাস প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি: শিক্ষাক্রম প্রণয়নে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন-

১. জীবন ও সমাজের বাস্তব অবস্থার সাথে পরিচয় ঘটে
২. চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে
৩. নৈতিক মূল্যবোধের ভিত সৃষ্টি হয় এবং
৪. কর্ম ও বৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতা অর্জন হয়।

এক্ষেত্রে ১৯৭৪-এর শিক্ষা কমিশন নির্দেশিত পরিবেশ ও সমাজের চাহিদা, দৈহিক ক্ষমতা ও অভিরুচির সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র কর্মমুখী ও হাতে-কলমে কাজের গুরুত্ব দিতে হবে। চারু ও কারুকলা, বাঁশ, বেত, কাঠ, সুঁই, সুতা ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন হাতের কাজ, প্লাস্টিকের কাজ, হাঁস, মুরগি পালন, কৃষি কাজ ইত্যাদির

ওপর জোর দিতে হবে। ফসল কাটার সময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। শিক্ষাক্রম হবে নমনীয়। স্থানীয় অবস্থা ও চাহিদার ভিত্তিতে 'শেখ ও উপার্জন কর' কর্মসূচি থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ:

১. শিক্ষকতার যোগ্যতা হবে কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় বিভাগ এবং এক বছরের প্রশিক্ষণ।

২. শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও তাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি প্রবণতা থাকতে হবে। নিয়োগের পূর্বে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রবণতা যাচাই করতে হবে।

৩. প্রশিক্ষণবিহীন উচ্চশিক্ষার ডিগ্রীধারীকেও প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

৪. প্রধান শিক্ষকের পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ যোগ্যতা ছাড়াও হায়ার সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (এইস.সি. ইন, এডুকেশন) ডিপ্লোমাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

প্রশিক্ষণঃ

প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ হবে তিনভাবে-

১. নিয়োগের পর প্রস্তুতিমূলক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ;
২. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং
৩. চাকরিকালীন স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ।
৪. প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনায় থাকবে নেপ, পি. টি. আই. বা আই. ই. আর।
৫. নেপ, ময়মনসিংহের কর্মসূচি আরো জোরদার করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা, গবেষণা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রস্তুতি এবং উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এই প্রতিষ্ঠানকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করতে হবে।

অর্থ সংস্থানের জন্য প্রয়োজন:

১। জরিপের মাধ্যমে কোথায় কতটি নতুন বিদ্যালয় হবে তা নির্ণয়;

২। স্থানীয় উদ্যোগে জায়গা, গৃহ, আসবাবপত্র ইত্যাদি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের অগ্রাধিকার দান;

৩। জাতীয় সরকার কর্তৃক কেবল বেতন বহন এবং বিদ্যালয় গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য দায়িত্ব স্থানীয় জনসাধারণকে অর্পণ;

৪। দরিদ্র এলাকায় সরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা;

৫। স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং

৬.। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে করারোপের ক্ষমতা প্রদান।

শামসুল হক শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭

ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪ সালে তাদের রিপোর্ট দাখিল করে। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত এ কমিটি'র সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তৎকালীন সরকার ১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারিতে জারিকৃত এক আদেশের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮তম উপাচার্য প্রফেসর এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করে। বাস্তবধর্মী, গণমুখী ও গতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে এই কমিটিটি কাজ শুরু করে। প্রফেসর এম. শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি শামসুল হক শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ নামে পরিচিত **(হুসাইন, ২০২২)।**

কমিশন দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি কার্যসিদ্ধিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। যেটি "জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন রিপোর্ট, ১৯৯৭" নামে পরিচিত **(শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮)**। তারা দেশের জন্য উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং ১৯৯৭ সালে কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে। এই

রিপোর্টের আলোকেই পাশ হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি–২০০০'। শামসুল হক খান শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ এর রিপোর্টটি মন্ত্রিপরিষদে দাখিল করা হলে তা পর্যালোচনা করার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তিতে মন্ত্রিপরিষদ কমিটি কর্তৃক রিভিউ রিপোর্টটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয় **(শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮)**।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। ২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা। ৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো। ৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। ৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা। ৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।	৭ গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা। ৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। ৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। ১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। ১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। ১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender rias) দূর করা। ১৩ শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো। ১৪. পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার অনন্য ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। এ অবস্থার অবসান বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে, অনেকে পরবর্তী শিক্ষান্তরে প্রবেশ করে। প্রথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠ। ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলি অর্জন করতে সহায়তা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করে একে জাতির শিক্ষার স্বার্থে নিয়োজিত করতে হবে।

সুপারিশ

১.প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হবে। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

২.সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত

ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকবে।

৩.প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

৪.প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৫.প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১: ৩৫।

৬.প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে।

৭.প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়।

৮.শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগাতা হবে নিম্ন প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ মহিলা এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক এবং তিন বছরের মধ্যে সি ইন এড বা বি এড (প্রাইমারি) অর্জন করতে হবে।

৯.শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০.শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিগ্রিধারী যোগ্যতাসম্পন্নদের সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১.শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে।

১২.ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

১৩ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।

১৪.প্রাথমিক স্তরের সব ধরনের শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার ও ম্যানেজিং কমিটির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

১৫.তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

১৬.প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

১৭.শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দুই হাজার সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্তত তিন শতাংশ এবং সমগ্র শিক্ষার জন্য অন্তত পাঁচ শতাংশ উন্নীত করা উচিত।

১৮.সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

সুপারিশ ইসলাম শিক্ষা

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠাপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৩ সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

১. সকল ধর্মের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক ও কোর্সের ব্যবস্থাসহ সমান ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিচয়মূলক জ্ঞান দিতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় তত্ত্ব ও উপাখ্যান জানবে এবং ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে।

২. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্ম দর্শন, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাখ্যান, মহাপুরুষদের জীবনী, নিজ নিজ ধর্মীয় ভাষা ও সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান সংবলিত নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সকল শ্রেণীর বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর জন্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণীতে পালি ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকবে। সনাতন পদ্ধতির সনদপত্রের সমতা বিধান করতে হবে। সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডে রূপান্তর করতে হবে।

খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে থাকবে নৈতিক শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিমাপণ, তত্ত্বনির্মাণ, বিশ্লেষণ ও গাণিতিক যুক্তিপ্রয়োগ এবং সমগ্র তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়সাধন। বিজ্ঞানের গতিশীলতা, পরিবর্তনীয়তা ও সৃজনশীলতা বিজ্ঞান শিক্ষার ধারায় সুনিশ্চিত করাতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞানের সাধনা ও সৃষ্টিশীলতায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে। শিক্ষার সব স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষার উক্ত উদ্দেশ্য অনুস্মরণ করা হবে।

সুপারিশ

১. বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। শিশুদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হয়ে প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও সহজ নিয়মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করে।
২. শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক সঠিক তথ্য প্রদান করে উৎসাহিত করবেন।
৩. প্রকৃতির রহস্য উৎঘাটনে বিজ্ঞান একটি সৃজনশীল, সক্রিয় ও আনন্দঘন কর্মকান্ডের আয়োজন- এই সত্যটি যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সম্পর্কে শিশুর যাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেজন্য নানাবিধ চিত্র প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও সহজ পরীক্ষণের ব্যাবস্থা থাকতে হবে।
৫. বিজ্ঞান বইয়ে যথাসম্ভব আধুনিক আবিষ্কারের ঘটনা ও উদাহরণ সহজ ভাবে উপস্থাপিত হবে।
৬. প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় ভাগে (ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী) বিজ্ঞানের বিবিন্ন শাখার একটি সমন্বিয় কোর্স থাকবে।
৭. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
৮. বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রতিটি স্তরে বেভার, টেলিভিশন, অডিও-ভিডিও রেকর্ড, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে।
৯. মেধাবী ও সৃজনশীল স্নাতকদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে।
১০. প্রতিটি শহরে একটি 'বিজ্ঞান কেন্দ্র' গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান পাঠাগার ও ওয়ার্কশপ থাকবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

কোন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরের উপর এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এই উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করা হয়েছে, শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের কতটুকু বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করাই হলো পরীক্ষা ও মূল্যায়নের কাজ। মূল্যায়ন হল একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপণ করা।

সুপারিশ

১. স্কুলকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকতে পারে।
২. শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য প্রতি বছর সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার বাবস্থা থাকতে হবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা থাকবে।
৩. প্রাথমিক স্তরের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলগুলোকে সেখান থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৪. যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সমদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর আন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।
৭. পরীক্ষায় ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। পরীক্ষায় কোন মেধা তালিকা থাকবে না।
৯. প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, এবং যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে। উত্তরপত্রের সম্মানী যুগোপযোগী করতে হবে।
১১. প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত কোন স্তরেই শিক্ষার্থীদের জন্য কোন গাইড বই, নোট বই রাখা চলবে না। প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করতে হবে।
১২. শিক্ষক ছাত্র অনুপাত হবে প্রাথমিক স্তরে ১:৩৫ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১:৪০।।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি বিরাজমান, তাই আশানুরূপ ফলাফল হচ্ছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়।

সুপারিশ

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

২. প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

৩. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জনাও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার হবে।

৪. প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের একটি পুনির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের কমপক্ষে তিন মাস ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬. ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য যে দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে সে দুটি বিষয় ছাত্রজীবনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষালাভ করেছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৭. প্রশিক্ষণে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ।

৮. সকল শিক্ষকের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মরত শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরণের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

১০. প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে। তাই, পরিকল্পিত শিক্ষা বাবস্থায় শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তণের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জোগানদাতা হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুপারিশ

ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন।

২. প্রাথমিক স্তরের এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিডিক (Competency based আবশ্যকীয় শিখনক্রমের Essential Learning Continua ভিত্তিতে রচিত হবে।

৩. শিক্ষক্রেম ও পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ও পাঠ্যসূচিসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।

৫. আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় তার প্রতিফলন যাবে।

৬. জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন যেন হয় তাঁর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ. পাঠ্যপুস্তক

১. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে বর্তমানে অনুসৃত নীতিমালা অব্যাহত থাকতে পারে।

৩. আগ্রহী ও সামর্থবান অভিভাবকরা যেন খোলাবাজারে বই ক্রয় করতে পারে সেজন্য সাদা কাগজে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৪. দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত শহরাঞ্চলের সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যূনতম মূল্যে বই প্রাপ্তির ব্যবস্থা বিবেচনা করা যায়।

৫. প্রাথমিক স্তরের বই কিভাবে একাধিক শিক্ষাবর্ষে ব্যবহার করা যায় সে জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৮. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন ও মুদ্রণের গুণগতমান ও ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি 'পাঠ্যপুস্তক আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী ও নির্ধারিত হারে রয়েলটি প্রদান করতে হবে।

১০। সরকারি অর্থানুকল্য উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক শিক্ষা

সমন্বিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অতীতে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনেও শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের আলোকে ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বিশাল কাঠামো, তবুও অনস্বীকার্য যে এসব সুপারিশ অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় নি। তাই প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা আবশ্যক।

সুপারিশ

১. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের আরও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৩. শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে একটি পৃথক শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

৪. বর্তমানে শিক্ষকদের থানার বাইরে বদলির নিয়ম না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের আন্তঃথানা বদলির নীতি প্রণয়ন করতে হবে।।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৩

২০০২ সালের ২১ অক্টোবর তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার ২৫ সদস্যের শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের প্রধান হচ্ছে ড. মনিরুজ্জামান মিঞা। এ কমিশন ১২টি উপকমিটি গঠন করে তাদের সহযোগিতায় কমিশনের রিপোর্ট তৈরি করেন। ৩১, মার্চ ২০০৪ইং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্ট তুলে দেয়া হয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের উপায় বের করা ছিল যার উদ্দেশ্য (আউয়াল,২০০৫)। সাধারণ শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, বিশেষায়িত শিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত এই রিপোর্টে সর্বমোট ৮৮০ টি সুপারিশ উত্থাপন করা হয়।

ড. মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন, ২০০৩ গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারিতে জারিকৃত এক আদেশের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালইয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিশনের লক্ষ্য ছিলো একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। উক্ত কমিটি দেশের জন্য উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং একই বছর কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে যেটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট, ১৯৯৭ নামে পরিচিত (মালেক, ২০০৭)।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট, ১৯৯৭ উপর ভিত্তি করে ২০০০ সালে শিক্ষানীতি, ২০০০ প্রণয়ন ও পাশ হয়। এরপর ২০০১ সালে ড. এম এ বারীর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করা। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ও পরিবর্তনের সুপারিশ করে ২০০২ সালে তারা রিপোর্ট প্রদান করে। এম.এ বারী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের উপায় বের করা ছিল যার উদ্দেশ্য। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে এই কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে (আউয়াল,২০০৫)।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ

শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিমূল বা প্রথম স্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। এই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেছে-

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।
২. পাঁচ বছর বয়সী সকল শিশুকে স্কুলে আনার ব্যবস্থা করা। এ দায়িত্ব পালন করবে স্কুল পরিচালনা পরিষদ।
৩. স্কুল ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে আগামী ১০ বছরের প্রতি বছরে ১০০টি করে (মোট ১০০০টি) স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়হীন দুর্গম ও নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা অধ্যুষিত এলাকাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
৪. প্রতিটি স্কুলে কমপক্ষে ৬ জন শিক্ষক ও ৬টি শ্রেণীকক্ষ থাকতে হবে।
৫. সব ধরনের প্রাথমিক স্কুলকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।
৬. বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন ও এনজিও স্কুলগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে।
৭. সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম- এই তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল পাঠ্য বিষয়ে সমতা আনতে হবে।
০৮. আগামী ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৩০ এবং এর পরের ১০ বছরের মধ্যে ১:২৫-এর নামিয়ে আনতে হবে।
৯. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।
১০. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।
১১. বর্তমানের ১১ সদস্যের স্কুল পরিচালনা পরিষদে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মীয় নেতার মধ্য থেকে দুজনকে মনোনয়ন দিয়ে এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩তে উন্নীত করা হবে।
১২. ছাত্র-শিক্ষক সংযোগকাল বছরের ২২০টি কার্যদিবস ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ন্যূনতম ৭২০ ঘণ্টা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ১২৭৫ ঘন্টা নির্ধারণ করতে হবে।

মাদ্রাসাঃ

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা। দেশের এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়। এবং মাদ্রাস শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে কশিমন নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করেছে-

১.পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট ত্রূটি রয়েছে বিধায় সেগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে নিবিড় পরিদর্শন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. পর্যায়ক্রমে এবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণ করতে হবে।

৩. বিসিএস-এ মাদ্রাসা শিক্ষা ক্যাডার প্রবর্তন করা।

শামসুল হক শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭

ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪ সালে তাদের রিপোর্ট দাখিল করে। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত এ কমিটি'র সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তৎকালীন সরকার ১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারিতে জারিকৃত এক আদেশের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮তম উপাচার্য প্রফেসর এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করে। বাস্তবধর্মী, গণমুখী ও গতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে এই কমিটিটি কাজ শুরু করে। প্রফেসর এম. শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি শামসুল হক শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ নামে পরিচিত (হুসাইন, ২০২২)।

কমিশন দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি কার্যসিদ্ধিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। যেটি "জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন রিপোর্ট, ১৯৯৭" নামে পরিচিত (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮)। তারা দেশের জন্য উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং ১৯৯৭ সালে কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে। এই রিপোর্টের আলোকেই পাশ হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি–২০০০'। শামসুল হক খান শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ এর রিপোর্টটি মন্ত্রিপরিষদে দাখিল করা হলে তা পর্যালোচনা করার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তিতে মন্ত্রিপরিষদ কমিটি কর্তৃক রিভিউ রিপোর্টটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয় (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৮)।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহাদ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৭ গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।
৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।
১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।
১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender rias) দূর করা।
১৩ শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।
১৪. পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার অনন্য ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। এ অবস্থার অবসান বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে, অনেকে পরবর্তী শিক্ষান্তরে প্রবেশ করে। প্রথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠ। ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলি অর্জন করতে সহায়তা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করে একে জাতির শিক্ষার স্বার্থে নিয়োজিত করতে হবে।

সুপারিশ

১.প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হবে। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

২.সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকবে।

৩.প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

৪.প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৫.প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১: ৩৫।

৬.প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে।

৭.প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়।

৮.শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগাতা হবে নিম্ন প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ মহিলা এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি

নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক এবং তিন বছরের মধ্যে সি ইন এড বা বি এড (প্রাইমারি) অর্জন করতে হবে।

৯.শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০.শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিগ্রিধারী যোগ্যতাসম্পন্নদের সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১.শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে।

১২.ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

১৩.বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।

১৪.প্রাথমিক স্তরের সব ধরনের শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার ও ম্যানেজিং কমিটির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

১৫.তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

১৬.প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

১৭.শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দুই হাজার সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্তত তিন শতাংশ এবং সমগ্র শিক্ষার জন্য অন্তত পাঁচ শতাংশ উন্নীত করা উচিত।

১৮.সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

সুপারিশ ইসলাম শিক্ষা

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠাপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৩ সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

১. সকল ধর্মের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক ও কোর্সের ব্যবস্থাসহ সমান ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিচয়মূলক জ্ঞান দিতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় তত্ত্ব ও উপাখ্যান জানবে এবং ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে।

২. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্ম দর্শন, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাখ্যান, মহাপুরুষদের জীবনী, নিজ নিজ ধর্মীয় ভাষা ও সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান সংবলিত নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সকল শ্রেণীর বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর জন্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণীতে পালি ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকবে। সনাতন পদ্ধতির সনদপত্রের সমতা বিধান করতে হবে। সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডে রূপান্তর করতে হবে।

খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে থাকবে নৈতিক শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিমাপণ, তত্ত্বনির্মাণ, বিশ্লেষণ ও গাণিতিক যুক্তিগ্রয়োগ এবং সমগ্র তথা ও তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়সাধন। বিজ্ঞানের গতিশীলতা, পরিবর্তনীয়তা ও সৃজনশীলতা বিজ্ঞান শিক্ষার ধারায় সুনিশ্চিত করাতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞানের সাধনা ও সৃষ্টিশীলতায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে। শিক্ষার সব স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষার উক্ত উদ্দেশ্য অনুস্মরণ করা হবে।

সুপারিশ

১. বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। শিশুদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হয়ে প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও সহজ নিয়মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করে।

২. শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক সঠিক তথ্য প্রদান করে উৎসাহিত করবেন।

৩. প্রকৃতির রহস্য উৎঘাটনে বিজ্ঞান একটি সৃজনশীল, সক্রিয় ও আনন্দঘন কর্মকান্ডের আয়োজন- এই সত্যটি যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সম্পর্কে শিশুর যাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেজন্য নানাবিধ চিত্র প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও সহজ পরীক্ষণের ব্যাবস্থা থাকতে হবে।

৫. বিজ্ঞান বইয়ে যথাসম্ভর আধুনিক আবিষ্কারের ঘটনা ও উদাহরণ সহজ ভাবে উপস্থাপিত হবে।

৬. প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় ভাগে (ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী) বিজ্ঞানের বিবিন্ন শাখার একটি সমন্বিয় কোর্স থাকবে।

৭. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৮. বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রতিটি স্তরে বেভার, টেলিভিশন, অডিও-ভিডিও রেকর্ড, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে।

৯. মেধাবী ও সৃজনশীল স্নাতকদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে।

১০. প্রতিটি শহরে একটি 'বিজ্ঞান কেন্দ্র' গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান পাঠাগার ও ওয়ার্কশপ থাকবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

কোন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরের উপর এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এই উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করা হয়েছে, শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের কতটুকু বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করাই হলো পরীক্ষা ও মূল্যায়নের কাজ। মূল্যায়ন হল একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপণ করা।

সুপারিশ

১. স্কুলকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকতে পারে।

২. শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য প্রতি বছর সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার বাবস্থা থাকতে হবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা থাকবে।

৩. প্রাথমিক স্তরের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলগুলোকে সেখান থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৪. যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সমদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর আন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৭. পরীক্ষায় ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। পরীক্ষায় কোন মেধা তালিকা থাকবে না।

৯. প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, এবং যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান করতে হবে। উত্তরপত্রের সম্মানী যুগোপযোগী করতে হবে।

১১. প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত কোন স্তরেই শিক্ষার্থীদের জন্য কোন গাইড বই, নোট বই রাখা চলবে না। প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করতে হবে।

১২. শিক্ষক ছাত্র অনুপাত হবে প্রাথমিক স্তরে ১:৩৫ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১:৪০।।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি বিরাজমান, তাই আশানুরূপ ফলাফল হচ্ছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়।

সুপারিশ

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

২. প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

৩. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জনাও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার হবে।

৪. প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের একটি পুনির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের কমপক্ষে তিন মাস ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬. ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য যে দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে সে দুটি বিষয় ছাত্রজীবনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষালাভ করেছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৭. প্রশিক্ষণে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ।

৮. সকল শিক্ষকের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মরত শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরণের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

১০. প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে। তাই, পরিকল্পিত শিক্ষা বাবস্থায় শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তণের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জোগানদাতা হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুপারিশ

ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন।

২. প্রাথমিক স্তরের এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিডিক (Competency based আবশ্যকীয় শিখনক্রমের Essential Learning Continua ভিত্তিতে রচিত হবে।

৩. শিক্ষক্রেম ও পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ও পাঠ্যসূচিসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।

৫. আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় তার প্রতিফলন যাবে।

৬. জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন যেন হয় তাঁর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ. পাঠ্যপুস্তক

১. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে বর্তমানে অনুসৃত নীতিমালা অব্যাহত থাকতে পারে।

৩. আগ্রহী ও সামর্থবান অভিভাবকরা যেন খোলাবাজারে বই ক্রয় করতে পারে সেজন্য সাদা কাগজে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৪. দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত শহরাঞ্চলের সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যূনতম মূল্যে বই প্রাপ্তির ব্যবস্থা বিবেচনা করা যায়।

৫. প্রাথমিক স্তরের বই কিভাবে একাধিক শিক্ষাবর্ষে ব্যবহার করা যায় সে জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৮. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন ও মুদ্রণের গুণগতমান ও ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য একটি 'পাঠ্যপুস্তক আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী ও নির্ধারিত হারে রয়েলটি প্রদান করতে হবে।

১০। সরকারি অর্থানুকল্য উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক শিক্ষা

সমন্বিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অতীতে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনেও শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের আলোকে ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বিশাল কাঠামো, তবুও অনস্বীকার্য যে এসব সুপারিশ অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় নি। তাই প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা আবশ্যক।

সুপারিশ

১. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের আরও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৩. শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে একটি পৃথক শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

৪. বর্তমানে শিক্ষকদের থানার বাইরে বদলির নিয়ম না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের আন্তঃথানা বদলির নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৩

২০০২ সালের ২১ অক্টোবর তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার ২৫ সদস্যের শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের প্রধান হচ্ছে ড. মনিরুজ্জামান মিঞা। এ কমিশন ১২টি উপকমিটি গঠন করে তাদের সহযোগিতায় কমিশনের রিপোর্ট তৈরি করেন। ৩১, মার্চ ২০০৪ইং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্ট তুলে দেয়া হয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের উপায় বের করা ছিল যার উদ্দেশ্য(আউয়াল,২০০৫)। সাধারণ শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, বিশেষায়িত শিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত এই রিপোর্টে সর্বমোট ৮৮০ টি সুপারিশ উত্থাপন করা হয়।

ড. মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন, ২০০৩ গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারিতে জারিকৃত এক আদেশের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালইয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিশনের লক্ষ্য ছিলো একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। উক্ত কমিটি দেশের জন্য উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং একই বছর কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে যেটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট, ১৯৯৭ নামে পরিচিত (মালেক, ২০০৭)।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট, ১৯৯৭ উপর ভিত্তি করে ২০০০ সালে শিক্ষানীতি, ২০০০ প্রণয়ন ও পাশ হয়। এরপর ২০০১ সালে ড. এম এ বারীর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করা। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ও পরিবর্তনের সুপারিশ করে ২০০২ সালে তারা রিপোর্ট প্রদান করে। এম.এ বারী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের উপায় বের করা ছিল যার উদ্দেশ্য। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে এই কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে (আউয়াল,২০০৫)।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ

শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিমূল বা প্রথম স্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। এই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেছে-

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

২. পাঁচ বছর বয়সী সকল শিশুকে স্কুলে আনার ব্যবস্থা করা। এ দায়িত্ব পালন করবে স্কুল পরিচালনা পরিষদ।

৩. স্কুল ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে আগামী ১০ বছরের প্রতি বছরে ১০০টি করে (মোট ১০০০টি) স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়হীন দুর্গম ও নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা অধ্যুষিত এলাকাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৪. প্রতিটি স্কুলে কমপক্ষে ৬ জন শিক্ষক ও ৬টি শ্রেণীকক্ষ থাকতে হবে।

৫. সব ধরনের প্রাথমিক স্কুলকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

৬. বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন ও এনজিও স্কুলগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে।

৭. সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম- এই তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল পাঠ্য বিষয়ে সমতা আনতে হবে।

০৮. আগামী ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৩০ এবং এর পরের ১০ বছরের মধ্যে ১:২৫-এর নামিয়ে আনতে হবে।

৯. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।

১০. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

১১. বর্তমানের ১১ সদস্যের স্কুল পরিচালনা পরিষদে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মীয় নেতার মধ্য থেকে দুজনকে মনোনয়ন দিয়ে এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩তে উন্নীত করা হবে।

১২. ছাত্র-শিক্ষক সংযোগকাল বছরের ২২০টি কার্যদিবস ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ন্যূনতম ৭২০ ঘণ্টা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ১২৭৫ ঘন্টা নির্ধারণ করতে হবে।

মাদ্রাসাঃ

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা। দেশের এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়। এবং মাদ্রাস শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে কশিমন নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করেছে-

১.পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট ত্রূটি রয়েছে বিধায় সেগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে নিবিড় পরিদর্শন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. পর্যায়ক্রমে এবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণ করতে হবে।

৩. বিসিএস-এ মাদ্রাসা শিক্ষা ক্যাডার প্রবর্তন করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

২০০৯ সালে অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্যের একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিশন গঠিত হয় যা 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' নামে পরিচিত। স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এমন শিক্ষানীতি যেটি কোন সরকার বাস্তবায়ন করে এবং তাঁর আলোকে শিক্ষাক্রম-২০১৬ ও সমন্বিত জাতীয় কারিকুলাম ২০২১ ও প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলাম ২০২২ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়।

শিক্ষানীতি কী?

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেমন নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি আছে তেমনি শিক্ষা বা শিক্ষা ব্যবস্থা সুন্দর, সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য এমন নিয়ন-নীতি থাকা আবশ্যক। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার সূত্রকেই শিক্ষানীতি বলা হয়। শিক্ষানীতি শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য অব্যার্থ হাতিয়ার ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণস্পন্দন। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, করণীয় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন প্রেক্ষাপট

১৯৯৭ সালে প্রফেসর এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে শিক্ষা কমিশনটি গঠন করা হয় একটি বাস্তবধর্মী, গণমুখী ও গতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য। ৫৬ সদস্যের এই কমিটিটি ১৯৯৭ সালে কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে। এই রিপোর্টের আলোকেই পাশ হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি–২০০০'। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি–২০০০ কে রাজনৈতিক কারনে ২০০১ সালে স্থগিত করা হয়। বাস্তবায়িত না হওয়া শিক্ষানীতি-২০০০কে যুগোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্যের একটি শিক্ষানীতি

প্রণয়ন কমিশন গঠিত হয়। তারা 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' নামে একটি খসড়া সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেন এবং সরকার তা অনুমোদন করে বাস্তবায়ন করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর মোট ২৮টি অধ্যায়ে আছে। এগুলো হলো-

১. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; ২. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা; ৩. বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা; ৪. মাধ্যমিক শিক্ষা; ৫. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা; ৬. মাদরাসা শিক্ষা; ৭. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা; ৮. উচ্চশিক্ষা; ৯. প্রকৌশলশিক্ষা;	১০. চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা; ১১. বিজ্ঞানশিক্ষা; ১২. তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা; ১৩. ব্যবসায়শিক্ষা; ১৪. কৃষিশিক্ষা; ১৫. আইনশিক্ষা; ১৬. নারীশিক্ষা; ১৭. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা; ১৮. বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী;	১৯. ক্রীড়াশিক্ষা; ২০. গ্রন্থাগার; ২১. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন; ২২. শিক্ষার্থী কল্যাণ ও নির্দেশনা; ২৩. শিক্ষার্থী ভর্তি; ২৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ; ২৫. শিক্ষকগণের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব; ২৬. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক; ২৭. শিক্ষা প্রশাসন; ২৮. শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ।

শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

শিক্ষানীতি ২০১০ এর মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করা। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা;
২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা;
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, কর্তব্যবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো;
৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা;
৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা;
৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে সহায়তা প্রদান করা;

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বভাতত, সৌহার্দ্য ও মানুষের সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা;

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা;

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা;

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

১১. বিশ্বপরিমণ্ডলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা;

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা;

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা;

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান;

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা;

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা;

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থকরা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা;

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা;

১৯. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা;

২০. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেলক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা;

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা;

২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো;

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা;

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২৭. বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা;

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;
২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৩০. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতিগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে:

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন।
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কৌশল

১. অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষাউপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।
২. শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।
৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করা হবে। তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হবে।
৪. মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞান আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষাপ্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ বলে গণ্য করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

১.মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।
২.কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।

৩.শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
৪.মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
৫.শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
৬.শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৭.শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৮.প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৯.শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।
১০.সবধরণের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাস্তবায়ন কৌশল

রাষ্ট্রের দায়িত্ব: সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে উল্লেখ্য আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করে করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারন করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা:
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল

রাষ্ট্রের দায়িত্ব: সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে উল্লেখ্য আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করে করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারন করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা:
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষার সমন্বয়

- একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সবধরণের মাদরাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমতিসাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।
- শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সবধরণের মাদরাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।
- বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাধারণ, কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজী মাধ্যম ও সবধরণের মাদরাসা সহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়মনীতি মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি:

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।

১. সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে।

২. সর্বত্র অবকাঠামো তৈরী এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি-সহজপাঠ্য ও অনুশীলন পুস্তক ভিত্তিক হবে।

৩. মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান¡য়ে ওপরের শ্রেণিসমূহে প্রয়োজনানুসারে জোরদার করা হবে।

৪. প্রথম শ্রেণি থেকে সহশিক্ষাক্রম বিষয় থাকতে পারে।

৫. প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

৬. প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে তারা কোন কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রহস্যকে বিজ্ঞান উন্মোচন করে যাচ্ছে। এটি একদিকে মানবজাতির অজানাকে জানার কৌতূহলকে পূরণ করে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান প্রতিনিয়তই নানা ধরণের প্রযুক্তির ব্যবহারের ভেতর দিয়ে মানবসভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা জাতিকে দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:-

- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তজার্তিক মান অর্জন করতে পারে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

প্রাথমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বাস্তবায়ন কৌশল

১. বিজ্ঞান শিক্ষা একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সঙ্গে পরিচিত করে শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। শুরু থেকেই তাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা হবে।

শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের জন্যে নানারকম চিত্র, ভিডিও প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের পক্ষেই সহজেই করা সম্ভব এমন সব পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২. শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক সবসময়েই উৎসাহিত করবেন। নানারকম তথ্য মুখস্থ না করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সেসব তথ্যব্যবহারের ক্ষমতাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবেন।

৩. প্রাথমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে। পাঠ্যপুস্তক সহজবোধ্য, সচিত্র এবং আকর্ষণীয় হবে। স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পাঠদান করা হবে।

ভর্তির বয়স

১. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।
২. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ:

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে সেদিকে নজর দেয়া হবে এবং শিক্ষা পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক, পঠনে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক।

- সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

শিক্ষা-সামগ্রী

১. প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলির ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক পঠন সামগ্রী এবং অনুশীলন পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও অনুশীলন সম্বলিত পুস্তক) প্রণয়ন করবে।
২. সকল পাঠ্যপুস্তক সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল করা হবে।
৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।

ঝরেপড়া সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ ও কৌশল

১. দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।
২. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।
৩. দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা করা হবে।
৪. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করা।
৫. হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।
৬. মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলক ভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।
৭. বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণি শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝরেপড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন অষ্টম শ্রেণি শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

আদিবাসী শিশু

১. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।
২. আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেয়া হবে।

প্রতিবন্ধী শিশু

১. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব সুযোগ-সুবিধা, যেমন-শৌচাগার ব্যবহারসহ চলাফেরা করা ও অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।
২. প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনা করা হবে।
৩. প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু

অতিবঞ্চিত ও পথশিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভিন্ন ধরনের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রকট বৈষম্য

বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে। সেই লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে অবস্থিত স্কুলসহ গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহকে পরিকল্পিত কর্মসূচির ভিত্তিতে বিশেষ সহায়তা দেয়া হবে, যাতে কয়েক বছরের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

শিক্ষণ পদ্ধতি

শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হবে এবং সেজন্য সহায়তা দেয়া হবে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন
২. তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা
৩. পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে
৪. অষ্টম শ্রেণি শেষে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি এবং শিখন-শেখানো

১. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত ও পদাধিকার বলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য সম্বলিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরওসক্রিয় করা হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরও ক্ষমতা দেয়া হবে। তবে পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।
২. সক্রিয় অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদেরকে বিদ্যালয় এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে আরও উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি

১. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাশ।
২. ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রি।
৩. নিচের শ্রেণিতে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া হবে।
৪. যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে এ সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সি-ইন-এড/বি.এড অর্জন করতে হবে।
৫. প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে সি-ইন-এড বা বি.এড (প্রাইমারি) ডিগ্রি অর্থাৎ ডিপিএড অর্জন করতে হবে।
৬. শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল যথোপোযুক্ত বিন্যাস করে (যথা- সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে।
৭. অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে; পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে।
৮. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রয়োজনবোধে ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। দেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়ান হবে।
৯. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। উচ্চতর ডিগ্রিধারী এবং প্রশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সরাসরি নিয়োগ প্রদান এবং পদোন্নতি ত্বরান্বিত করে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা করা হবে।
১০. প্রয়োজনে পদ উন্নীত করা হবে। তবে এর জন্য যথাযথ বিধি-বিধান তৈরী করা হবে।

শিক্ষক নির্বাচন

১. সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদরাসাসমূহের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।
২. কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে।
৩. যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে।
৪. এই নির্বাচন উপজেলা বা জেলা ভিত্তিক হবে।
৫. কমিশন দ্বারা নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেবে।
৬. বিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক বছর কতজন শিক্ষক প্রয়োজন তা উপজেলা/থানা ভিত্তিক সমন্বয় করে কমিশনকে জানাবে
৭. চাহিদার ভিত্তিতে এক বছরের জন্য বিষয়ওয়ারী শিক্ষক নির্বাচনের জন্য উপজেলা/থানা ভিত্তিক লক্ষ্যস্থির করা হবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর; তাই এই দায়িত্ব দক্ষতার সাথে যাতে প্রধান শিক্ষকগণ পালন করতে পারেন সেজন্য তাঁদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বহি:তত্ত্বাবধানের ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। একাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে বাস্তবসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হবে যাতে তাঁরা তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

অন্যান্য

১. প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা বাড়ানো হবে। কোন গ্রামে বিদ্যালয় নেই বা কোন গ্রামে আরওবিদ্যালয় প্রয়োজন তা জরিপের মাধ্যমে স্থির করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হবে।

২. ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে যেন তা কার্যকরভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে: পিটিআইগুলোর অ্যাকাডেমিক স্টাফদের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম তৈরী ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণ তত্তাবধান, প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিপ্লোমা প্রদান করা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, কর্মশালা, সম্মেলন পরিচালনা ইত্যাদি।

৩. সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

৪. . শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আচরণিক সচেতনতা (যেমন নখ কাটা, হাত ধোয়া, দাঁত পরিস্কার করা ইত্যাদি) সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তথ্যসূত্র:

- বাংলাপিডিয়া- এশিয়াটিক সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০
- Retrived from https://shed.gov.bd/ education report 1974
- https://shed.gov.bd/site/page/9d3bb05d-cb48-4ee1-bdee-f816cb574b4c
- https://bn.wikipedia.org/wiki/কুদরাত-এ-খুদা_শিক্ষা_কমিশন,_১৯৭২
- https://www.teachers.gov.bd/blog/details/780708
- https://fateh24.com/একনজরে-বাংলাদেশের-শিক্ষা/
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার(১৯৭৪); ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা।
- বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০
- বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০১০
- বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম ২০১১
- বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম রূপরেখা ২০২১(পরিমার্জিত ২০২৫)
- বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম রূপরেখা ২০২২,প্রাক-প্রাথমিক অংশ, (পরিমার্জিত ২০২৫)
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার(১৯৮৭); শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার(১৯৯৭); শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার(২০০৩); শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা।
- ঢালী, স্বপন কুমার ও রেজা ইমাম (২০০২), শিক্ষার ভিত্তি, প্রভাতী লাইব্রেরী, ঢাকা
- মালেক, আব্দুল ও অন্যান্য (২০০৭), শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যাল্য মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাও, ধাকা-১২০৭
- খান, ড. মোঃ আব্দুল আউয়াল ও অন্যান্য(২০০৫), শিক্ষার ভিত্তি, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা-চট্টগ্রাম
- https://shed.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/page/af4c4071_7257_4c10_b2c7_f2b789afda52/1974.pdf

- https://shed.gov.bd/site/page/9d3bb05d-cb48-4ee1-bdee-f816cb574b4c
- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%8F-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8,_%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%A8
- https://www.teachers.gov.bd/blog/details/780708
- https://fateh24.com/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE/
- https://shed.gov.bd/site/page/9d3bb05d-cb48-4ee1-bdee-f816cb574b4c/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8--%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%A8
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার(১৯৭৪); ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা।
- বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০০০
- বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০১০
- বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম ২০১১
- বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম রূপরেখা ২০২৩
- ঢালী, স্বপন কুমার ও রেজা ইমাম (২০০২), শিক্ষার ভিত্তি, প্রভাতী লাইব্রেরী, ঢাকা
- মালেক, আব্দুল ও অন্যান্য (২০০৭), শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাও, ধাকা-১২০৭
- খান, ড. মোঃ আব্দুল আউয়াল ও অন্যান্য(২০০৫), শিক্ষার ভিত্তি, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা-চট্টগ্রাম

গ্রন্থপঞ্জিকা:

- আলী, আজহার ও অন্যান্য (২০০৪), শিক্ষার ভিত্তি, মিতা প্রকাশনী, ঢাকা।
- আলী, মুহম্মদ আনওয়ার ও অন্যান্য (১৯৯৬), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা
- আলী, আজহার ও হোসনে আরা বেগম (১৯৯৩), প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- আহমদ, মনজুর ও অন্যান্য (২০০৩), বাংলাদেশে সাক্ষরতা, গণ সাক্ষরতা অভিযান, এডুকেশন ওয়াচ, ঢাকা।
- ইসলাম, একেএম নুরুল ও অন্যান্য (১৯৯৭), শিক্ষাদানের মূলনীতি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
- উদ্দীন, মুহম্মদ এলতাস ও অন্যান্য (১৯৯৬), শিক্ষামূল্যায়ন ও নির্দেশনা, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ঢাকা।
- এহসান, মো: আবুল (১৯৯৭) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন: নীতি ও পদ্ধতি, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি, ঢাকা।
- খাতুন, শরীফা (১৯৯৯), দর্শন ও শিক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- তপন, শাহজাহান ও অন্যান্য (১৯৯৯), শিক্ষা মূলায়ন; নীতি ও ব্যবহারিক দিক, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

- তপন, শাহজাহান ও অন্যান্য (১৯৯৯), শিক্ষা মূলায়ন; স্কুল অভ এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
- চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী (১৯৮৩), সুশিক্ষক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- বেগম, কামরুন্নেসা ও সালমা আখতার (২০০০), প্রাথমিক শিক্ষা: বাংলাদেশ, ইউনিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- বেগম, রওশন আরা ও অন্যান্য (১৯৯৮), শিক্ষাবিজ্ঞান পরিচিতি, স্কুল অভ্ এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
- Aggarwal, J. C (2000), Education Reforms in India For The 21" Cencury, Shipra Publications, New Delhi
- Ali, Zulfaqar. S.N.O (1968), The Modern Teacher, Book Villa, Dhaka
- Allport, G.W. (1937) Personality: A Psychological Interpretation, Henry Holt & Company. Inc., New York
- Bowen, James and Peter R. Hobzon (1974), Theories of Education, John Wiley and Sens Australasia Pty Ltd. Sydney London
- Chandra, Soti Shivendra, and Rajendra Sharma, (1996), Sociology of Education, Atlantic Publishers and Distributors, New Dellhi

অধ্যায় ০৪

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস, প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা

শিশুদের মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সূচনা হয় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। এই স্তরের শিক্ষা শুধু পাঠ্যবই শেখার নয়, বরং একটি শিশু কীভাবে একজন মানুষ ও ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে, তার ভিত্তি স্থাপন করে। বাংলাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ হয়েছে দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও প্রশাসনিক কাঠামোর রূপান্তরের মাধ্যমে। অধ্যায়টি মূলত বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিক বিকাশ, এর প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে। এতে প্রাক-ব্রিটিশ যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ, পাকিস্তান আমল, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় এবং বর্তমান আধুনিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষানীতির বিবর্তন, নীতিগত সংস্কার ও প্রশাসনিক কাঠামোর রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষণ কাঠামো, এবং স্থানীয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখছে, তাও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে পাঠক বাংলাদেশে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, প্রশাসনিক বিন্যাস এবং চ্যালেঞ্জ উত্তরণের রূপরেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশের মূল স্তম্ভ। এই স্তরের শিক্ষা জাতির ভিত্তি তৈরি করে, যেখান থেকে একজন শিশু তার জীবনের প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বাংলাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা একদিনে গড়ে ওঠেনি। এটি গঠিত হয়েছে বহু যুগের রাজনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক প্রয়োজনে, এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আজকের আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পেছনে রয়েছে শতবর্ষব্যাপী সংগ্রাম, সংস্কার ও সাফল্যের ইতিহাস।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস মূলত কয়েকটি ধাপে বিশ্লেষণ করা যায়:

- ❖ প্রাক-বৃটিশ আমল (১৭৫৭ সালের পূর্বে)
- ❖ ব্রিটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭)
- ❖ পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)
- ❖ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৯০)
- ❖ আধুনিক বাংলাদেশ পর্যায় (১৯৯১-বর্তমান)

প্রাক-ব্রিটিশ আমল:

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা বলতে অবিভক্ত ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসকেই বুঝিয়ে থাকে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ধন সম্পদের দিক থেকে এ উপমহাদেশ ঐশ্বর্যশালী ছিল। ফলে দ্রাবিড়, হন, আর্য, মঙ্গোলিয়া, তুর্কী, পাঠান, মুঘল, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির ভারতে আগমন, বসবাস ও শাসন করেছে বহু যুগ যুগ ধরে। আনুমানিক ৩০০০ বছরেরও পূর্ব প্রাচীন ভারতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীন ভারতের এই

শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই ধর্মের ভিত্তিতে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) বৈদিক শিক্ষা, (২) বৌদ্ধ শিক্ষা এবং (৩) মুসলিম শিক্ষা। প্রাচীন ভারতের এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হল।

বৈদিক শিক্ষাঃ

বেদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বৈদিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাব্যবস্থা 'ব্রাহ্মণ্য' শিক্ষা নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ণ বৈষম্য ছিল প্রকট। ফলে এ শিক্ষা সর্বজনীন না হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। এ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ বালকেরা উচ্চতর জ্ঞান লাভের সুযোগ পেত। ক্ষত্রিয় বালকেরা রাজগৌরব বা যুদ্ধবিদ্যা লাভ করত। অন্যদিকে, বৈশ্য বালকেরা কৃষি ও ব্যবসার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। শিক্ষার্থীর ৫ বছর বয়সে "স্বীকরনম" অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা শুরু হতো। বৈদিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ শিশুদের পুরোহিত করে গড়ে তোলা। শিক্ষকরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। বৈদিক শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। পুরো শিক্ষাই ছিল গুরুকেন্দ্রিক, শিক্ষাগুরুই শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি নির্ধারণ করতেন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন ধরনের বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়গুলো পরিষদ, টোল ও পাঠশালা নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন ব্রাহ্মণরা পরিষদের, তরুণ ব্রাহ্মণরা টোলে এবং আদিম অধিবাসী ও শুদ্র সম্প্রদায় ছাড়া সকলেই পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। পাঠশালায় পড়া লেখা, গণনা এবং পৌরাণিক কাহিনী পড়ানো হত। পাঠশালার শিক্ষকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তারা কোন বেতন পেতেন না। পূজা পার্বণে দক্ষিণা এবং ফসল উঠার সময় তিনি ফসলের একটি বিশেষ অংশ পেতেন।

বৌদ্ধ শিক্ষাঃ

গৌতম বুদ্ধের অহিংসনীতির ভিত্তিতে বৌদ্ধ শিক্ষার আবির্ভাব ঘটে। নির্বাণ লাভ বৌদ্ধ ধর্মের শেষ লক্ষ্য। অষ্টমা বা অষ্টপন্থায় নির্বাণ লাভ ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার মূল কথা। সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ বিশ্বাস, সৎ উপার্জন, সৎধ্যান, সৎ প্রচেষ্টা ও সৎ স্মৃতি হচ্ছে অষ্টমার উপাদান। শিক্ষার মাধ্যমে অষ্টমা চর্চা এবং তা ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দুঃখময় পৃথিবী থেকে নির্বাণ বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য। শিশুর ছয় বছর থেকে শিক্ষা শুরু হত এবং ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত চলত। গল্পের মাধ্যমে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সাধারণত মুখে মুখে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হত। মাঝে মাঝে আলোচনা ও বিতর্ক সভারও আয়োজন করা হত। গণতন্ত্র ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য খোলা ছিল।

মুসলিম শিক্ষা

মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। মসজিদগুলো মক্তব হিসেবে ব্যবহৃত হত। চার বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে কলেমা পাঠের মাধ্যমে মক্তবে ভর্তি হতে হত। নামায পাঠের জন্য মক্তবে প্রয়োজনীয় সুরা কেরাত শিক্ষা দেওয়া হত। মূল পাঠ শুরু হত ৭ বছর বয়সে। মক্তবে কুরআন শিক্ষাই ছিল প্রধান। এর পাশাপাশি পড়া, লেখা ও সাধারণ হিসাব নিকাশও শিক্ষা দেয়া হত। মসজিদের ইমামগণ মক্তবে শিক্ষকতার কাজ করতেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষা (১৭৫৭-১৯৪৭)

বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার প্রারম্ভিক রূপ ছিল সমাজ ও ধর্মনির্ভর। তখনকার শিক্ষা ছিল প্রথাগত, মৌখিক ও স্মরণভিত্তিক, যেখানে পাঠশালা, মক্তব ও টোলের মধ্য দিয়ে শিশুদের লেখাপড়ার সূচনা হতো। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত এবং সরকারিভাবে কোনো নীতিগত বা প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল না। শিক্ষকরা ছিলেন সাধারণভাবে সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি, তবে তারা কোনো ধরনের পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না। শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল বর্ণপরিচয়, মৌলিক গণিত, নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় অনুশাসন।

উপনিবেশিক প্রশাসনের আগমন ও শিক্ষার রূপান্তর

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করে। এরপর তারা ধীরে ধীরে প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থাকেও তাদের শাসন ও শোষণের এক সহায়ক উপাদানে রূপান্তরিত করে। ব্রিটিশদের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি শ্রেণিভিত্তিক প্রশাসনিক কর্মীবাহিনী তৈরি করা, যারা তাদের নির্দেশ পালন করবে, ভাষা জানবে এবং ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ শাসনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। এর ফলে তারা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যা তাদের শাসন বজায় রাখতে সহায়ক হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত হয়ে পড়ে, কারণ এটি ছিল সাধারণ জনগণের জন্য, যাদের শিক্ষিত করে তোলার মাঝে ব্রিটিশ স্বার্থ ছিল না। ফলে বহু বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার কোনো সরকারিভাবে সংগঠিত রূপ গড়ে ওঠেনি।

এডামস রিপোর্টঃ

ভারতে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য স্যার এডামসের নেতৃত্বে ১৮৩৫, ১৮৩৬ এবং ১৮৩৮ সালে সম্পাদিত ৩টি জরিপ রিপোর্টে দেখা যায়, তৎকালে বাংলা ও বিহারে সাধারণ ও পারিবারিকসহ ১ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি ৪০০ জন মানুষের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। দেশীয় বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় বিত্তবানদের আর্থিক সহায়তা ও দানদক্ষিণায় চলত। শিক্ষকরা ৪১০ টাকা পর্যন্ত বেতন পেতেন। এ সব বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে সহায়তা করত। এ পদ্ধতি 'মনিটরিয়াল পদ্ধতি' নামে ইংল্যান্ডে খ্যাতি লাভ করে। ড. বেল এই শিক্ষাদান পদ্ধতি ইংল্যান্ডে প্রবর্তন করেছিলেন। দেশীয় এই শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর সম্ভব বলে এডাম বিশ্বাস করতেন। তাই দেশী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি কতিপয় সুপারিশও রিপোর্টে উল্লেখ করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় রচনা, প্রতি জেলায় একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং শিক্ষকদের বসবাসের জন্য জমি প্রদান ইত্যাদি এ সুপারিশগুলোর অন্যতম ছিল। লর্ড মেকলের বিরোধিতার কারণে দেশীয় শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।

উডস ডেসপাস (১৮৫৪)

১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসির প্রভাবে ব্রিটিশ সরকার উডস ডেসপাস নামে পরিচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নির্দেশনা জারি করে। এটি ছিল উপমহাদেশের শিক্ষানীতির প্রথম সুসংগঠিত দলিল।

এই ডেসপাসে বলা হয়:

- প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হবে এবং সরকারের তদারকি থাকবে সীমিত
- বিদ্যালয় পরিচালনায় স্থানীয় চাঁদা, দান ও গ্রামবাসীর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ
- পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষার ব্যবহার এবং মৌলিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে

তবে বাস্তব চিত্র ছিল ভিন্ন। সরকারি সহায়তা ছিল সামান্য এবং বিদ্যালয় নির্মাণ বা শিক্ষক প্রশিক্ষণে তেমন কোনো উন্নয়ন দেখা যায়নি। ফলে শিক্ষা প্রসারিত হলেও তা মূলত শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষাভিত্তিক বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

হান্টার কমিশন রিপোর্ট (১৮৮২)

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য উইলিয়াম হাণ্টারের নেতৃত্বে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। ভারতীয় ও ইংরেজ মিলে এই কমিশনে ২২ জন সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

১. সরকার কর্তৃক কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

২. স্থানীয় প্রশাসনের অধীনে স্কুল বোর্ড গঠন করে প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করতে হবে।

৩. শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় মিটাতে জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে আলাদা অর্থ ভান্ডার সৃষ্টি করতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।

৪. স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে তাদের সমগ্র ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশে ব্যয় করতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা শিখনের সকল ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে। এজন্য প্রতি মহকুমায় মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে একটি করে শিক্ষক শিখন স্কুল থাকবে।

৬. দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষাক্রমে দেশীয় গণিত, হিসাব নিকাশ, জমি জরিপ, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (১৯০৪)

লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালে ১৯০১ সালে শিমলা শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন, যার মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯০৪ সালের শিক্ষা সংস্কার বাস্তবায়িত হয়। তার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো ছিল-

১. প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় এক-তৃতীয়াংশ থেকে বাড়িয়ে প্রায় অর্ধেক করার উদ্যোগ গ্রহণ।

২. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান উৎসাহিত করা এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য পৃথক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।

৩. ফলভিত্তিক সরকারি অনুদান (Grant-in-aid) ব্যবস্থা বাতিল করে বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা।

৪. শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোকে এককালীন ও নিয়মিত (পৌনপুনিক) অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা।

মুসলমান সমাজ ও শিক্ষার বঞ্চনা

এই সময়ে বাংলার মুসলমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। এর পেছনে ছিল একাধিক কারণ:

- ব্রিটিশরা প্রাথমিকভাবে হিন্দু অভিজাত সমাজকে প্রশাসনিক কাজে যুক্ত করে, ফলে হিন্দুরা শিক্ষাব্যবস্থায় আগ্রহী হয়
- মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আঘাতের শঙ্কায় ছিল
- মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে বিজ্ঞান বা প্রশাসনিক শিক্ষা প্রায় অনুপস্থিত ছিল

ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার থেকে যায় অত্যন্ত কম, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল প্রায় নেই বললেই চলে।

বিদ্যালয়ের ধরন ও পরিকাঠামো

এই সময়ে দেখা যেত:

- **পাঠশালা:** হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছোট বিদ্যালয়, যেখানে অক্ষরজ্ঞান ও সংখ্যা শেখানো হতো
- **মক্তব:** মুসলিম সমাজে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র
- **টোল:** সংস্কৃত শিক্ষার জন্য হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান
- **মিশনারি স্কুল:** খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিচালিত ইংরেজি শিক্ষা কেন্দ্র, যা পরবর্তীতে শহরাঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে

এগুলোর অধিকাংশ ছিল বাঁশকাঠের তৈরি ঘর, উপকরণবিহীন, এবং শিক্ষক ছিলেন স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত ব্যক্তি হলেও প্রশিক্ষণবিহীন।

ব্রিটিশ শাসনামলে উপমহাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতো একটি অসম ও বৈষম্যমূলক কাঠামোর অধীনে। যদিও উডস ডেসপাস (১৮৫৪) এবং হান্টার কমিশন রিপোর্ট (১৮৮২)এর মতো কিছু নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে এসব উদ্যোগের প্রভাব ছিল সীমিত এবং অনেকটাই নামমাত্র।এই সময় শিক্ষাকে গণসচেতনতা ও জাতি গঠনের অস্ত্র হিসেবে নয়, বরং ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত করা হতো। ফলে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়ন একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রবণতা ভাঙতে সময় লেগেছে, এবং ধীরে ধীরে এই পথ ধরেই পাকিস্তানি শাসনামলে ও স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের যাত্রা শুরু হয়।

এক জরিপ অনুযায়ী, ১৯০১-১৯০২ শিক্ষাবর্ষে গোটা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩,০০০টি। এক দশক পর, ১৯১১-১৯১২ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১,১৮,০০০এর বেশি, যা শিক্ষার প্রসারে একটি ধীরগতির অগ্রগতি নির্দেশ করে।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সময়ে, শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের লক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি ৪০ বছরব্যাপী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা পরিচিত জন সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে। এই পরিকল্পনায় ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য নার্সারি স্কুল এবং ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছিল।তবে এই প্রতিবেদন বাস্তবায়নের আগেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ, উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা একটি নতুন মোড়ে প্রবেশ করে, যার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলের বৈষম্যপূর্ণ শিক্ষানীতির প্রতিক্রিয়ায়।

পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে পূর্ব বাংলা পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তানে। নতুন রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থা, প্রশাসন এবং শিক্ষানীতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত একটি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পর মানুষের মাঝে আশার আলো জাগেশিক্ষা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে একটি নতুন যুগ সূচিত হবে কিন্তু বাস্তবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা খাত ছিল অনেকাংশেই অবহেলিত ও বৈষম্যমূলক নীতির শিকার। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হলেও তা ছিল সীমিত, অসম এবং রাজনৈতিক অভিপ্রায় দ্বারা প্রভাবিত।

শিক্ষানীতি ও কমিশনের সুপারিশ

পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষার উন্নয়নে একাধিক কমিশন গঠিত হয়। এসব কমিশনের সুপারিশে প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়নে ছিল নানা ধরনের ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা।

আকরাম খান কমিটির (১৯৫৭) সুপারিশ:

পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে আকরাম খান কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করে। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে মুহকুমা পর্যায়ে সংগঠিত করার প্রস্তাব দেয় এবং প্রতিটি মুহকুমায় একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা যায়।

শিক্ষা তদারকি ও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে কমিটি থানাপর্যায়ে শিক্ষা তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে। এ প্রসঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুলস—এর পরিবর্তে উপস্থিতি ও তদারকির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব পাওয়া যায়। একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশু শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চালুর ওপর জোর দেওয়া হয়।

শিক্ষকসংক্রান্ত সুপারিশের মধ্যে মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা এবং ব্যবহারিকভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কথা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

কমিটির সুপারিশসমূহের কিছু অংশ পরবর্তীকালে ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় সরকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং গ্রামাঞ্চলে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ নির্ধারণ ও শিক্ষাক্রম সংস্কারের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়।

সার্বিকভাবে, আকরাম খান কমিটির সুপারিশসমূহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশেও প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করে।

আতাউর রহমান খান (১৯৫৮) শিক্ষা কমিশন:

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় এবং এর প্রতিবেদন ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিশন পূর্ববর্তী বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার উদ্যোগ, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন (১৯৫১)-এর সুপারিশসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

এই কমিশন শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে এবং প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারের ওপর জোর দেয়। শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য অবৈতনিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

শিক্ষকসংক্রান্ত সুপারিশের মধ্যে বিদ্যালয়ের শ্রেণি ও সেকশনের অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং শিক্ষকতার পেশাগত মান উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণের মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে দুই বছর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাতে প্রশিক্ষণ আরও ব্যবহারিক ও ফলপ্রসূ হয়। পরবর্তীকালে কমিশনের সুপারিশের আলোকে শিক্ষা প্রশাসনে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ সালের ১৮ আগস্ট প্রাদেশিক সরকার একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে কিছু বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একই সময়ে শিক্ষা প্রশাসনকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুলস—এর পরিবর্তে সার্কেল এডুকেশন অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়, যা তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

সার্বিকভাবে, আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং পরবর্তী সময়ের শিক্ষা প্রশাসনিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

শরীফ কমিশন রিপোর্ট (১৯৫৯)

পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসনামলে শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে শরীফ কমিশন গঠিত হয় এবং এর প্রতিবেদন ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই কমিশন দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করে।

কমিশনের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও ছয় বছর মেয়াদি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি—এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসনিকভাবে একটি পৃথক কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও কমিশন উল্লেখ করে।

তবে বাস্তব ক্ষেত্রে শরীফ কমিশনের সুপারিশগুলোর বড় একটি অংশ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। আর্থিক সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেক সুপারিশ কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

১৯৬১ সালের শিক্ষা কমিশন

শরীফ কমিশনের পরবর্তী সময়ে ১৯৬১ সালে আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, যা শিক্ষানীতিতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। এই কমিশন শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দেয়।

তবে এ কমিশনের সুপারিশে মাতৃভাষা বাংলা এবং পূর্ব বাংলার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং অনেকেই এই শিক্ষানীতিকে বৈষম্যমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে বিবেচনা করে।

পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব পরিস্থিতি

পাকিস্তান শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু নীতিগত ও কাঠামোগত উদ্যোগ থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা খুবই সীমিত অগ্রগতি অর্জন করে। কিছু নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অপর্যাপ্ত, এবং অধিকাংশ স্কুলে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ছিল না। অনেক বিদ্যালয়ে ছাদ, বেঞ্চ, এমনকি পানির ব্যবস্থাও ছিল না, যা শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করত।শিক্ষকসংকট ছিল বড় একটি সমস্যা। বেশিরভাগ শিক্ষক ছিলেন অপ্রশিক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় পরিচিতি বা রাজনৈতিক প্রভাবে নিয়োগ পেতেন। ফলে শিক্ষার গুণগত মান ছিল নিম্নমানের। একই সাথে মেয়েদের শিক্ষায় ছিল চরম পশ্চাদপদতা। সামাজিক কুসংস্কার, নিরাপত্তার অভাব ও

নারীর প্রতি অবহেলার কারণে গ্রামীণ অঞ্চলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম।শহরগ্রাম বৈষম্য ছিল অত্যন্ত প্রকট। শহরে কিছু উন্নত বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা কার্যক্রম ছিল দারিদ্র্যপীড়িত ও অবহেলিত। সাধারণ মানুষের মাঝে শিক্ষার চাহিদা থাকলেও তা পূরণের কোনো সুসংগঠিত ব্যবস্থা ছিল না। বিকল্প বা সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা, কমিউনিটি স্কুল এবং কিছু বেসরকারি (বিশেষ করে মিশনারি) উদ্যোগ ছিল। মাদ্রাসায় অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা করলেও তা মূলত ধর্মীয় ও সীমিত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কমিউনিটি স্কুলগুলো স্থানীয় অংশগ্রহণে চালু হলেও তা টেকসই হয়নি। বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে কিছু মিশনারি প্রতিষ্ঠান শহরে শিক্ষার প্রচার শুরু করলেও তা ছিল খুবই সীমিত। এই পুরো সময়কাল জুড়ে শিক্ষা খাতে অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্বাঞ্চলের প্রতি অবহেলা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ধর্মীয় আধিপত্য, বাজেট ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক, মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রগতির অভাব, এবং মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অযথাযথ গুরুত্ব।

সব মিলিয়ে, পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল একটি অবহেলিত খাত। বিভিন্ন কমিশন ও পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই ব্যর্থতা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন এবং বাস্তবমুখী শিক্ষানীতির পথে অগ্রসর হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৭১-১৯৯০)

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। পাকিস্তান আমলের শোষণমূলক ও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে এ অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল অবহেলিত এবং দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো। শিক্ষার হার ছিল মাত্র ২০% এর নিচে, অবকাঠামো ভঙ্গুর, শিক্ষক অপ্রশিক্ষিত এবং শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার কার্যকর উদ্যোগ ছিল না। স্বাধীনতার পর সরকার বুঝতে পারে একটি উৎপাদনশীল জাতি গঠনের জন্য সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করতে দুইটি পদক্ষেপ নেয়া হয়: ১) দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ (১৯৭৩) এবং ২) শিক্ষা কমিশন গঠন। এরই ধারাবাহিকতায় ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাকে আট বছর মেয়াদি, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষাক্রমে বাংলা, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, সংগীত, কৃষি শিক্ষা, ক্রীড়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী, নতুন কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE), ও ৫৩টি পিটিআইকে (PTI) আধুনিকায়ন করে প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা হয়। বিদ্যালয়ভিত্তিক শিখন কার্যক্রমে দক্ষতা আনার জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু করা হয়।

এই সময় আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও ছিল লক্ষণীয়। UNICEF, UNESCO, DANIDA এবং World Bank এর সহায়তায় স্কুল নির্মাণ, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন, মেয়েদের জন্য "ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম", মহিলা শিক্ষক নিয়োগ এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারী শিক্ষায় অগ্রগতি আনা হয়।

৮০ এর দশকে “শিশু শিক্ষা সপ্তাহ” চালু করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয়মুখী মানসিকতা তৈরি করা হয়। পাশাপাশি, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠিত হয় এবং এর অধীনে বিভাগ, জেলা, থানা ও ক্লাস্টারভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়।

তবে এই সময় শিক্ষায় কিছু চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান ছিল, যেমন প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক, পাঠ্যবই সংকট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং শহরগ্রাম বৈষম্য। তবুও এই দুই দশকে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা একটি শক্ত ভিত্তি পায় এবং রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের একটি খাতে পরিণত হয়।

ফলাফলস্বরূপ, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ে এবং ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। দারিদ্র্যের কারণে বিদ্যালয়ে না আসা শিশুদের জন্য চালু হয় "খাদ্যবিনিময়ে শিক্ষা" কর্মসূচি। এই পর্যায়ের শিক্ষা সংস্কার ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে, যা ২০০০ সালের মধ্যে ৬১০ বছর বয়সী শিশুদের ৯৫% বিদ্যালয়ে ভর্তির লক্ষ্যে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটায়।

আধুনিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা (২০১০-বর্তমান)

২০১০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়নের একটি ধারা গড়ে উঠেছে, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানসম্মত ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। প্রাথমিক শিক্ষা এখন আর শুধু প্রাথমিক স্তরের সাক্ষরতা অর্জনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিশুর সার্বিক বিকাশ, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা, সামাজিক ও নৈতিক চেতনাবোধ এবং জীবন প্রস্তুতির ভিত্তি গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশুকেন্দ্রিক আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিষয়ের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের দিকেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই নীতির বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিতে ধারাবাহিকভাবে গৃহীত হয় Primary Education Development Program (PEDP) এর বিভিন্ন ধাপ, যেমন PEDP II, PEDP III এবং বর্তমান PEDP IV। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP), শতভাগ ভর্তি ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পাঠ্যপুস্তক বিতরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারও এক নতুন ধরণের পরিবর্তনের সূচনা করেছে। অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল কনটেন্ট, অ্যানিমেশন ও ভিডিওভিত্তিক পাঠদানের মাধ্যমে শেখাকে আরও আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। NCTB এর ওয়েবসাইটে পাঠ্যবইগুলো PDF আকারে উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং Shikkhok Batayon ও Muktopaath প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন রিসোর্স সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রশাসনিক দিক থেকে PEMIS ও DSS ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের তথ্য, ফলাফল ও শিক্ষকের উপস্থিতি ডিজিটালি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন বিশেষ কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। যেমন, Midday Meal Program শিশুদের পুষ্টি ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে; পাঠ্যপুস্তক উৎসবের মাধ্যমে প্রতি বছর জানুয়ারির ১ তারিখে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য ব্রেইল বই, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ভিডিও এবং অ্যাক্সেসযোগ্য অবকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াও চলমান, যা অনেক উপজেলায় “একক মাধ্যমিক বিদ্যালয়” মডেলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬৫,৫৬৭, শিক্ষার্থীর

সংখ্যা ১০ কোটির উপরে এবং প্রায় ৪ লাখ শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৫১ শতাংশ নারী শিক্ষক যা প্রাথমিক শিক্ষা খাতে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে।

তবে এসব অগ্রগতির পরও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। অনেক অঞ্চলে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ঘাটতি, গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় প্রযুক্তি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ব্যাহত হওয়া এসব সমস্যা এখনও বিদ্যমান। ফলে শহর গ্রাম বৈষম্য দূরীকরণ, টেকসই অবকাঠামো গঠন এবং মানসম্মত শিক্ষায় উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ এখন জরুরি প্রয়োজন।

সমসাময়িক বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো এখন আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচিত ও পর্যালোচিত হচ্ছে। নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগী এবং স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগ, তথ্যপ্রযুক্তির সংযুক্তি ও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্রমে একটি স্মার্ট, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভবিষ্যতমুখী ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। তবে SDG4 (Quality Education) অর্জনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় মান, সাম্য, দক্ষতা ও উদ্ভাবন কেন্দ্রিক ধারা অব্যাহত রাখা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ:

বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের শারীরিক, মানসিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এই স্তরের শিক্ষা শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ দক্ষতা এবং পরবর্তী শিক্ষার জন্য প্রস্তুতির এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তৈরি করে। শিশুদের জীবনের প্রথম পাঁচ বছরকে বিকাশের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ সময় বিবেচনা করে জাতীয় পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার একটি ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ এর দশকে।

শুরুতে, সরকারি উদ্যোগের ঘাটতি পূরণে ব্র্যাক (BRAC) এবং CAMPE এর মতো বেসরকারি সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারা গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায় "নন-ফর্মাল" শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করে, যেখানে গান, ছবি আঁকা, গল্প, ছড়া, রঙ ও খেলার মাধ্যমে ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদের শেখানো হতো। স্থানীয় মাবোনদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সমাজে নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখে। একই সময়ে CAMPE বিভিন্ন গবেষণা ও নীতিগত সহায়তা দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অংশ করার দাবি তুলে ধরে। এই প্রেক্ষাপটেই দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।

২০০৮ সালে "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো" প্রণীত হয় এবং ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য একটি সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় মান নির্ধারণ করা হয়। এরপর ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুর নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE)।

পরবর্তীতে, ২০১০ সালে ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ চালু করা হয় এবং ২০১৪ সালে তা জাতীয় শিক্ষাক্রমের আওতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG 4.2) অনুযায়ী দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর নির্দেশনা দেওয়া হয়।

২০২০ সালে ৪+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম অনুমোদন হয় এবং ২০২১ সালে ৩২১৪টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে তা চালুর সিদ্ধান্ত হয়, যদিও কোভিড-১৯ এর কারণে তা বিলম্বিত হয়। পরবর্তীতে, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কার্যক্রম শুরু হয় এবং শিক্ষক সহায়িকার পরবর্তী সংস্করণ বাস্তবায়ন করা হয়।

এসময় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শিশু উপযোগী আসবাবপত্র ও শেখার উপকরণ সরবরাহ, নারী শিক্ষক নিয়োগ, এবং "শিশু বিকাশভিত্তিক প্রশিক্ষণ" চালু করা হয়। শেখার পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে শিশুকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক করা হয় যাতে শিশুরা খেলাধুলা, গল্প, ছবি, এক্টিভিটি ও ভালোবাসার মাধ্যমে বিদ্যালয়মুখী হয়।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুদের শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ঝরে পড়ার হার কমে, এবং নারীশিক্ষা ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে, যেমন: প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব, শ্রেণিকক্ষ ও উপকরণের সংকট, এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকায় মানগত বৈষম্য।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একটি কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত সুসংগঠিত ও বহুস্তরীয় প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই কাঠামোর শীর্ষে রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoPME), যা প্রাথমিক শিক্ষার নীতিনির্ধারণ, বাজেট বরাদ্দ, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদনের দায়িত্বে নিয়োজিত। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) নীতিমালার বাস্তবায়ন, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, তদারকি এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে কাজ করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) এবং পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)।

মাঠপর্যায়ে, বিভাগীয় পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (DPEO) এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (UPEO) ও সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (AUPEO), যাঁরা সরাসরি বিদ্যালয় পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি ও পরিদর্শনে নিয়োজিত থাকেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ের নেতৃত্বে থাকেন প্রধান শিক্ষক, যিনি বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক সমন্বয় এবং শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি (SMC), যা অভিভাবক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

এই প্রশাসনিক কাঠামো নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়, যা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত করে তুলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

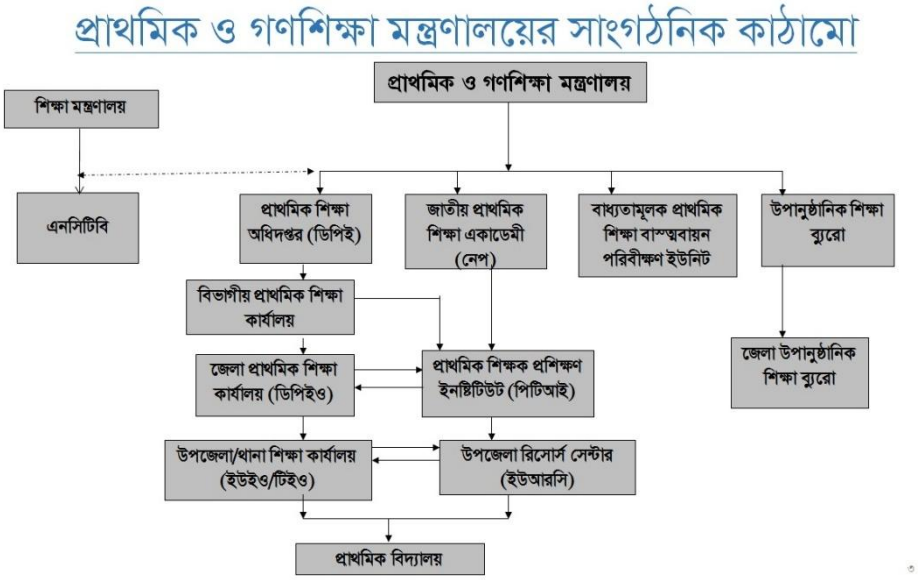

সুত্রঃhttps://mopme.gov.bd/pages/static-pages/694032d535ce18e1c0563227

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Primary and Mass Education MoPME) বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশাসনিক ও অন্যান্য যাবতীয় দিকগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

(ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের জন্যে যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
(খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;
(গ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমসহ গণশিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা;
(ঘ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্যে শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন;
(ঙ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায় ন ও পর্যবেক্ষণ;
(চ) সবার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ;
(ছ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় সংস্কারমূলক নীতি প্রণয়ন;
(জ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্যে কারিকুলাম উন্নয়ন.
(ঝ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ.
(ঞ) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে, যেমন জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প উপস্থাপন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
(ট) গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় করা;
(ঠ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে জড়িত সংস্থাগুলোকে সমর্থন দেয়া; গণশিক্ষা গবেষণা কাজে অর্থায়ন করা;
(ড) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে
তহবিল ব্যবস্থাপনা;
(ঢ) প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় নীতিমালা ও নির্দেশনা নির্ধারণ;
(ণ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পেশাগত উন্নয় ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা;
(ত) বিভাগের সচিবালয় প্রশাসন আর্থিক ব্যবস্থাপনা তদারকিসহ বিভাগের অধিনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ;
(থ) বিভাগের যে কোনো অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Primary Education; DPE)

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী প্রধান সংস্থা হলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE)। এটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি কার্যকর ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো, যার মূল দায়িত্ব হলো সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিদর্শন, ব্যবস্থাপনা এবং মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা। ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর" নামে এ সংস্থা যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এটিকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে বর্তমান নাম দেওয়া হয়। ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার পর অধিদপ্তরটি সরাসরি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংগঠন কাঠামো একটি সুসংগঠিত ও ধাপে ধাপে বিভক্ত প্রশাসনিক কাঠামো।

এর শীর্ষে থাকেন মহাপরিচালক। মহাপরিচালকের অধীনে আছেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক। অধিদপ্তরে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, প্রতিটি বিভাগ পরিচালনা করেন একেকজন পরিচালক যেমন: প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন, পলিসি ও অপারেশন, অর্থ ও প্রোগ্রাম ইত্যাদি। বিভিন্ন পরিচালকের অধীনে কাজ করেন উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মাঠ পর্যায়ে রয়েছে বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও), উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ইউইপিও) এবং সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (এইউপিইও), যাঁরা সরাসরি স্কুল পর্যায়ে কাজ তদারকি করেন। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট, প্রোগ্রামার, কম্পিউটার অপারেটর, এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটরসহ একটি আইসিটি ইউনিট। এই কাঠামো প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তদারকি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে:

- ৬৪টি জেলা অফিস;
- ৫১৩ টি উপজেলা শিক্ষা অফিস.
- ৬৭টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (PTI);

এছাড়াও, ৫০৮ টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (URC) যা উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার নামে এখন পরিচিত বর্তমানে উপজেলায় সক্রিয় রয়েছে, যেখানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত সহায়তা দেওয়া হয়।

APSS প্রতিবেদন (2024) অনুসারে সারা দেশে অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫,৫৬৭ টি। এই বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৩৮৩,৬২৪ জন শিক্ষক এবং ১০,৬১৭,৯৬২ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মূল কার্যাবলি:

- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসন, পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা।
- শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ব্যবস্থা তদারকি।
- PTI ও NAPE এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কারিকুলাম সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন।
- ননক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং মাঠ পর্যায়ে জনবল ব্যবস্থাপনা।
- বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শিশুদের মানসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে SDG4 (Quality Education) অর্জন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণে এ সংস্থার কার্যকর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) সর্বপ্রথম ১৯৬৯ সনে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ (জেটিসি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে ২ বৎসর মেয়াদি ইন্টারমিডিয়েট ইন এডুকেশন (আই এড) কোর্স পরিচালিত হয়। ময়মনসিংহ ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, রংপুর ও যশোরে অনুরূপ আরো পাঁচটি জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ (জেটিসি)

স্থাপিত হয়। মহান স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ (জেটিসি)গুলো রূপান্তরিত হয়ে কলেজ অব এডুকেশন নামে যাত্রা শুরু করে । উক্ত কলেজগুলোতে ৩ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব আর্টস ইন এডুকেশন (বিএ ইন এডুকেশন) কোর্স চালু হয় । ১৯৭৮ সালে ঢাকাস্থ কলেজ অব এডুকেশনটি সরকারী কবি নজরুল কলেজ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। অন্য চারটি কলেজ অব এডুকেশন (চট্টগ্রাম, ফেণি, রংপুর ও যশোর) টিচার্স ট্রেনিং কলেজে উন্নীত হয়। এছাড়া ১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহস্থ কলেজ অব এডুকেশনটি "মৌলিক শিক্ষা একাডেমি" (Academy for Fundamental Education) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে এর নামকরণ করা হয় ''জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)"। ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে একাডেমী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। নেপ একটি বোর্ড অফ গভর্ণরস এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মহাপরিচালক এর প্রধান। তার অধীনে ১ জন পরিচালক, ২ জন উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন ও প্রশাসন) সহ অন্যান্য কর্মকর্তা রয়েছেন। নেপ এর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) বোর্ডের মাধ্যমে। মহাপরিচলক পদাধিকার বলে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

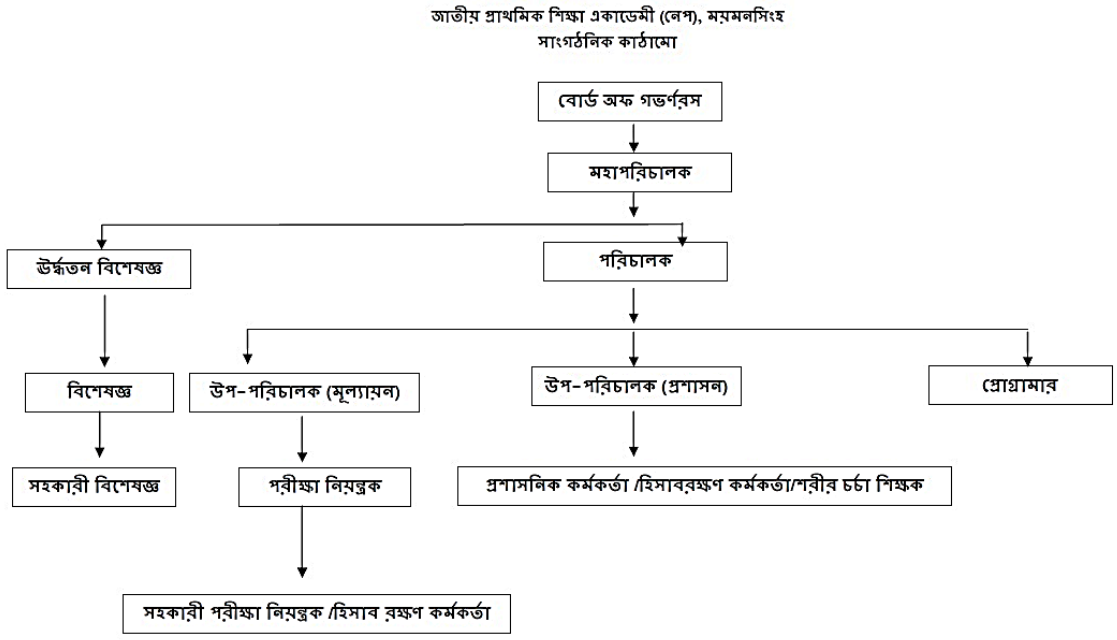

সূত্রঃ http://www.nape.mymensingh.gov.bd/bn/site/page/Wl3y-সাংগঠনিক-কাঠামো

এক নজরে নেপ এর কার্যাবলি :

১. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২. প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশেন/ বুনিয়াদি/ ইনডাকশন প্রশিক্ষণসহ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নমূলক স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন (ফেস টু ফেস/ অনলাইন) প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন ও বিস্তরণ ঘটানো এবং পিটিআই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণবিটিপিটি) মূল্যায়নপূর্বক সনদ প্রদান করা।

৫. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম এর উন্নয়ন/পরিমার্জনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

৬. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা।

৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, এনসিটিবি, পিটিআই ও ইউআরসি এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা।

বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়

বর্তমানে বাংলাদেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগে রয়েছে মোট ৮টি বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি কার্যালয়ের প্রধান হলেন একজন বিভাগীয় উপপরিচালক, যিনি বিভাগভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন একজন সহকারী পরিচালক ও একজন শিক্ষা অফিসার। এই দপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত সংখ্যক বিদ্যালয়, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস, পিটিআই এবং অন্যান্য অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন ও তদারকি, শিক্ষককর্মচারীদের আন্তঃজেলা বদলি ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার তত্ত্বাবধান, এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন, অনুমোদন ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

এছাড়া বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম সমন্বয়, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান, নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা এবং ডাটা ও প্রতিবেদন প্রেরণসংক্রান্ত কাজও এ দপ্তরের আওতায় পড়ে। উল্লেখ্য, বিভাগীয় দপ্তরের উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং শিক্ষা অফিসারের পদ অধিদপ্তরের সমমানের এবং পারস্পরিক বদলিযোগ্য, যা প্রশাসনিক কাঠামোতে একটি কার্যকর ও গতিশীল ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

এ অফিসগুলো ৬৪টি জেলা সদরে নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত। মহাপরিচালকের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে জেলাস্থ প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ডে এ দপ্তরটি জড়িত রয়েছে। এর প্রধান নির্বাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও)। তার অধীনে একজন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, একজন সহকারী মনিটরিং অফিসার, উচ্চমান সহকারী, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারী কাম টাইপিস্ট, একজন ড্রাইভার, নৈশ প্রহরী ও এমএলএসএস রয়েছে। জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ডিপিইওকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় ও অধীনস্থ উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করতে হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত বিভিন্ন বিভাগ বহির্ভূত কমিটির সদস্য হিসেবে ডিপিইওকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদ্যালয়সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন ও মনিটরিং করা ও নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবন বুঝে নেওয়ার দায়িত্বও এ কর্মকর্তাকে পালন করতে হয়।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মূল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যার যাত্রা শুরু হয় ১৯৫১ সালে এবং বর্তমানে সারাদেশে ৬৭টি পিটিআই সক্রিয় রয়েছে। শুরুতে ১৯৭৯ সালে চাকরিরত প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য 'সার্টিফিকেটইনএডুকেশন (সি.ইন.এড.)' কোর্স চালু হয়, যা ২০০১ সাল

পর্যন্ত চলমান ছিল। পরে এর উন্নত সংস্করণ হিসেবে ২০১২ সালে '১৮ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)' কোর্স চালু হয়, যা পরবর্তীতে দেশের সব পিটিআইতে বাধ্যতামূলক করা হয়। এই কোর্সটি তাত্ত্বিক ও প্র্যাকটিক্যাল অংশে বিভক্ত এবং শিক্ষক মান উন্নয়নের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে কাজ করে আসছিল। তবে, জাতীয় নীতিমালা ও সময়োপযোগী চাহিদার ভিত্তিতে ২০২৩ সাল থেকে ডিপিএড কোর্স স্থগিত করে 'বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচার্স (বিটিপিটি)' চালু করা হয়েছে, যা মূলত চাকরিরত শিক্ষকদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত, প্রযুক্তিনির্ভর ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ কাঠামো। এই কোর্সে পাঠপরিকল্পনা, আইসিটি, শিশুবান্ধব শিক্ষা, মূল্যায়ন কৌশল প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। পাশাপাশি, ১২টি পিটিআইতে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে ১০ মাস মেয়াদি 'ডিপিএড প্রোগ্রাম', যা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী নতুন প্রার্থীদের জন্য তৈরি একটি প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রোগামটি ভবিষ্যতের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পূর্বেই পেশাগত প্রস্তুতি ও শিক্ষণ দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। ফলে, পিটিআই বর্তমানে একদিকে চাকরিরত শিক্ষকদের জন্য বিটিপিটি পরিচালনা করছে, অন্যদিকে আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য ডিপিএড প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে শিক্ষক তৈরির প্রাতিষ্ঠানিক পথ সুগম করছে।

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস:

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস হলো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসনিক কাঠামো, যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন। এই দপ্তরের নেতৃত্বে থাকেন একজন উপজেলা বা থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ইউপিইও), যিনি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থিত সব সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি, কমিউনিটি ও স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন, শিক্ষক বদলি, বেতনভাতা, পদোন্নতি, শৃঙ্খলাবিধি বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রত্যেক উপজেলায় স্কুলসংখ্যার ভিত্তিতে কয়েকজন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (এইউপিইও) থাকেন, যাঁরা ক্লাস্টারভিত্তিক বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করেন প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষা পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। শিক্ষকদের ছুটির আবেদন, বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করাও তাঁদের দায়িত্ব। উপজেলা বা থানার প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি, যেটির সচিব ইউইও এবং সদস্যরা হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, পৌর মেয়র ও মনোনীত শিক্ষানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা, স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা উন্নয়নের নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন।

উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টারঃ

উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার (UPETC), যা আগে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (URC) নামে পরিচিত ছিল, হলো বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য গঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও সহায়ক কেন্দ্র। ২০০২ সাল পর্যন্ত দেশে ১৭৪টি ইউআরসি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে প্রায় সব উপজেলায় (৫১৩ টি) এই কেন্দ্র স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং এর নাম পরিবর্তন করে উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার (UPETC) রাখা হয়েছে, যা কেন্দ্রটির সম্প্রসারিত কার্যক্রম ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কাঠামোর উন্নয়নকেই তুলে ধরে। এই কেন্দ্রগুলোতে চাকরিরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের জন্য নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, ক্লাস্টার মিটিং, সেমিনার, প্রদর্শনী ক্লাস এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

বর্তমানে প্রতিটি ইউপিইটিসিতে ১ জন ইনস্ট্রাক্টর, ১ জন সহকারী ইনস্ট্রাক্টর, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন নৈশপ্রহরী পদে জনবল নিয়োজিত আছেন। ইনস্ট্রাক্টর ও সহকারী ইনস্ট্রাক্টর প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি ক্লাস্টার পর্যায়ের শিক্ষক মূল্যায়ন, পাঠ পরিদর্শন ও ফলোআপ তদারকির দায়িত্ব পালন করেন। কম্পিউটার অপারেটর প্রশিক্ষণ চলাকালে আইসিটি সহায়তা প্রদান, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা ও অনলাইন তথ্য সংরক্ষণের কাজ

করেন এবং নৈশপ্রহরী কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি কেন্দ্রে কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ, ইলার্নিং কনটেন্ট এবং মাল্টিমিডিয়া সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বর্তমানে এই কেন্দ্রগুলোতে বর্তমানে চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, বিটিপিটি ওরিয়েন্টেশন, বিষয়ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, পাঠ পরিকল্পনা ও শিখনফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীবান্ধব শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আয়োজন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ স্থানীয়ভাবে বাস্তব প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়ায় এগুলোর ফলাফল কার্যকরভাবে শিক্ষক কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। ইউপিইটিসিগুলো এখন উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক পেশাগত উন্নয়নের প্রধান প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কাঠামোর একটি মজবুত ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একটি মৌলিক অধিকারভিত্তিক শিক্ষা কাঠামো, যা দেশের প্রতিটি শিশুকে বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর শুধু শিশুর পঠনদক্ষতা অর্জনের মাধ্যম নয়, এটি তার নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিকতা এবং ভবিষ্যতের জীবনদক্ষতা অর্জনের প্রথম ভিত্তি। বর্তমান সময়ে সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা, বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা (SDG4) এবং দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রাথমিক শিক্ষাকে গুণগত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিশু, কিন্তু এর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে প্রশাসনিক কাঠামো, মানবসম্পদ, পাঠ্যক্রম, অর্থনৈতিক সম্পদ, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার ওপর।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূল উপাদানসমূহ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র প্রশাসনিক কার্যক্রম নয়, বরং একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও জাতি গঠনের উপযোগী দক্ষতা অর্জনের পথ তৈরি করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো, সকল শিশুর জন্য মানসম্মত, সাম্যভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা। এখানে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় মাঠপর্যায়ে, ফলে একটি কার্যকর ম্যানেজমেন্ট কাঠামো ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। তদারকি, তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাটি সক্রিয় থাকে।

প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পাঁচটি প্রশাসনিক স্তরে বিভক্ত: কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা এবং বিদ্যালয় পর্যায়। প্রতিটি স্তর পরস্পর নির্ভরশীল এবং সম্পূরকভাবে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoPME) নীতিনির্ধারণ, বাজেট বরাদ্দ, শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়ন, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় কাজ করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকে। NAPE প্রশিক্ষণ কাঠামো তৈরি ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে।

বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় উপপরিচালক এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা বিদ্যালয় পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন এবং সমস্যা সমাধানে দায়িত্ব পালন করেন।

উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী অফিসার এবং ক্লাস্টারভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম তদারক করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি সরাসরি শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকেন।

প্রতিটি স্তর কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করলেও নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সমস্যা নির্ধারণ এবং তা সমাধানে স্থানীয় উদ্ভাবন ও বিকেন্দ্রীকরণ এখন গুরুত্ব পাচ্ছে।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

শিক্ষাব্যবস্থার সফলতা মূলত নির্ভর করে মানবসম্পদের দক্ষতা ও নিযুক্তির ওপর। প্রাথমিক স্তরে মানবসম্পদের প্রধান অংশ হলো শিক্ষকগণ। বর্তমানে প্রায় ৪ লাখের বেশি শিক্ষক সারাদেশে কর্মরত রয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হয়। শিক্ষক নিয়োগে NTRCA পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের একটি মান নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি শিক্ষক নিয়োগ হয় BPSC বা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের তিনটি ধাপ রয়েছে: প্রিসার্ভিস (যারা এখনো চাকরিতে প্রবেশ করেনি), ইনসার্ভিস (চলমান শিক্ষকতা করছেন), এবং CPD (Continuous Professional Development)। সি.ইন.এড., ডিপিএড ও বিটিপিটি (২০২৩ সালে চালু) হলো ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণের মূল উপকরণ। পাশাপাশি, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (UPETC) এ নিয়মিত স্বল্পমেয়াদি, চাহিদাভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। তথ্য প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষণ কৌশলের সঙ্গে সমন্বয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্মও সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে ডিপিএড নামে প্রোগ্রামটি ১২ টি পিটিআইতে পাইলটিং আকারে শুরু হয়েছে যা প্রি-সার্ভুস মডালিটিতে চলমান আছে। বস্তুতপক্ষে বাংলদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে এর আগে প্রি-সার্ভিস নিয়ে কোন কোর্স বা প্রশিক্ষণ হয় নি।

পাঠ্যক্রম ও পাঠদান

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)। সর্বশেষ শিক্ষানীতির ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়েছে শিশুর চাহিদাভিত্তিক বিষয়বস্তু, নৈতিকতা, জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, ও সামাজিক দায়িত্ববোধ। বর্তমানে ১ জানুয়ারিতে সারাদেশে একযোগে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

পাঠদান পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। বইকেন্দ্রিক মুখস্থভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতির পরিবর্তে এখন শিশুবান্ধব, মাল্টিমিডিয়া নির্ভর, কার্যক্রমভিত্তিক এবং গল্পকেন্দ্রিক শিক্ষণ প্রণালী ব্যবহৃত হচ্ছে। পাঠ পরিকল্পনা, মাসিক মূল্যায়ন, সাপ্তাহিক পাঠপরিকল্পনা এবং সমন্বিত সহপাঠ কার্যক্রম শিক্ষার গুণগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে এসব পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়ে বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বাজেট

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা বাজেটে প্রতিবছর একটি বৃহৎ অংশ বরাদ্দ থাকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কার্যকর বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়িত PEDPIV (Primary Education Development Program IV) প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় থেকে উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যন্ত আর্থিক বরাদ্দ পৌঁছে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য রয়েছে SLIP (School Level Improvement Plan),যার মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয় নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা করে এবং স্থানীয় অংশগ্রহণে তার বাস্তবায়ন ঘটায়।

এই অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রধান শিক্ষক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা পর্যায়ের তদারকি কর্মকর্তারা সমন্বিতভাবে কাজ করেন। SLIP তহবিল ব্যবহৃত হয় শ্রেণিকক্ষ সংস্কার, খেলার সামগ্রী কেনা, সুপেয় পানি, টয়লেট নির্মাণ ও টিচিংলার্নিং ম্যাটেরিয়াল (TLM) কিনতে। পাশাপাশি

রয়েছে UPE (Upazila Primary Education) স্কিম, যার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের সুযোগ তৈরি হয়।

তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কাঠামো

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে PEMIS (Primary Education Management Information System), যা একটি ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার। প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, ফলাফল, শ্রেণিকক্ষের অবস্থা, অনুপস্থিতি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে সরকার নীতিনির্ধারণ, বাজেট বরাদ্দ এবং কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এখন গুণগত পরিবর্তন এসেছে। পূর্বের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (PECE) এখন ধাপে ধাপে বাতিল করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Formative Assessment) চালু করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণিতে ক্লাসরুম অ্যাসেসমেন্ট, সাপ্তাহিক ফলোআপ এবং শিক্ষার্থীর শেখার অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ চালু করা হয়েছে। ক্লাসরুম পর্যায়ে শেখার প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও শিখনফলভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়ক।

স্থানীয় সম্পৃক্ততা ও অংশীদারিত্ব

একটি কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে SMC (School Management Committee) রয়েছে, যেখানে অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রধান শিক্ষক থাকেন। এই কমিটি বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ, SLIP বাস্তবায়ন, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি মনিটরিং, শিক্ষক অনুপস্থিতির প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ তদারক করে।

এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। UNICEF, UNESCO, World Bank, Room To Read ইত্যাদি সংস্থাগুলো শিক্ষার মানোন্নয়ন, মিডডে মিল কর্মসূচি, শিশুবান্ধব শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যবই উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। এই অংশীদারিত্ব টেকসই শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও উদ্ভাবনী কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করে।

চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের পথ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সময়ের সাথে সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ভর্তির হার উন্নতি, পাঠ্যক্রম হালনাগাদ এবং শিক্ষাসামগ্রীর প্রাপ্যতা এসব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। শিক্ষার্থীসহাবস্থান, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং শিক্ষার প্রতি পরিবার ও সমাজের আগ্রহও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তবুও এখনো কিছু কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, সামাজিক বৈষম্য, জনবল ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা এবং পর্যাপ্ত নজরদারির ঘাটতি রয়ে গেছে, যা প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক গুণগত মান উন্নয়নের পথে উল্লেখযোগ্য অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক সংকট অন্যতম একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক এলাকায় পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকলেও প্রত্যন্ত, দুর্গম বা জলবায়ুপ্রবণ এলাকায় শিক্ষক প্রেরণে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। নিরাপদ আবাসন, পরিবহন সুবিধার অভাব এবং অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে এসব এলাকায় শিক্ষকরা টিকে থাকতে চান না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পাঠদান থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফলাফল খারাপ হয়। পাশাপাশি নারী শিক্ষক নিয়োগে অগ্রগতি হলেও কিছু এলাকায় এখনো নারী শিক্ষকের অভাব রয়েছে, যা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়াও একটি জটিল বাস্তবতা। বিশেষ করে কৃষিকাজ, গার্হস্থ্য শ্রম, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহের কারণে প্রাথমিক স্তরের শিশুরা বিদ্যালয়ে টিকে থাকতে পারে না। শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ভীতি, একঘেয়েমি এবং পড়াশোনায় আগ্রহের অভাবও দেখা যায় যার মূল কারণ শিক্ষাদান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও ক্লাসে পর্যাপ্ত শিশুকেন্দ্রিক কার্যক্রমের অভাব। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

অপরদিকে, বৈষম্য সমস্যাটিও এখনো পুরোপুরি নিরসন হয়নি। শহর ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষার মানে বড় ধরনের ফারাক রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা এখনো পর্যাপ্ত নয়। নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যবই অপ্রতুল থাকায় পাহাড়ি এলাকার শিশুরা শিক্ষা কার্যক্রমে পিছিয়ে পড়ে। একইভাবে, মেয়ে শিশুরা মাসিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে বা ঝরে পড়ে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা। যদিও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার সরঞ্জাম আছে, তবে শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বা আগ্রহের অভাবে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেট সংযোগহীনতা, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ঘাটতি, এবং আইসিটি দক্ষতার অভাব এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

তথ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা এবং মনিটরিং ব্যবস্থার অকার্যকারিতা প্রশাসনিক একাধিক স্তরে সমস্যা সৃষ্টি করছে। শিক্ষা অফিসারগণ সময়মতো বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতে না পারলে সমস্যা চিহ্নিত হয় না। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) কার্যকর না হলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় না। PEMIS এর মতো শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা টুলস থাকলেও মাঠপর্যায়ের কর্মীদের ব্যবহারে পারদর্শিতার ঘাটতি ও নিয়মিত আপডেট না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন সমন্বিত, সময়োপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক কৌশল। সর্বপ্রথম, স্থানীয় পর্যায়ে Teacher Pipeline তৈরি করে এলাকার শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে করে স্থানীয় শিক্ষক স্থানীয় সমস্যাকে ভালোভাবে বুঝে, বিদ্যালয়ের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে পারবেন। পাশাপাশি, প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা ভিত্তিক প্যাকেজ চালু করতে হবে—যেমন: বাড়তি বেতন, আবাসন সুবিধা বা দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধিতে DPE ও NAPE এর মাধ্যমে নিয়মিত রিফ্রেশার কোর্স, ডিজিটাল প্রশিক্ষণ এবং অনলাইন কোর্স চালু করা যেতে পারে। শিক্ষকদের জন্য e-portfolio, peer evaluation, এবং স্কুলভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউল চালু করে তাদের নিজস্ব পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা (IDP) বাস্তবায়ন করতে হবে।

শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ, অফলাইন অ্যাপস, অডিওভিডিও কনটেন্ট, ও লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) চালু ও কার্যকর করতে হবে। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের এ ব্যাপারে ওরিয়েন্টেশন দেওয়া দরকার। পাশাপাশি, বিদ্যালয়ের তথ্য ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে real-time data entry, ক্লাস পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার ও ফলাফল বিশ্লেষণ টুলস চালু করা দরকার।

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়াতে ও ঝরে পড়া রোধে মিডডে মিল কর্মসূচি, উপবৃত্তি, শিশুবান্ধব শ্রেণিকক্ষ, এবং সমাজভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যালয় ভিত্তিক অভিভাবক সভা, ম্যানেজিং কমিটির সক্রিয়তা, এবং স্থানীয় এনজিওদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো হবে কার্যকর কৌশল।

সবশেষে, তথ্যনির্ভর ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, নিয়মিত মনিটরিং, এবং শিক্ষকঅভিভাবকপ্রশাসনের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমতাভিত্তিক, গুণগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সহায়ক তথ্যপত্র

- মালেক, ড. আব্দুল, বেগম, ড. মরিয়ম, ইসলাম, ড. ফখরুল, ও রিয়াদ, শেখ শাহবাজ (২০১৫)। শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ শিক্ষা (৫ম সংস্করণ)। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।
- উদ্দিন, মোঃ আয়েজ, ও দাস, সুভাষ চন্দ্র (২০১৪)। শিক্ষাদর্শন (৩য় সংস্করণ), উপমা প্রকাশন, ঢাকা।
- রায়, সুশীল (২০২২)। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন (ষোড়শ সংস্করণ), সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা।
- রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর (২০১৬)। প্রারম্ভিক শিক্ষাবিজ্ঞান। প্রভাতী লাইব্রেরি। ঢাকা।
- আবু হামিদ লতিফ (২০০৭), শিক্ষা, শিখন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, পৃঃ ১১৩।
- রহমান ও অন্যান্য (২০০৩)। শিক্ষাকোষ, সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোওপারেশন (এসডিসি), ঢাকা।
- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, https://www.ebookbou.edu.bd retrieved on 25th November 2025
- https://nape.gov.bd/site/page/03e3566fc9ac4e01bd0383c092f74d65/ retrieved on 25th
- https://mopme.gov.bd/ retrieved on 25th November 2025
- https://www.dpe.gov.bd/ retrieved on 25th November 2025

অধ্যায়-৫

শিক্ষায় দর্শন ও প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষা দর্শন (Educational Philosophy)

বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান কোন কিছুর আকার-আকৃতি, প্রকৃতি, আচরণিক পরিবর্তন বোঝার পাশাপাশি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মর্ম বোঝা ও উপলব্ধি করা হচ্ছে দর্শন। দর্শন কোন কিছুর সত্য, স্বরুপ ও প্রকৃত পরিচয় উন্মোচনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ করে আর শিক্ষা বা শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে। দর্শন শিক্ষার মৌলিক নীতি, আদর্শ ও পরিচয় নির্ধারণে সহায়তা করে । অপরদিকে শিক্ষা নির্দিষ্ট নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতি ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কাজ সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে দর্শন শিক্ষার পাশাপাশি থেকে পরিপূরকের ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষাদর্শন দর্শনের একটি প্রায়োগিক শাখা যা শিক্ষা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটি শিক্ষার আদর্শ নির্ণয়, জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। শিক্ষার স্বরূপ, জ্ঞানগত বিষয় হিসেবে শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য নির্ণয়ে এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্যার যৌক্তিক কাঠামো নির্ধারণে শিক্ষাদর্শন সাহায্য করে। শিক্ষাদর্শন ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের উন্নতি বিধানে প্রয়োজনীয় সুচিন্তিত বিশ্বাস ও মৌলিক নীতি নির্ধারণে আদর্শ হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষায় দার্শনিকি মতবাদ, শিক্ষা দর্শন ও শিখন তত্ত্ব কথাগুলো বা ধারণাগুলো আপাত শুনতে প্রায় একই রকম মনে হলেও এ ধারণাগুলোর মাঝে বিস্তর পার্থক্য আছে। দার্শনিকি মতবাদ আর শিক্ষা দর্শন বা শিখন তত্ত্ব এক কথা নয়। দার্শনিক মতবাদ দর্শন শাস্ত্রের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষা দর্শনের সাথে তা সম্পর্ক রক্ষা করে, কিন্তু এগুলোর উৎপত্তি সরাসরি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে হয়নি। সমাজ ও বাস্তবতার নিরীখে এক একটা দার্শনিক মতবাদ তার নিজস্ব ভাবাদর্শের মধ্যদিয়ে দিক নির্দেশনা ও রূপরেখা নির্দেশ করে থাকে। আর এই দিক নির্দেশনা ও রূপরেখা অনুযায়ী শিক্ষা তার শিক্ষা কার্ক্রম পরিচালন করে। দর্শন তার চিন্তা ভাবনা নিজে নিজে প্রয়োগ করতে পারে না। প্রয়োগের কাজটি শিক্ষা সুচারু পরিচালনা করে। শিশু মনোবিজ্ঞান দর্শনেরই আরেকটি শাখা যা শিশুর আচার-আচরণ বা মনোস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করে। শিখনতত্ত্বগুলো হলো শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক দর্শন। শিখনতত্ত্ব শিশুর শিখন আচরণ ব্যাখ্যা করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিতে শিখনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে থাকে।

তাই আদতে শিক্ষায় দার্শনিক মতবাদ ও মনোবৈজ্ঞানিক শিখন তত্ত্বগুলো শুনতে অনেকটা একই রকম শুনালেও এদের মাঝে উৎস, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও ব্যবহারগত ভিন্নতা প্রতিয়মান। শিক্ষায় শিখন তত্ত্বগুলো হলো, আচরণবাদ, সমগ্রতাবাদ, সাপেক্ষবিবর্তনবাদ, সংযোগবাদ, করণশিখনবাদ, গঠনবাদ, সামাজিক গঠনবাদ, জ্ঞান বিকাশবাদ ইত্যাদি। আপরদিকে দার্শমিক মতবাদগুলো হলো ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ, বস্তুবাদ, প্রয়োগবাদ, বাস্তববাদ ইত্যাদি। মানসম্মত ও সুষম শিখন বাস্তবায়নে শিক্ষায় দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলো আলোচনার উপযোগীতা যথেষ্ট। শিক্ষা বিষয়ক যেকোন নীতি-নির্ধারণী আলোচনা ও বিতর্কে দার্শনিক মতবাদ ও মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছাড়া অসম্ভব।

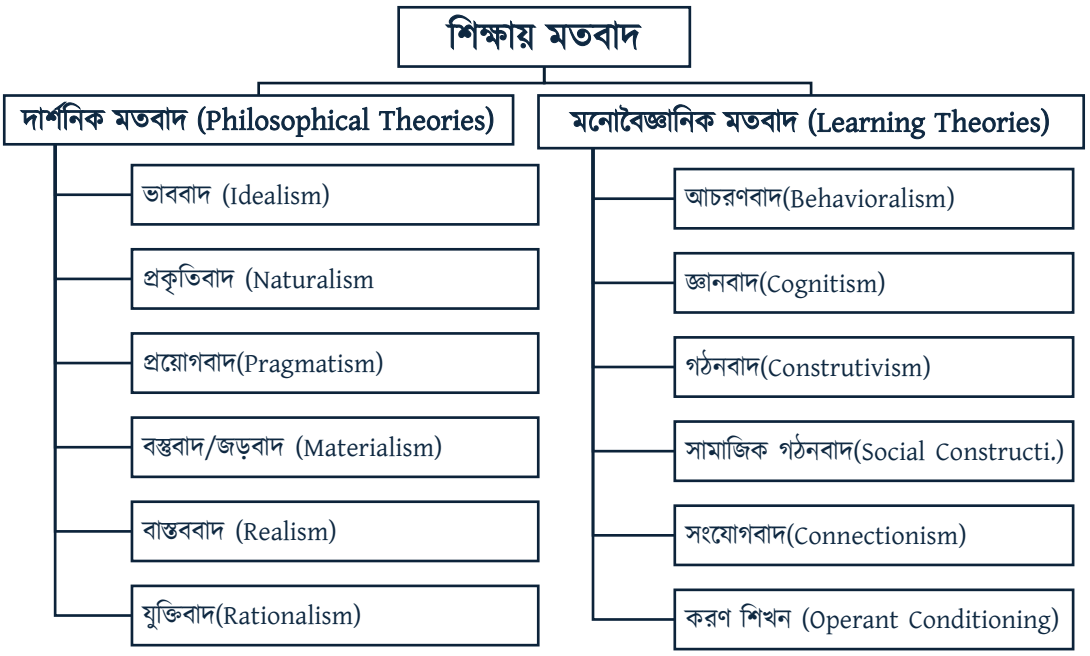

শিক্ষার নীতি-আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মাপকাঠি নির্ধারণে দার্শনিক মতবাদ অনন্য ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি-কৌশল, মূল্যায়ন, ফলাবর্তন, শিখন পরিবেশের কার্যকর নির্বাচন ও নির্ধারণে শিখনতত্ত্বগুলো ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা পরিচয় ও শিক্ষা দর্শন কোর্সের এ অধ্যায়ে আমরা শিক্ষায় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবো। শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (শিখনতত্ত্ব) নিয়ে পরবর্তীতে আরো একটি বিস্তারিত কোর্স রয়েছে। সে কোর্সে শিখনতত্ত্বের উপর বিস্তারিত জানার সুযোগ পাবেন।

দর্শনের ধারণা (Concept of Philosophy)

সাধারণত জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধিই হলো দর্শন। অর্থাৎ সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সাক্ষাত হলো দর্শন। মূলত জগৎ জীবন সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন ধারণা দর্শনরূপে পরিগণিত। এ ক্ষেত্রে মানব জ্ঞানের যে কোন সত্য বা তত্ত্ব সন্ধানের বা অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে দর্শন বলা যেতে পারে। আর যে কেউ মানব জ্ঞানের সত্য বা তত্ত্ব উদঘাটনের কাজে কিংবা গবেষণার কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। জ্ঞানের নিদির্ষ্ট কোন একটি শাখায় কোন একজন ব্যক্তি যখন চূড়ান্তভাবে পান্ডিত্য অর্জন করেন তাঁকে ঐ শাখার দার্শনিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত এ সকল বিষয়ে যারা (Ph.D) পি.এইচ.ডি বা ডক্টর অব ফিলোসোফি অর্জন করেন তাঁরা দার্শনিকভুক্ত। সুতরাং জগৎ জীবনের স্বরূপ উদঘাটন এবং সত্যের উপলব্ধিকেই দর্শন বা Philosophy বলা যায়। এটি মানব জ্ঞানের সুপ্রাচীন ও পুরানো শাখা, যা হতে ক্রমাগতভাবে মানব জ্ঞানের অন্যান্য শাখার জন্ম হয়েছেন।

দর্শনের অর্থ

দর্শনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Philosophy'। এটি দুটি গ্রিক শব্দ 'Philos' ও 'Sophia' দ্বারা গঠিত। 'Philos' অর্থ ভালবাসা, অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি, মায়া, মমতা, আকর্ষণ, আসক্তি ইত্যাদি। যেটি ইংরেজিতে love অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'Sophia' অর্থ Knowledge বা Wisdom জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নৈপুন্য, প্রজ্ঞা, সত্যতা উদঘাটন। সুতরাং 'Philosophy'

শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (love for knowledge)', 'জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা, সত্য উৎঘাটন।

বাংলা 'দর্শন' শব্দটি 'দৃশ' ধাতু ও 'অনট্' সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে গঠিত। দর্শন অর্থ চোখে দেখা। তবে এখানে চোখে দেখা অর্থ না বুঝিয়ে বরং তাত্ত্বিক দর্শনকে বুঝায় অর্থাৎ জাগতিক জীবনের নানান বিষয়ের সত্য ও স্বরূপ উপলব্ধি। সত্যের সন্ধান ও সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকারই দর্শন। এ দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, যে কোন বিজ্ঞান যা সত্য অনুসন্ধান করে তাকে দর্শন বলে। দর্শনকে সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মা বা Mother of all knowledge & science বলা হয় (অগাস্ট কোঁত ও ফিকটে) ।

দর্শনের সংজ্ঞা (Definition of Philosophy):

বিভিন্ন দার্শনিক নানাভাবে দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে কয়েকজন দার্শনিকের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল-

১. সক্রেটিস (Socrates) এর মতে, "সত্যের অনুসন্ধানে বা জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজেকে ব্যাপৃত রাখাকে দর্শন বলে।"
২. প্লেটো (Plato)-র মতে, "দর্শন বস্তুর শাশ্বত এবং প্রয়োজনীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে নিবেদিত। (Philosophy aims at the knowledge of the eternal, of the essential nature of things)."
৩. এরিস্টটল (Aristotle) বলেছেন, "দর্শন হল এমন এক ধরণের বিজ্ঞান যা সত্ত্বার স্বরূপ ও এর অন্তর্গত যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অনুসরণ করা।"
৪. পিথাগোরাস (Pythagours) বলেছেন, "দর্শনের অর্থ শুধু জ্ঞানের প্রতি আসক্তিই নয় বরং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে মূল্য নিরূপণে সুনির্দিষ্ট যুক্তি।"
৫. পলসন (Paulsen) এর মতে, "যাবতীয় বিজ্ঞান স্বীকৃত জ্ঞানের সমষ্টিগত রূপ হল দর্শন। (Philosophy is the sum total of all scientific knowledge.)"
৬. রবার্টসন (Robertson) বলেন, "দর্শন সবকিছুর একটা সজ্ঞান এবং নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার অনুসন্ধান।"
৭. কোঁতে (Comte) বলেন, "দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান-এটা সকল বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। (Philosophy is the science of sciences i.e. it is the attempt to co-ordinate the results of sciences.)"
৮. ফিকটে (Fichte) বলেন, "দর্শন হল জ্ঞানের বিজ্ঞান। (Philosophy is the science of knowledge)".
৯. ওয়েবার (Weber) বলেন, "দর্শন হল প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা লাভের অনুসন্ধান, বস্তুর সার্বিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা। (Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things.)"

বস্তুত দর্শনের কোন সন্তোষজনক সংজ্ঞা এককভাবে উপস্থাপন বেশ কঠিন তবে এভাবে বলা যেতে পারে যে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি, সত্য ও স্বরূপ উন্মোচন করে মানব কল্যাণে প্রয়োগ করার আদর্শ বিজ্ঞান হলো দর্শন।

দর্শনের কাজ (Functions of Philosophy):

জাগতিক মহাবিশ্বের পৃথিবী নামক ছোট্ট এই গ্রহটিতে আমাদের জন্ম। সৃষ্টিকর্তা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন । অনন্ত রহস্যে ভরা এই জটিল জগতকে প্রতিনিয়ত আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি । আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে আছে নানান সমস্যা। তাই নানবিধ সমস্যাঘেরা জীবনকে বুঝার চেষ্টা করি আমরা। বুদ্ধিমান মানুষের স্বভাবে তিনটি দিক রয়েছে-চিন্তা করা, সমালোচনা করা, চিন্তা ও সমালোচনার মাধ্যমে বিশেষ অভিমত গঠন করা। মানুষের এই স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে বলতে গেলে দর্শন যেসব কাজ সম্পাদন করে সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- অনুধ্যান বা শূক্ষ্মচিন্তা পরায়ণ (Speculative)

- সমালোচনামূলক (Critical)
- গঠনমূলক (Constructive)

- **অনুধ্যান বা শূক্ষ্মচিন্তা পরায়ণ (Speculative) কাজ:** অনন্ত রহস্যে ভরা এ জগতের দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে সভ্যতার উষালগ্নে এর উৎপত্তি, গতি, পরিণাম ইত্যাদি সম্পর্কে অসংখ্যা প্রশ্ন জেগেছে। এ জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন, জীবনের উৎপত্তি কি করে হল, এর পরিণতি কোথায়, কি এর উদ্দেশ্য এসব প্রশ্নের উত্তর মানুষ চিন্তা করেছে। মানুষের মনের এসব অনন্ত জিজ্ঞাসার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে চায় দর্শন। দর্শন চায় গোটা সত্তার স্বরূপ উদঘাটন করতে, দৃশ্যমান জগতের অনন্ত সত্যকে খুঁজে বের করতে। তাই দর্শনের কাজ হল অনুধ্যান পরায়ণ।
- **দর্শনের সমালোচনামূলক (Critical) কাজ:** শুধু চিন্তা বা অনুধ্যান নয়, দর্শন সমালোচনাও করে। এ সমালোচনা হল বিজ্ঞান সম্মত, পদ্ধতিগত ও নিয়মানুগ। দর্শন হল সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করার পদ্ধতি অথবা বলা যায় এটি একটি চিন্তা-কলা। দর্শনের সমালোচনামূলক কাজ হল, বিচার-বিবেচনাপ্রসূত ও প্রজ্ঞাসম্মত। দর্শনের কাজ হল, অন্ধ ও যুক্তিহীন জগতজীবনের ধারণাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে জগতের সুসংবদ্ধ ও সুসংহত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। বিজ্ঞানের মৌলিক স্বীকার্য বিষয়গুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও যৌক্তিকতা নিরূপণ দর্শনের কাজ।
- **দর্শনের গঠনমূলক (Constructive) কাজ:** দর্শন আমাদের জগতজীবনের একটা সামগ্রিক ধারণা দেয়। এটি খন্ড খন্ড সত্যকে একত্রিত করে অখন্ডতার মাধ্যমে পূর্ণ সত্যকে তুলে ধরে। বিজ্ঞানীগণ অনুমিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, অংশের মাধ্যমে বা খন্ড খন্ড করে এ সত্যকে উপস্থাপন করেন। দর্শন খন্ড খন্ড সত্যকে একত্রিত করে যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরে। শুধু দৃশ্যমান জগৎ নয়, এদের অভ্যন্তরীণ সত্তা নিয়েও এটি আলোচনা করে। দর্শন কার্য-কারণের প্রশ্ন তোলে। বিজ্ঞানীগণ জগতজীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য ও মূল্য নিয়ে গবেষণায় রত, আর এদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয় দর্শন। দর্শন সত্যম, শিবম ও সুন্দরমের আদর্শ ধারণা দেয়।

দর্শনের বিষয়বস্তু (Scope or Subject Matter of Philosophy)

মানব জ্ঞানের প্রাচীনতম শাখা হলো দর্শন। ধর্মভিত্তিক চেতনার মধ্যদিয়ে দর্শনের উৎপত্তি। দর্শন হতেই মানব জ্ঞানের অন্যান্য শাখার জন্ম হয়েছে। দর্শনের প্রধান কাজ হলো জগৎ, জীবন এবং ঈশ্বর প্রভৃতির স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা। দর্শনের আলোচনা জ্ঞানের সত্যতায় পরিপূর্ণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তুতে বেশ বৈচিত্র্য এসেছে। দর্শনের বিষয়বস্তু হিসেবে নিম্নোক্ত উপাদানগুলোকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা যায়-

- **শিক্ষাবিজ্ঞানঃ** শিক্ষা ও দর্শন আপাত আলাদা মনে হলেও। আধুনিক যুগে শিক্ষা ও দর্শনকে আলাদা ভাবা কঠিন। দর্শন মানবীয় কোন সমস্যাকে চুলছেড়া বিশ্লেষণ করে এর স্বরূপ উন্মোচন করে, আর শিক্ষা সেই উন্মোচিত সমস্যাকে নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে সমাধানের পথে এগিয়ে নিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাবিজ্ঞান আদতে দর্শনেরই একটি শাখা।
- **ধর্মতত্ত্বঃ** দর্শন জগতের সকল মানুষের ধর্মীয় প্রভাব, ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে দর্শন ধর্মের সাথে সংঘাতে যায় না। বরং সুন্দর যুক্তিপূর্ণ সম্পর্ক উপস্থাপন করে থাকে।
- **দার্শনিক মতবাদঃ** দর্শন বহুবিদ দার্শনিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। দার্শনিক তত্ত্ব, তথ্য এবং তাদের সার সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কিভাবে শিক্ষায় তাদের প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে দর্শন আলোচনা করে থাকে।
- **জ্ঞানতত্ত্বঃ** দর্শন মানবীয় জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে থাকে। মানুষের জ্ঞানের স্বরূপ কী? জ্ঞানের উৎপত্তি, বিষয়বস্তু সীমা এবং যথার্থতা কতটুকু ইত্যাদি নিয়ে দর্শন আলোচনা করে। অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বের বিশাল পরিধি দর্শনের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত।
- **বিশ্বয় ও দর্শনঃ** দর্শনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো বিস্ময় বা পরম জিজ্ঞাসা। জীবন ও জগতের অনন্ত রহস্য মানব মনে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে থাকে এবং তা থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। কাজেই বিস্ময়বাদ দিলে দর্শন অন্তসার শূন্য হয় পড়ে।

- **অধিবিদ্যাঃ** দর্শনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো অধিবিদ্যা। অধিবিদ্যার আলোচাসূচির মাধ্যমে দর্শন, প্রকৃতি, মন, ঈশ্বর এবং সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। এতে করে দর্শনের আলোচ্য পরিসর বহু বৈচিত্র্যতায় বর্ণিত হয়ে থাকে।
- **নীতিবিদ্যাঃ** দর্শনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো নীতিবিদ্যা। মানুষের ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, মূল্যবোধ ইত্যাদি দর্শন আলোচনা করে যা নীতিবিদ্যার মৌলিক বিষয়বস্তু। অর্থাৎ নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দিক নিয়ে দর্শন কথা বলে।
- **যুক্তিবিদ্যাঃ** এ বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য এবং তাদের সম্পর্কিত বহুবিদ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য দর্শনের যুক্তিবিদ্যা অংশ সারগর্ভ আলোচনা করে থাকে। দর্শনকে এক্ষেত্রে যুক্তি তর্কের বিষয়বস্তু রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- **অভিজ্ঞতা ও দর্শনঃ** দর্শন মানব জ্ঞানের সকল শাখাগত আলোচনাকে অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করে। দর্শন বিজ্ঞানের বিভিন্ন খন্ডিত আলোচনাগুলোকে সমন্বিত করে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ বিষয়রূপে মূল্যায়ন করে থাকে।
- **আদর্শ বিদ্যাঃ** দর্শনের যে শাখাটি মানবীয় আদর্শ এবং আদর্শের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে তাকেই আদর্শ বিদ্যা বলে। একে বিভিন্ন আদর্শের স্বরূপ, তাৎপর্য, সত্য, সুন্দর, মঙ্গল এবং কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গল এ তিনটি পরমাদর্শ নিয়েই এ দর্শন গঠিত।
- **রূপ বিজ্ঞানঃ** বস্তু আমাদের কাছে যেভাবে উপস্থিত হয় তা হলো বস্তুর বাহ্যরূপ। কোনবস্তু আমাদের কাছে যেভাবে ধরা দেয় তা হলো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে। বস্তুর এ বাহ্যরূপ বা দৃশ্যমান অবস্থা নিয়ে দর্শনের রূপ বিজ্ঞান অবিরত আলোচনা করে থাকে তা হলো রূপ বিজ্ঞান।

দর্শনের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Philosophy)

আমাদের জীবনে দর্শন পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এটি মানব জ্ঞানের প্রাচীনতম শাখা হিসেবে স্বীকৃত। যখন মানুষের কোন বিষয়েই ধারণা ছিল না তখন তাদের দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। সভ্যতার আদিতে দর্শন বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে বিপদসংকুল পরিবেশে ভালভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। বর্তমান সভ্যতায়ও দর্শন আমাদের জগৎ জীবনের রহস্য সম্পর্কিত অফুরন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর সরবরাহ করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার এ পর্যায়ে এসেও আমরা দর্শন পাঠের উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারি না। দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা-

- **জীবনের জন্য দর্শনঃ** জীবন ও জগতের মূল্যবোধ এবং অনন্ত রহস্য জিজ্ঞাসাই দর্শনের কাজ। সে দিক হতে জগতের সকল মানুষ কোন না কোন দর্শনের আওতাভুক্ত। এতে করে মানবীয় জীবনের প্রয়োজনেই দর্শন আলোচিত হয়। কাজেই এর গুরুত্ব অনেক।
- **মানবতার আদর্শে দর্শনঃ** দর্শন মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে, মূল্যায়ন করে কিন্তু যন্ত্র হিসেবে দেখে না। দর্শন মানুষকে মূল্যবোধ চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। এতে করে সমাজে মানবীয় আদর্শ এবং দার্শনিক চেতনা সমুজ্জ্বল হয়। কাজেই আমাদের জন্য দর্শন পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।
- **ব্যবহারিক জীবনে দর্শনঃ** মানুষের ব্যবহারিক জীবনে দর্শনের মূল্য সর্বাধিক। দর্শন আমাদের ব্যবহারিক সমস্যাবলির তাৎক্ষণিক কোন সমাধান বা রুটি রুজির ব্যবস্থা করতে না পারলে সুহ জীবন পরিচালনার প্রেরণা যোগায়। মানবীয় সুস্থতা রক্ষা করা দর্শনের কাজ। মনকে সতেজ রাখা দর্শনের লক্ষ্য। কাজেই এর গুরুত্ব অনেক।
- **বিজ্ঞানে দর্শনঃ** দর্শন বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলোর মূল্যায়ন করে থাকে। বিজ্ঞান সাধারণত বিষয়বস্তুর আবিষ্কার করে তত্ত্ব প্রদান করে আর দর্শন তার নিজস্ব চেতনার আলোকে সে সবের ব্যবহারিক গুরুত্বের মূল্যায়ন করে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ করে। কাজেই বিজ্ঞান এবং দর্শন পরস্পর সংঘাতে যায় না, নির্ভরশীলতা বজায় রাখে।

- **জগৎ জিজ্ঞাসায় দর্শনঃ** এ জগৎ রহস্যাবৃত। দর্শন মানবীয় জীবন ও জগতের অফুরন্ত রহস্যের অনন্ত জ্ঞান জিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনা করে ব্যক্তিকে সক্রিয় করে রাখে। এতে করে ব্যক্তি দৈহিক ও মানসিক সুস্থতায় আত্মা এবং পরামাত্মার সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে। কাজেই এটি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনন্ত।
- **মনন চর্চায় দর্শনঃ** দর্শন মানবীয় আদর্শ, মেধা ও মননশীলতা নিয়ে আলোচনা করে। মানুষের বৌদ্ধিক ও নান্দনিক সৌন্দর্যপূর্ণ কার্যাদি দর্শন ভালভাবে মূল্যায়ন করে। কাজেই মানব জানের প্রখর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হলো দর্শন। যার গুরুত্ব অপরিসীম।
- **মানবীয় মূল্যবোধে দর্শনঃ** দর্শন আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, সর্বনাশা কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী, কঠোর সামাজিক প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানবীয় মূল্যবোধ যুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ ঘটায়। এতে করে আমাদের কল্যাণকর দিকটাই এখানে বেশি ফুটে উঠে। সামাজিক জীবন প্রগতিশীলতা পায়।
- **বৃদ্ধি বৃত্তির প্রাধান্যে দর্শনঃ** দর্শন সব সময় মানব বুদ্ধি বৃত্তির প্রাধান্য দিয়ে থাকে। জীবনের রহস্য অনুধাবনে দর্শন নিবেদিত। মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি সবসময় জীবন বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এতে করে দার্শনিক চেতনা এবং তার সম্প্রসারণ বর্ধিত হয়ে থাকে। মানবীয় কল্যাণ সাধিত হয়।
- **যান্ত্রিক সভ্যতায় দর্শনঃ** মানবের যান্ত্রিক সভ্যতায়ও দর্শনের গুরুত্ব রয়েছে। মানব সভ্যতার গোড়া হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত দর্শন মানবীয় কল্যাণে নিবেদিত আছে। দর্শন কখনও সভ্যতার অগ্রযাত্রার সাথে সংঘাতে যায় না বরং মানব সভ্যতাকে কিভাবে আগে বেশি গণমুখী ও সম্প্রসারণ করা যায় দর্শন তা নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা করে থাকে। কাজেই সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শ অনুধাবনের জন্য আমাদের দর্শন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- **সাহিত্য সংস্কৃতিতে দর্শনঃ** সাহিত্য সংস্কৃতি, শিল্পকলা, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ মানবীয় আদর্শ অনুধাবনের বিষয়বস্তুর উপরও দর্শনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। দার্শনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হতে পারেন না। কাজেই আমাদের দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- **মানব সভ্যতার গোড়াতে দর্শনঃ** মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষের স্বাধীন চিন্তা ভাবনার উষালগ্নেই দর্শন তার আপন মহিমায় নিজস্ব প্রায়োগিক ভূমিকা পালন করে আসছে। ধর্মীয় কিংবা সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে আইয়োনীয় বা প্রাচীন গ্রীকরাই সর্বপ্রথম মানুষের স্বাধীনতা এবং ইচ্ছাশক্তির স্বীকৃতি দেয়। যেখানে দার্শনিক চেতনা বিকশিত হয়েছিল।
- **আদর্শ রূপায়ণে দর্শনঃ** দর্শন কেবল জীবন ও জগতের মূল্যায়নই করে না বরং জীবনের সাথে সাথে সার্থক আদর্শেরও সন্ধান দিয়ে থাকে। সত্য, মঙ্গল, সুন্দর এ তিনটি মানবীয় পরমাদর্শ দর্শন আলোচনায় আনে। কাজেই মানবীয় পরমাদর্শকে দর্শন অস্বীকার করে না।

শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy)

দর্শনের একটি প্রায়গিক বা ফলিত শাখা হলো শিক্ষা দর্শন। শিক্ষা দর্শন এর উৎপত্তি এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বেশি দিনের পুরনো নয়। এটি দর্শনের তত্ত্ব ও তথ্যগত দিক নিয়ে শিক্ষার সাথে মানব জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট, সম্পর্ক ও প্রয়োগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই দর্শন যখন শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রকৃতি পরিসর এবং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে, তখন তাকে শিক্ষা দর্শন (Educational Philosophy) বলা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা দার্শনিকদের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাদর্শন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা দার্শনিকের মতে শিক্ষাদর্শন হলো- "দার্শনিক মতবাদগুলোর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষা আদর্শের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রয়োগ আলোচনার শাস্ত্রই হলো শিক্ষাদর্শন"- সুশীল রায়। "সামাজিক পরিবেশে দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগে মানবীয় গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ এর বিষয়ই হলো শিক্ষাদর্শন"-এম. আর. চার্লস। 'জীবনের রহস্য উদঘাটন এবং তার প্রয়োগের বিজ্ঞানই হলো শিক্ষা দর্শন"-জন ডিউই।

বস্তুত মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, মূল্যবোধ, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ প্রয়োগে দার্শনিক চেতনার সমন্বয়ের বিষয়কেই শিক্ষা দর্শন বলা হয়। এটি দর্শন কিংবা শিক্ষা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি নতুন শাখা।

শিক্ষাদর্শনের কাজ (Functions of Educational Philosophy) :

শিক্ষাদর্শন শিক্ষাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। নিচে শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন কাজ আলোচনা করা হল-

১. **শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে শিক্ষা দর্শনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোন একটি দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেশের জাতীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদর্শন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করে থাকে।

২. **শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সহায়তা:** শিক্ষাদর্শন শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সহায়তা করে। শিক্ষাক্রমে কি কি বিষয়বস্তু থাকবে এবং জীবনের কোন মূল্যবোধের উপর শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে শিক্ষাদর্শন তাও নির্ধারণ করে।

৩. **পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন:** শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় তার উদ্দেশ্য, মান ও নীতি নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। পাঠ্যপুস্তকে সমসাময়িক জীবনাদর্শ প্রতিফলিত না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। তাই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে শিক্ষাদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ:** শিক্ষাদর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হল, শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ। শিক্ষণ পদ্ধতি হল শিক্ষার্থী ও পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া। আধুনিককালের প্রত্যেকটি শিক্ষণ পদ্ধতি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাদর্শনের কাজ হল, দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ।

৫. **সুশিক্ষকের গুণাবলি ও কর্তব্য নির্ণয়ঃ** একজন সুশিক্ষকের কি ধরণের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, শিক্ষার্থীদের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু ইত্যাদি নির্ণয় করা শিক্ষাদর্শনের কাজ। শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন মতবাদ যেমন- ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্ব ঠিক করে দেয়।

৬. **ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন:** শিক্ষাদর্শনের কাজ হল, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের চর্চা ও প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুষম ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করা ও নির্দেশনা প্রদান। শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তাকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করা শিক্ষাদর্শনের অন্যতম কাজ।

৭. **শিক্ষার্থীর চিন্তনকে উজ্জীবিত করা:** দর্শনের গতিময় দিক হল শিক্ষা। জীবন কেমন হওয়া উচিৎ, মানুষের জীবনবোধ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কিত গভীর চিন্তাভাবনাকে শিক্ষাদর্শন উজ্জীবিত করে ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

৮. **জীবনের মূলতত্ত্ব নির্ধারণ:** শিক্ষাদর্শন সার্থক জীবন যাপনের মূলতত্ত্বগুলি ঠিক করে দেয়। এই তত্ত্বগুলির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ, শিক্ষার আদর্শ ইত্যাদি নির্ধারিত হয়।

৯. **নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি:** শিক্ষাদর্শনের একটি অন্যতম কাজ হল, নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি। শিক্ষাদর্শন পরিবর্তিত মূল্যবোধের ধারণার সঙ্গে নতুন গতিশীল মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষাকে গতিশীল করতে সাহায্য করে।

১০. **মূল্যায়ন:** শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবিষয়, শিক্ষণ প্রচেষ্টা ইত্যাদি কতখানি সার্থক হয়েছে তা পরিমাপ করা। এই মূল্যায়নের পিছনে উদ্দেশ্য থাকে বলে এর উপরে দার্শনিক প্রভাবও রয়েছে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য একমাত্র দর্শন শাস্ত্রই ঠিক করতে পারে। তাই শিক্ষাদর্শন পরোক্ষভাবে শিক্ষার মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা ও জীবন এই তিনটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ, শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের গতি প্রকৃতি ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়েই শিক্ষাদর্শন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক (Relationship of Philosophy and Education):

দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। আধুনিককালে শিক্ষা বলতে ভুরিভুরি জ্ঞান সঞ্চয়কে বুঝায় না বরং জীবনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতিই হল শিক্ষা। আধুনিক দর্শন বাস্তবধর্মী, ব্যক্তি ও সমাজের যথার্থ কল্যাণে নিয়োজিত। দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। নিচে দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক আলোচনা করা হল-

১. **জীবনের গতি নির্ধারণে শিক্ষা ও দর্শন:** মানব জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে দর্শন ও শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীর মধ্যে সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তন আনা। এই আচরণ কোন দিকে পরিচালিত হবে দর্শন তা ঠিক করে দেয়। শিক্ষার্থীর জীবনে কোন মূল্যবোধ জাগ্রত হবে, শিক্ষক কোন জীবনাদর্শ অনুশীলন করবেন, শিক্ষণ পদ্ধতি কেমন হবে এসব কিছু নির্ণয় করবে দর্শন শাস্ত্র। এক কথায় দর্শন শিক্ষা বা বৃহত্তর অর্থে জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করে। আর শিক্ষা সেই উদ্দেশ্যকে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তার পদ্ধতি-কৌশক নিয়ে আলোচনা করে।

২. **বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য:** দর্শন ও শিক্ষা উভয়ের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমেই দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার হয়ে থাকে। দর্শন নানা তর্ক বিতর্কের পর সিদ্ধান্তে আসে এবং সে অনুসারে জীবনাদর্শ স্থির করে দেয় ও জীবন যাপনের পথনির্দেশ দেয়, শিক্ষার মাধ্যমেই এই জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ অন্যের মধ্যে জাগ্রত হয়। শিক্ষাই এই মূল্যবোধ অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে। সুতরাং বলা যায় দর্শন হল তাত্ত্বিক দিক আর শিক্ষা হল ব্যবহারিক দিক।

৩. **শিক্ষার বিভিন্ন দিক দর্শন প্রভাবিত:** শিক্ষার সব দিকই দর্শন প্রভাবিত। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিক্ষকের কর্তব্য, শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি সবকিছুকেই দর্শন প্রভাবিত করে। এদিক দিয়ে শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হলে তাকে দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করতে হবে উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য।

৪. **পারস্পরিক ঘনিষ্টতা:** দর্শন শিক্ষার দিক নির্দেশনা দেয়। আর শিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগ কৌশল শেখায়। তাই বলা হয় দর্শন ছাড়া শিক্ষা অন্ধ এবং শিক্ষা ছাড়া দর্শন অচল। অন্যদিকে দর্শন জীবনের রহস্য উদঘাটন করে আর শিক্ষা জীবনের সার্বিক উন্নতি সাধন করে থাকে। সুতরাং শিক্ষা এবং দর্শন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ।

৫. **সার্থক জীবনের বিশ্বাস:** দর্শন মানুষের জীবনের আদর্শ, মৌলিক রীতিনীতি, সররাবহ করে থাকে। আর শিক্ষা সেসব রীতি নীতি এবং মতবাদকে অবলম্বন করে মানব জীবনকে সার্থক জীবনে রূপান্তরিত করে।

৬. **মানবীয় সমস্যার সমাধান:** আমাদের জীবনে সমস্যার শেষ নেই দর্শন মানবীয় সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে তার সমাধানের পথ বলে দেয়। অন্যদিকে শিক্ষা ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের নানাবিদ সমস্যার সমাধানের কৌশল শেখায়। ব্যক্তিকে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত করে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যক্তিকে ভালভাবে বেঁচে থাকার দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ব করতে শেখায় যাতে করে সে নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারে। কাজেই দর্শন ও শিক্ষা এখানে ব্যক্তির কল্যাণে নিয়োজিত।

৭. **জীবনের রহস্য উদঘাটন ও মুল্যায়ন:** দর্শন এবং দার্শনিক মতবাদগুলো তার তত্ত্বগত আলোচনায় মানব জীবন তথা জগত জীবনের রহস্য উদঘাটনের কাজে নিবেদিত। অন্যদিকে শিক্ষা তার তত্ত্বগত আলোচনায় দার্শনিক তত্ত্বের যথার্থতার মূল্যায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে দর্শন শিক্ষার কার্য পরিধিকে বর্ধিত করে। আর শিক্ষা দর্শনের উদ্ভাবিত তত্ত্বের যথার্থতা মূল্যায়ন করে দর্শন বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

৮. **মূল্যবোধের উদ্বোধন এবং বাস্তবায়ন:** দর্শন হলো মানব জীবনের মৌলিক মূল্যবোধের গবেষণাগার। আর শিক্ষা হলো এ গবেষণাগার হতে প্রসূত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের হাতিয়ার। শিক্ষা তার সামগ্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দর্শন প্রসূত মানবীয় মূল্যবোধকে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করে জাগতিক কল্যাণ সাধন করে।

৯. **যথার্থ সত্যের অনুসন্ধান এবং প্রতিফলন:** জাগতিক যথার্থ সত্যের অনুসন্ধানে দর্শনে নিবেদিত। আর শিক্ষা ব্যক্তি জীবনে দর্শনের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ সত্যের অনুসন্ধান এবং বাস্তবায়নে দর্শন ও শিক্ষা উভয়েই নিবেদিত। উভয়ের প্রভাব এখানে নির্ভরশীলতায় সংশ্লিষ্ট।

১০. **সত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং আদর্শের প্রতিফলন:** দর্শনের পথ হলো জ্ঞানের পথ। বিশ্বজগতের অতিন্দ্রীয় ও সামগ্রিক সত্তা নিরূপণ এবং চরম আদর্শের জগৎ জীবনের মূল্য নির্ধারণ করা মুখ্যত দর্শনের উদ্দেশ্য। দর্শন সত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে যথার্থ আদর্শ উদ্ভাবন করে, আর শিক্ষা সে আদর্শগুলোকে তার সামগ্রিক কর্মকান্ডের মাধমে শিক্ষার্থীর বিকাশ ঘটিয়ে জীবনের উপর প্রতিফলিত করে থাকে। কাজেই দর্শন এবং শিক্ষা পরস্পর একই সূত্রে গাঁথা। উভয়েই জ্ঞানের বিষয়গুলোকে সংগঠিত করে মানবীয় জীবনে সুন্দর পবিত্র ও বিশ্বস্ত এবং প্রগতিশীল করণে নিবেদিত।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, দর্শন জীবনকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করে, আর শিক্ষা জীবনকে পূর্ণাঙ্গ বিকশিত করে। তাই এদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

- দার্শনিক ফিকটে (Fichte) বলেন, "দর্শনের অভাবে শিক্ষার ধারণা কখনও পরিষ্কার হবে না। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি কখনও কার্যকর হতে পারে না। (The art of education will never attain complete clearness without philosophy. One without the other is incomplete, unserviceable)"
- রস (Ross) মনে করেন, "দর্শন ও শিক্ষা হল একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ, যার একটি হল তাত্ত্বিক দিক ও অন্যটি ব্যবহারিক। "(Philosophy and Education are two sides of a coin, the former is contemplative while the latter is the active side.)"

শিক্ষা দর্শনকে কৃত্রিমতা ও অবাস্তবতার হাত থেকে রক্ষা করে। আবার দর্শন শিক্ষাকে একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচিয়ে কার্যকরী করে তোলে। শিক্ষা হল প্রয়োগমূলক দর্শন। শিক্ষার কাজ হল, কোন একটি উপায় অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন করা। দর্শন সেই বাঞ্ছিত উপায়টি ঠিক করে দেয়। দর্শন হল প্রজ্ঞা (Wisdom) বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যা শিক্ষার মাধ্যমে এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়।

দার্শনিক মতবাদ (School of Philosophy)

দর্শন মানব জ্ঞানের সবচেয়ে পুরনো শাখা। এ শাখা হতে সময়ের পরিবর্তনে ক্রমবিবর্তনের মধ্যদিয়ে মানব জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য দর্শনকে মানব জ্ঞানের অনেকগুলো শাখার জননী বলা হয়। দর্শন হতে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সমাজ বিজ্ঞানের জন্ম। কাজেই দর্শন ছাড়া মানব জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় জ্ঞান চর্চায় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আসে না। দর্শন হতেই শিক্ষা দর্শনের আবির্ভাব। দর্শন ও শিক্ষা দর্শন শিক্ষাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। এদের মাঝে ঘনিষ্টতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং দর্শনকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন বেশ কঠিন। শিক্ষা ও দর্শন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল দুইটা বিষয়। কাজেই দর্শন ও শিক্ষা পরস্পর সমন্বিত বলা যায়।

দার্শনিক মতবাদকে ইংরেজিতে School of Philosophy বলা হয়। সাবর্জনীন বিধিত ইংরেজি School শব্দটি গ্রিক শব্দ Skoole হতে উদ্ভব হয়েছে। গ্রিক Skoole শব্দের অর্থ হল জ্ঞান চর্চার স্থান যাকে বাংলায় আমরা বিদ্যালয় বা শিক্ষালয় হিসেবে জানি।

তাই School of Philosophy বলতে বুঝায় জ্ঞান ও সত্য অনুসন্ধান এর চর্চাস্থল। বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষামনীষীগণের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও তাত্ত্বিক আলোচনা ভান্ডারকে দার্শনিক মতবাদ বা দার্শনিক মতাদর্শন বা School of Philosophy বলা হয়। এখানে School শুধু বিদ্যালয় নয় বরং ব্যাপক তাৎপর্যময় জ্ঞানীয় চেতনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা দার্শনিক মতাদর্শনের আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ও চর্চায় জ্ঞানবিভাগ বা আলয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যুগে যুগে মানবীয় প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তাপ্রসূত গবেষণায় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের জন্ম হয়েছে। যেমন-

- ভাববাদ/আদর্শবাদ (Idealism)
- প্রয়োগবাদ (Pragmatism)
- প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

- বাস্তববাদ (Realism)
- বস্তুবাদ/জড়বাদ (Materialism)
- যুক্তিবাদ (Rationalism)
- অপরিহার্যবাদ (Essentialism)

শিক্ষায় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রয়োগ (Implication of Philosophical Thoughts in Education)

পৃথিবীতে যে কয়টি দার্শনিক মতবাদ বা দর্শনতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে মানুষ। কোন আধ্যাত্মিক শক্তি বা অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে দর্শনতত্ত্ব তৈরী হয়নি । দার্শনিক মতবাদসমূহ মানুষ তার প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, চেতনা এবং বাস্তব সফলতার উপর ভিত্তি করে কতিপয় অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফলের মধ্যদিয়ে প্রণীত হয়েছে । কোন সময় কোন একটি দার্শনিক মতবাদ প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে আবার অন্যকোন একসময়ে অন্য আরেকটি দার্শনিক মতবাদ সমুজ্জ্বল হয়ে বিশ্ব সভ্যতায় নাড়া দিয়েছে। তখন পূর্বতন দর্শন মতবাদটি হয়তো ম্লান হয়ে গেছে। এভাবেই একটার পর একটা দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি মতবাদই শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু না কিছু দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন করেছে, যার ফল বিশ্ববাসী ভোগ করেছে।

মানব সভ্যতার গোড়াতেই বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান চর্চার কাজ শুরু হয়। যদিও তখনকার জ্ঞানচর্চা আজকের দিনের জ্ঞান চর্চার মতো ছিলনা। তদোপরি তা জীবন দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানব সৃষ্ট দর্শনের কাজ শুধু সত্যের অনুসন্ধান বা জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দর্শন হচ্ছে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা। আর শিক্ষা সে নির্দেশনাকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করে সমাজ পরিবর্তনে সহায়তা করে। শিক্ষা পদ্ধতি-কৌশল ব্যবহার করে দার্শনিক মতবাদের সফল ব্যবহার করে দার্শিক চিন্তা সমাজ ও মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। এভাবে শিক্ষা দার্শনিক মতবাদসমূহকে বাচিয়ে রাখে।

দর্শন শিক্ষার সাধারণ তত্ত্ব বিশেষ। দার্শনিক চেতনায় সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ। যুগের চাহিদার প্রেক্ষাপটে যেসব দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে এখানে শিক্ষাদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলো আলোচনা করা হলো। যেমন- ভাববাদ (Idealism), প্রকৃতিবাদ (Naturalism), প্রয়োগবাদ(Pragmatism)

ভাববাদ (Idealism)

ভাববাদ দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী দর্শন। দর্শনের ইতিহাসে বিশ্বের বিখ্যাত সব দার্শনিকদের বেশির ভাগই ভাববাদী দার্শনিকভুক্ত। ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক হলেন মহামতি গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস। তাঁর জ্ঞান চর্চার সময়কাল থেকেই ভাববাদের শুরু। ভাববাদী দার্শনিকগণ মানুষ এবং বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে একক ও অভিন্ন ভাব সত্তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। ভাববাদের মূল দর্শন হল এ জাগতিক মহাবিশ্ব বা জড় জগতের বাইরে বিশাল আরেকটি জগৎ আছে যার নাম ভাব জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ। ভাবজগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতের অধিশ্বর হলেন এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা। ভাবের মধ্যদিয়েই স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। ভাববাদের মূলকথা হল ভাব চিরন্তন, চিরসত্য ও অবিনশ্বর।

ভাবের মধ্যদিয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার নৈকট্য লাভ করে। পরমাত্মা এক এবং অনন্ত। জগতের সবকিছুই ভাবকেন্দ্রিক। ভাবের বাইরে কোন কিছু নেই। মানুষ ভাব কেন্দ্রিক চিন্তার মধ্য দিয়েই কর্মজগতে প্রবেশ করে। ভাব চিরন্তন সত্যকে অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্যদিয়ে খুঁজে বের করতে সহায়তা করে। জগতের সকল বাহ্যিক বস্তুর জ্ঞান ভাব কেন্দ্র থেকে উৎসারিত। ভাবকে বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান চর্চা করা সম্ভব নয়। ভাবের মধ্য দিয়েই জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পরম উপলব্ধি প্রকাশ পায়। ভাব চিরন্তন তবে এর কোন বাহ্যিক সত্তা নেই। ভাববাদ বিশ্বাস করে জগতের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত

ভাবের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। ভাবকেন্দ্রিক প্রজ্ঞায় সকল সমস্যাকে জয় করা যায়। ভাববাদী দর্শনে ভাবের অনুধাবন, উপলব্ধি এবং প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য। ভাববাদের মতে ভাবের মধ্যদিয়ে ইন্দ্রিয় এবং অতিন্দ্রিয় জগতের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে মানব কল্যাণ সাধন করা যায়।

ভাববাদ (Idealism) কী?

ভাববাদের ইংরেজি হল Idealism। এটি Ideal ও ism শব্দ দুইটির সমন্বয়ে গঠিত। Ideal শব্দের অর্থ হল মত, ভাব, আদর্শ, নীতি, খাঁটি ইত্যাদি। আর Lism শব্দের অর্থ হল চেতনা বা প্রত্যয়। ইংরেজি Idea শব্দটি গ্রিক Ideas শব্দ হতে উৎগত। যার অর্থ ভাব বা মতাদর্শ। তাই শাব্দিক অর্থে বলা যায় মানুষের ভাবকে কেন্দ্র করে যে মতাদর্শ বা চেতনার জন্ম হয়েছে তাই ভাববাদ। অর্থাৎ জগতের সকল কিছু চিন্তা ভাবনার মূলে রয়েছে ভাব। আর এ ভাবকে কেন্দ্র করে মানব দর্শন জগতে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের উদ্ভাবন হয়েছে তাকেই ভাববাদ বা Idealism বলে।

দার্শনিকদের মতে ভাববাদ

ভাববাদী দার্শনিক গণ বিভিন্ন সময়ে ভাববাদের উপর নিজস্ব মতামত বা নিজস্ব চিন্তা দর্শন প্রকাশ করেছেন। এখানে কয়েকজন ভাববাদী দার্শনিকের অভিমত উপস্থাপন করা হল-

- জ্ঞান তাপস সক্রেটিসের মতে, “ভাব চিরন্তন, চিরসত্য, অনন্ত; এটি জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে উপলব্ধির মাধ্যমে নিম্ন লাভ করে”।
- প্লেটো বলেন, “বাস্তব পৃথিবী সার্বজনীন ধারনার মাঝে সীমাবদ্ধ যা ভাবকেন্দ্রিক। ভাব চরমবাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে”।
- কান্ট বলেন, "অতীন্দ্রিয় জগৎ চিরসত্য, চিরন্তন যা ভাব কেন্দ্রিক ভাবের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় জগতের মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হয়"।
- উইলহেমের মতে, “জগতের সকল কিছু চিন্তা ভাবনার মূলে রয়েছে ভাব”।
- ব্রাডলের মতে, "অভিজ্ঞতা হল সামগ্রিক সত্তা, যা ভাবকেন্দ্রিক, যেখানে যুক্তিবুদ্ধি, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং সামর্থ মিলে একাকার হয়ে আছে"।
- হেগেল বলেন, "জীবন এবং জগৎ উভয়ই সত্য যার উপলব্ধি হল ভাব"।

পরিশেষে বলা যায় ভাববাদ বলে একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, অবিনশ্বর এবং অনন্ত। পরমাত্মার উপলব্ধি গড(God) আল্লাহ, ঈশ্বর, ব্রহ্মা এবং এক সৃষ্টিকর্তা নামে অনুধাবনীয়। ভাবের মধ্য দিয়েই পরমাত্মার এ উপলব্ধি অনুধাবনীয়। আর এ ভাব দর্শনকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত মতবাদই ভাববাদ (Idealism) ।

ভাববাদের বৈশিষ্ট্য

ভাববাদ বিশ্লেষণ করলে যেসকল মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাই ভাববাদের বৈশিষ্ট্য । ভাববাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহকে উল্লেখ করা যায়। যেমন-

- পরমাত্মা এক, অখন্ড এবং অবিনশ্বর যা কেবল ভাবের মধ্যদিয়ে উপলব্ধিযোগ্য।
- জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্পর্ক ভাবের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়।
- জগৎ-জীবন সম্পর্কে চিরসত্য উদঘাটনে ভাববাদ অদ্বিতীয় মাধ্যম।
- অতীন্দ্রিয় জগৎ কল্পনা অবিনশ্বর ভাবকেন্দ্রিক।
- পরমাত্মাই অতীন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় জগতের নিয়ন্ত্রণকারী ।
- ভাব সত্য, শ্বাশত, সুন্দর, পবিত্র এবং অবিনশ্বর।

- ভাব চিরসত্য, চিরস্থায়ী এবং চিরন্তন।
- বস্তুর পরিপূর্ণ অস্তিত্ব (ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয়) ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।
- আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সসীম, ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু ভাবজগৎ অসীম, অবিনশ্বর।

ভাববাদের প্রবক্তা

গ্রিক দার্শনিক এনাক্সাগোরাসের চিন্তাজগৎ হতে ভাববাদের উৎপত্তি ঘটে তিনিই Philosophy শব্দের প্রবর্তক। সক্রেটিস ভাববাদি মতাদর্শ প্রচার করেন। প্লেটো ভাববাদের উপর লিখিত বর্ণনা উপস্থাপন করেন তাই প্লেটোকে ভাববাদের জনক বলা হয়। পরবর্তীতে ইমানুয়ের কান্ট, উইলহেস হেগেল, ব্রাডেল, বার্কলি কমেনিয়াস, পেস্তালৎসী, স্যার এফ ফ্রয়েবল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ ভাববাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কাজেই তাঁরা ভাববাদী দার্শনিক শ্রেণীভুক্ত।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের প্রভাব

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ বিশ্বে ভাববাদী দর্শন কেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষা মূল্যায়ন ভাববাদের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের গুরুত্ব তথা অবদানগত প্রভাব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

ভাববাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য

- শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সম্পর্কিত ভাব কেন্দ্রিক।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে ভাবমূলক জীবন সচেতনতা সৃষ্টি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।
- শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা।
- শিক্ষার লক্ষ্য হবে সার্বজনীন কল্যাণকর নীতিবোধের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করা।
- শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে আত্মোপলব্ধি জাগ্রত করা।
- ভাব চিরন্তন, অবিনশ্বর ও অনন্ত এ তত্ত্ব উপলব্ধিতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্পর্কিত নান্দনিক বিকাশ।

ভাববাদ এবং শিক্ষার্থী

ভাববাদে শিক্ষার্থীর বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে শিশুর বিকাশ তথা জ্ঞান অর্জনের দিক নির্দেশনায় ভাববাদ চরম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। নিম্নে ভাববাদ এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ উল্লেখ করা হলো-

- ভাববাদের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশই হলো শিক্ষা।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষা হবে ভাবকেন্দ্রিক। যাতে কল্পনা এসে ভিড় করে ভাবের উদয় করে।
- শিক্ষার্থীরা ভাবদর্শনের মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতি লাভ করবে।
- ভাবকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর চরম আত্মোপলব্ধি জন্মিবে।
- ভাবকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জাগতিক বিশ্বপ্রকৃতি উপলব্ধি করবে।
- ভাবের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা জীবাত্মা এবং পরম আত্মার সম্পর্ক খুঁজে পাবে।

ভাববাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ

- শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক।
- প্রকৃতি ধারণার মাধ্যমে পরমাত্মার উপলব্ধি লাভ করবে।
- শিক্ষার্থীরা বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মসক্রিয়তায় উপলব্ধি করবে।
- ভাববাদী দর্শনের মতে শিক্ষার্থীরা স্রষ্ঠার সৃষ্টি দর্শনে পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করবে।
- ভাববাদের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীরা আত্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থীদেরকে অনুকরণ, অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

ভাববাদ ও শিক্ষকঃ

- পরমাত্মার মূল্যবোধের প্রতি শিক্ষক হবে শ্রদ্ধাশীল।
- শিক্ষক হবেন সংবেদনশীল এবং মমত্ববোধ সম্পন্ন।
- শিক্ষক ব্যক্তি বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাবেন।
- ভাববাদে শিক্ষক হবেন চরম আত্মোপলব্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আত্মোপলব্ধিতে প্রভাবিত করবেন।
- শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে সম্প্রীতিমূলক পবিত্রভাব কেন্দ্রিক।
- শিক্ষক হবেন ধাত্রীর সাথে তুলনীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

ভাববাদ ও শিক্ষার পরিবেশঃ

- শিশুর বিকাশ হবে উন্মুক্ত পরিবেশের চারণ গাছের মতো।
- ভাববাদের দৃষ্টিতে শিক্ষার পরিবেশ হবে সুন্দর, কাঙ্ক্ষিত।
- পরিবেশের পূত-পবিত্রতায় শিশুর শিক্ষা সম্পন্ন হবে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কেন্দ্রিক।
- পারিপার্শ্বিক ভাবের মধ্য দিয়েই শিশুর পরমাত্মার উপলব্ধি অর্জন করবে।
- বংশগতি ও পরিবেশগত সুস্থতা হবে চিরন্তন ভাবকেন্দ্রিক।
- শিক্ষার পরিবেশ হবে অনন্ত নির্মল ও পবিত্র।

প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

প্রকৃতিবাদ দার্শনিক মতবাদগুলোর মাঝে প্রকৃতিবাদ বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং প্রযুক্তি প্রকৃতিবাদ দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছে। প্রকৃতিবাদ ভাববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, এবং ক্রমবিবর্তন চেতনাকে অনেক বড় করে মূল্যায়ন করা হয়। প্রকৃতিগত স্বাভাবিক রীতি নীতিকে কেন্দ্র করেই প্রকৃতিবাদের জন্ম। অতীতে ভাববাদী শিক্ষা দর্শনে প্রভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির প্রেক্ষাপটে প্রকৃতিবাদের উত্থান হয়। প্রকৃতি কেন্দ্রিক শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবধারার শিক্ষা সংস্কৃতিকে অপসারণ করে প্রকৃতিবাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

জ্যাক রুশোর শিক্ষামূলক সংস্কার প্রকৃতিবাদকে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন চেতনা(Theory of Evolution) এবং হুগো দ্যা ভ্রিসের ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Mutation) বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এ প্রকৃতিবাদকে আরো বেগবান করে তোলে। যার ফলে তৎকালিন বিশ্বে প্রকৃতিবাদ ভিত্তিক প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষা চেতনা অনেক বেশি সম্প্রসারিত হয়। শুরু হয় শিশুর প্রকৃতি কেন্দ্রিক শিক্ষা দান প্রক্রিয়া। আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, সভ্যতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রগতির সব ক্ষেত্রেই প্রকৃতিবাদের চেতনা বর্তমানে কার্যকরভাবে নিজের

অবস্থান অক্ষুন্ন রেখেছে। প্রকৃতিবাদসহ বেশ কয়েকটি দার্শনিক মতবাদের প্রভাবেই কালজয়ী রাজনৈতিক মতবাদ কমিউনিজমের জন্ম হয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নে প্রকৃতিবাদ দর্শনের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে এখনও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

প্রকৃতিবাদী দর্শনের সাথে শিক্ষা দর্শনের এত ঘনিষ্ট মিল যে মূলত এ দর্শনকে এককভাবে দার্শনিক মতবাদ বলা বেশ দূরহ বরং এটিকে দর্শনতত্ত্ব না বলে শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা তাত্ত্বিকগণ শিক্ষা দর্শন বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করেন।

প্রকৃতিবাদ এর ধারণা (Concepts of Naturalism)

প্রকৃতিবাদের ইংরেজি শব্দ Naturalism। ইংরেজি Nature এর অর্থ প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর ism মানে চেতনা, আদর্শ বা মতবাদ । Naturalism মূলত Nature(প্রকৃতি) ও Natural Rules(প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা) কে কেন্দ্রকরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং অর্থগতভাবে বলা যায় যে, প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে কেন্দ্রকরে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদই হল প্রকৃতিবাদ। অর্থাৎ দার্শিনিক মতবাদগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে যে মতবাদের জন্ম হয়েছে তাকেই প্রকৃতিবাদ বা Naturalism । প্রকৃতিবাদের চেতনায় এ বিশ্ব প্রকৃতিই হল সবচেয়ে বড় বাস্তবতা, আর প্রকৃতির চিরচেনা নিয়ম শৃঙ্খলাই হল সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম অনুকরণীয় সিদ্ধান্ত। এখানে দৃশ্যমান প্রকৃতি ও তার শৃঙ্খলাই সব কিছুর উর্ধ্বে বিচার্য বিষয়। প্রকৃতিবাদীরা অতিন্দ্রীয় কোন ব্যখ্যাকে বিশ্বাস করে না।

দার্শনিকদের মতে প্রকৃতিবাদ (Thoughts of Philosopher)

প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিকগণ যেসব মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তার কয়েকটি এমন-

- জ্যাঁ জ্যাক রুশো বলেন, “প্রকৃতিই হল আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সত্য এবং প্রকৃতিগত শিক্ষাই সুন্দর, বিশ্বস্ত ও পবিত্র যা প্রকৃতির কাছ হতেই প্রাপ্ত হয়”।
- জন এমোস কমেনিয়াস এঁর মতে, “শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতিকেন্দ্রিক, জীবন ভিত্তিক, বিমূর্ত কৃত্রিমতার স্থান এখানে নেই, আর প্রকৃতি কেন্দ্রিক আদর্শই হল একমাত্র তত্ত্ব”।
- চার্লস রবার্ট ডারউইন বলেন, “প্রকৃতিগত বিবর্তনই শিক্ষার্থীর শিখনীয় বিষয় বস্তুর পুনর্বিন্যাস করে”।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, “শিশুকে প্রকৃতির কূলে ছেড়ে দাও, তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকৃতির কাছ হতে যথার্থ শিক্ষা লাভ করবে”।
- স্যার এফ, ফ্রয়েবল, “শিক্ষা হল মানুষের আত্মসক্রিয়তায় প্রকৃতিকেন্দ্রিক যথার্থ জ্ঞান অর্জন যা তাকে সমাজধর্মী সুন্দর, বিশ্বস্ত ও পবিত্র উপলব্ধিতে আবদ্ধ করে”।
- জন লক বলেন, “প্রকৃতি প্রদত্ত শৃঙ্খলার অনুসরণ অনুকরণ লব্ধ প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শনই হল প্রকৃতিবাদ”।

পরিশেষে বলা যায় প্রকৃতিবাদ সম্পূর্ণ প্রকৃতিকেন্দ্রিক একটি দর্শন তত্ত্ব। প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলার অনুকরণে এবং মানবীয় প্রজ্ঞার সংমিশ্রণে যে দার্শনিক মতবাদের জন্ম হয়েছে তাকেই প্রকৃতিবাদ (Naturalism)।

প্রকৃতিবাদের প্রকৃতি (Nature of Naturalism)

প্রকৃতিবাদ মূলত তিন ধরণের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যাদেরকে প্রকৃতিবাদের প্রকৃতিরূপে জ্যাক রুশো অভিহিত করেছেন। যেমন-

(ক) মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি (Psychological Nature): মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি শিশুর আবেগ, আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি ও স্বভাব ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশু মনোবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শিশু

মনোবিজ্ঞান মনোবৈজ্ঞানের একটি শাখা। তাই স্বার্থক শিক্ষণ নিশ্চিত করণে প্রকৃতিবাদের মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি অত্যান্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

(খ) জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি (Biological Nature): প্রকৃতিবাদের জীবতত্ত্ব অংশ মানুষের সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ভাতৃত্ব, সততা, মমতা, মহত্ব, দয়া, দেশপ্রেম, স্নেহ, সৌন্দর্য্য, সৌজন্যবোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী আলোচনা করে। শিশুর নান্দনীকতা, সৌজন্যবোধ, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে প্রকৃতিবাদের জীবতত্ত্ব অংশ অত্যান্ত কারর্যকর ভূমিকা পালন করে।

(গ) বস্তুজাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature): প্রকৃতিবাদের বস্তুজাগতিক অংশ জাগতিক বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আকাশ, বাতাস, গ্রহ, তারা, সূর্য, পানি, মাটি ইত্যাদির অস্তিত্ব ও ব্যবহার উপযোগীতার মাধ্যমে দার্শনিক মতামত ব্যাখ্যা করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের গণিত, বিজ্ঞান, বাওবি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় পাঠ দান করার সময় প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধ্যানমূলক শিখন, বাস্তব ও অর্ধ-বাস্তব পর্যায় শিখন ধারণার সাথে একান্ত সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

প্রকৃতিবাদের প্রবক্তা (Philosopher of Naturalism)

- প্রকৃতিবাদের মূল প্রবক্তা হলেন এ্যাপিকিউরাস, জন এ্যামোস কমেনিয়াস, জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জোহান হেনরীক পেস্টালৎজি, জনলক, ডারউইন, স্যার এফ ফ্রয়েবল, হার্বাট স্পেন্সার, হুগো দ্যা ভ্রিসের এবং রবীন্দ্রনাথঠাকুর প্রমুখ।
- জ্যাঁ জ্যাক রুশোর শিক্ষা দর্শনের মাধ্যমেই প্রকৃতিবাদের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে বিধায় রুশোকে প্রকৃতিবাদের জনক বলা হয়।
- পরবর্তীতে ডারউইন এবং হুগো দ্যা ভ্রিসের বিবর্তনবাদ(Theory of Evolution) ও ক্রমবিবর্তনবাদ(Theory of Mutation) প্রকৃতিবাদকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করেছে।

প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Naturalism)

প্রকৃতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বিশ্বপ্রকৃতি। মূলত প্রকৃতিবাদের জন্মই হয়েছে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতিবাদ কতগুলো মৌলিক নীতি বা মূলনীতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যাদেরকে প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। যেমন-

- প্রকৃতিবাদের মৌলিক বিষয়বস্তু হলো এ বিশ্ব প্রকৃতি। এর বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব এ প্রকৃতিবাদ স্বীকার করে না। বিশ্ব প্রকৃতি হতে সক্রিয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব।
- প্রকৃতিগত শৃঙ্খলাই হলো চিরন্তন যাতে কৃত্রিম শৃঙ্খলার কোন অবকাশ নেই।
- প্রকৃতি তার নিজস্ব গতি প্রকৃতি অনুযায়ী চলছে এবং চলবে।
- প্রকৃতিগত শিক্ষাই হলো চিরন্তন, সুন্দর ও পবিত্র।
- প্রকৃতি প্রদত্ত বাস্তব মূল্যবোধ চরম সত্যের অন্তর্ভুক্ত।
- শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রচেষ্টায় নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী জ্ঞান আহরণ করবে এখানে কোন কৃত্রিম শৃঙ্খল আরোপ করা যাবে না।
- শিশুর শিক্ষা হবে বয়স স্তর ভিত্তিক বস্তু জাগতিক প্রকৃতি অনুযায়ী
- শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস হবে প্রকৃতি প্রদত্ত।
- শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণে ব্যক্তির সুষম উন্নতি সাধন।

প্রকৃতিবাদের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক

আধুনিক শিক্ষার উন্নয়ন অগ্রগতিতে প্রকৃতিবাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রকৃতিবাদের আলোচনার মৌলিক বিষয়বস্তু হলো প্রকৃতি। প্রকৃতিবাদের দৃষ্টিতে শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হবে প্রকৃতিকেন্দ্রিক। প্রকৃতিকেন্দ্রিক ধারণা হতেই শিশুর শিক্ষা, শিক্ষাক্রম, শিক্ষণসামগ্রী হবে প্রকৃতি নির্ভর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও শিশুর প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। প্রকৃতি কেন্দ্রিক শিক্ষা হলো সত্য, সুন্দর, পবিত্র এবং নান্দনিক বিকাশের উপাদানে ভরপুর। কাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষার সাথে প্রকৃতিবাদের সম্পর্ক শিরোনাম আকারে বর্ণনা করা হলো।

প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

- প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বিকাশ হবে প্রাকৃতিক নিয়মমতো।
- জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হবে সর্বমুখী বিকাশ সাধন।
- শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক।
- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হবে প্রকৃতি কেন্দ্রিক।
- প্রকৃতি প্রদত্ত নিয়ম শৃঙ্খলা অনুধাবন করে শিক্ষার্থীর আত্ম উপলব্ধি হবে।
- কৃত্রিম শৃঙ্খলা শিশুর জীবনে প্রয়োগ করা চলবে না।
- শিক্ষার্থীরা আত্মসক্রিয়তার জ্ঞান অর্জন করে জীবন ধারণের কাজে লাগাবে।

প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষাক্রম

- প্রকৃতিবাদের শিক্ষাক্রম হয় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।
- শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী প্রকৃতি নির্ভর বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়।
- শিক্ষাক্রমে প্রকৃতি নির্ভর অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর গুরুত্ব থাকে।
- শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত বিষয়াবলি প্রকৃতি নির্ভর উপায়ে বিন্যস্ত হয়।
- এতে প্রকৃতির বিন্যাস অনুযায়ী বিষয়বস্তুর স্থির হয়।
- শিক্ষাক্রমে প্রকৃতি নির্ভর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর বেশি গুরুত্ব থাকে।

প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার্থী

- প্রকৃতিবাদের দৃষ্টিতে শিশুর বর্ধন ও বিকাশে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। প্রকৃতিগত ভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের বর্ধন ও বিকাশে সাধিত হবে।
- শিশুর অভিজ্ঞতা হবে প্রকৃতি কেন্দ্রিক স্বতঃস্ফূর্ত।
- শিশুরা প্রকৃতি হতে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে বিকশিত হবে।
- শিশুর বিকাশে প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ দিতে হবে।
- শিক্ষার্থী বাস্তব ও প্রকৃতিগত জ্ঞান অর্জন করে মূল্যবোধের বিকাশ হবে।
- প্রকৃতিবাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে আগত প্রতিটা শিশুই অফুরন্ত সম্ভাবনার অধিকারী । প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে সেসব সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে হবে।

প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষক

- প্রকৃতিবাদের দৃষ্টিতে শিক্ষক হবেন শিখন কাজে সহায়তাকারী।
- শিক্ষার্থীদেরকে কখনই কঠিন অনুশাসনে নিয়ন্ত্রণ করবেন না।
- শিক্ষক শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণ-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবেন।
- শিশুরা প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ করে যথার্থ রীতিতে জ্ঞান অর্জন করছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন শিক্ষক।

- শিক্ষক শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবেন, সুযোগ সৃষ্টি করবেন; আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন মাত্র।

প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

- প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী শিশুরা বয়স, যোগ্যতা, সামর্থ এবং স্বক্ষমতা অনুযায়ী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করবে।
- হাতে কলমে প্রকৃতি নির্ভর শিখনের সুযোগ থাকবে ।
- শিশুরা খেলার ছলে, আনন্দের ছলে, প্রকৃতি নির্ভর শিখন অর্জন করবে।
- সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি নির্ভর প্রকৃতি কেন্দ্রিক পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদান কার্য অব্যাহত থাকবে।
- শিক্ষাদানের পদ্ধতি যেমন হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক তেমনিভাবে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও হবে জানা হতে অজানা, সহজ হতে কঠিনে বিন্যস্ত।

প্রকৃতিবাদ ও মূল্যায়ন

- প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হবে তার নিজস্ব ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী।
- মুখস্থ করার প্রবণতা এতে থাকবে না।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রকৃতি নির্ভর হাতে কলমে জ্ঞান অর্জনের সীমা পরিসীমা থাকবে।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির দক্ষতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রকৃতিবাদে শিক্ষা ও পরিবেশ

- প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিক্ষা হবে তার পরিবেশ কেন্দ্রিক প্রকৃতি নির্ভর।
- প্রকৃতিবাদে শিক্ষার পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীর অনুকূল।
- এতে জ্ঞানের সীমা পরিসীমা থাকবেনা।
- শিক্ষার্থীরা তার পরিবেশগত প্রকৃতি হতে নিজেদের চাহিদামত জ্ঞান চর্চা করবে।

প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ এবং বাস্তববাদের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই প্রয়োগবাদের জন্ম হয়েছে। প্রয়োগবাদ হল অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক একটি দার্শনিক মতবাদ। যা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান করে বিধিবদ্ধ সত্যে উপনীত হতে পারে না তা প্রয়োগবাদ স্বীকার করে না। বিংশশতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে প্রয়োগবাদ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ মতবাদ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের চাহিদাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ এবং বাস্তববাদ হতে দার্শনিক চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে মানবীয় চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রায়োগিক গুরুত্বের উপর ভিত্তিকরে প্রয়োগবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের বিচিত্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রয়োগবাদের কার্যপরিসর বহুবৈচিত্র্যতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। কার্য উপযোগিতাই হল প্রয়োগবাদের মূল দর্শন। যা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ সত্যে উপনীত হতে পারে না তা প্রয়োগবাদ স্বীকার করে না। প্রয়োগবাদের মূলচেতনা হল সর্বজনীন প্রায়োগিক চেতনাকে সমন্বিত করা। সর্বজনীন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না এমন চেতনা প্রয়োগবাদ গ্রহণ করে না। যার বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োগ নেই কিংবা কল্পনাপ্রসূত আধ্যাত্মিকতা প্রয়োগবাদ মেনে নেয় না।

প্রয়োগবাদ এর ধারণা (Concept of Pragmatism)

প্রয়োগবাদের ইংরেজি শব্দ Pragmatism। এটি গ্রিক শব্দ Pragmatics থেকে এসেছে। শাব্দিক অর্থ হল প্রয়োগ যোগ্যতা, উপযোগিতা, কার্যক্ষমতা, গ্রহণ যোগ্যতা ইত্যাদি। অর্থগতভাবে বলা যায় মানবীয় কল্যাণে কোন কিছুর ব্যবহার উপযোগিতা ও কার্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ সত্যে উপনীত হওয়ার দর্শন। অর্থাৎ মানব সভ্যতার ক্রমোন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনকাজের ব্যবহারিক উপযোগীতা বা গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে পূর্ব অভিজ্ঞতার নির্ভর বিধিবদ্ধ সত্যে উপনীত হয়ে যে দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাই প্রয়োগবাদ বা Pragmatism। বলা হয়। জন ডিউই, মিলার, ড. কিলপ্যাট্রি প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকগণ প্রয়োগবাদ দর্শনের প্রবক্তা। এ প্রয়োগবাদের সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বস্তুগত সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং বিকাশের অগ্রযাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে মানুষ হল সত্যের স্রষ্টা। কার্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া যায়। তাই এ মতাদর্শন অনুযায়ী চূড়ান্ত সত্য বলতে কোন কিছু নেই।

দার্শনিকদের অভিমত (Thoughts of Philosopher)

প্রয়োগবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ বিভিন্ন সময়ে যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার কয়েকটি নিচে উপস্থাপন করা হল।

- হিরাক্লিটাস এঁর মতে, “দুনিয়াতে অপরিবর্তনীয় কোন কিছু নেই একমাত্র পরিবর্তনশীলতা এবং প্রয়োগযোগ্যতাই শাশ্বত সত্যের সাক্ষ্য বহন করে”।
- মিলার এঁর মতে,"মানুষ সত্যের যাচাইকারী, এটি পরিবর্তনশীল, সবার উপরে মানুষের কার্যই চিরসত্য"।
- চন্ডীদাস এঁর মতে,"সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই এবং কর্মই ধর্ম।"
- জন ডিউই এঁর মতে,"যা কিছু মানবীয় কল্যাণে প্রয়োজন আসে তার সবটাই সত্য, কার্যে সত্যাসত্যের মূল্যায়ন হয়"।
- উইলিয়াম জেমস এঁর মতে,"পরিবেশের সাথে প্রতি নিয়ত অভিযোজনের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য অর্জিত হয় যা জীবন ধর্মের কাজে আসে"।
- ড. কিলপ্যাট্রি এঁর মতে,"সামাজিক পটভূমিতে প্রতিনিয়ত কার্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে উপযোগিতা নির্ধারণই হল বিধি ও সত্য যা পরিবর্তনশীল"।

পরিশেষে বলা যায় ক্রমাগত প্রয়োগ যোগ্যতার ভিত্তিতে কার্য অভিজ্ঞতার নিরিখে যথার্থ সত্যে উপনীত হওয়ার মতবাদই হল প্রয়োগবাদ বা (Pragmatism)। এখানে চূড়ান্ত সত্য বলতে কোন কিছু নেই। আজ যা সত্য, পরবর্তীতে কার্য অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় তা পরিবর্তিত হয়ে নতুন সত্য বা তাত্ত্বিক রূপ লাভ করে।

প্রয়োগবাদের উৎপত্তি (Origin of Pragmatism)

প্রয়োগবাদের উৎপত্তির ইতিহাস খুব বেশি বছরের পুরনো নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে দর্শন জগতে প্রয়োগবাদের পদচারণা শুরু হয়। ১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকান গণিতজ্ঞ, যুক্তিবিদ ও দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাময়িকীত "How to make our Ideas clear" নামক প্রবন্ধে Pragmatism নামে শব্দটির ব্যবহার করেন। এরপর হতেই প্রয়োগবাদ নামে নতুন ধারণার সূত্রপাত হয় যা মূলত গ্রিক দর্শন হতেই উৎপত্তি লাভ করেছে। প্রয়োগবাদের উৎপত্তিগত জন্মভূমি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখান থেকে ইংল্যান্ড সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ মতবাদের আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গবেষণা কর্ম পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এটি ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

প্রয়োগবাদী দর্শনের প্রবক্তা (Philosophers of Pragmatism)

বিশ্বের অধিকাংশ প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মধ্যে চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স, উইলিয়াম জেমস্, ফ্রান্সিস বেকন, মিলার, জন ডিউই, ড. কিলপ্যাটি প্রমুখ অন্যতম। কারো কারো মতে সক্রেটিস, এ্যারিস্টটল, হিরাক্লিটাস এবং কুইন্টালিন প্রমুখও প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের চিন্তা প্রসূত দর্শন হতেই পরবর্তীতে মার্কিন দার্শনিকগণ প্রয়োগবাদের জন্ম দিয়েছেন।

প্রয়োগবাদের মূলবৈশিষ্ট্য

দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে প্রয়োগবাদ যথেষ্ট স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। প্রয়োগবাদকে বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলো মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় । প্রয়োগবাদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য যেমন-

- প্রয়োগবাদের মূল দর্শন হলো যা কাজে লাগে তাই হলো প্রয়োগসিদ্ধ সত্য।
- প্রয়োগসিদ্ধ সত্যের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।
- কার্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রয়োগসিদ্ধ সত্যের উপযোগিতা যাচাই করা যাবে।
- চূড়ান্ত সত্য বলতে কোন কিছু নেই; অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য পুনঃপরিবর্তনশীল।
- পড়, জ্ঞান অর্জন কর এবং প্রয়োগসিদ্ধ সত্যে উপনীত হও এটিই প্রয়োগবাদের দর্শন।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষা হবে কার্য অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক।
- যে জ্ঞানে সার্বজনীন মানুষের প্রবেশাধিকার নেই সে জ্ঞান প্রয়োগবাদ স্বীকার করে না।
- প্রয়োগ সিদ্ধ অভিজ্ঞতা হতেই কল্যাণকর মূল্যবোধ অর্জিত হয়।
- পৃথিবীতে কোন আদর্শ বা মূল্যবোধই চিরস্থায়ী নয়।
- মানুষ সত্যের স্রষ্টা। কার্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ বর্তমানের বিধিবদ্ধ সত্যে উপনীত হয় যা পরিবর্তনীয়।

আধুনিক শিক্ষার সাথে প্রয়োগবাদের সম্পর্ক

আধুনিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ অব্যর্থ ভূমিকা পালন করেছে। প্রয়োগবাদের মতে শিক্ষা হবে ক্রমবিকাশমান অভিজ্ঞতা ও জীবন কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া। যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। কারণ মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক। শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবেশ হতে জ্ঞান অর্জন করবে এবং তা নিজেদের জীবনে কাজে লাগিয়ে জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করবে। বাস্তব সমস্যা সমাধানের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এটাই হল প্রয়োগবাদের আসল এবং মৌলিক উদ্দেশ্য। শিক্ষার লক্ষ্য হবে জীবনের সার্থক অভিযোজন যা বাস্তব কেন্দ্রিক। আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের সাথে প্রয়োগবাদ কিভাবে কাজ করে তা আলোচনা করা হলো।

প্রয়োগবাদ এবং শিক্ষার্থী

- প্রয়োগবাদের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থী হল তারাই যারা শিখবে এবং জ্ঞান অর্জন করে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবে।
- প্রয়োগবাদের দর্শন হল শিক্ষার্থীরাই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থী হবে স্বাধীন তাদের জানার চাহিদা অফুরন্ত।
- শিক্ষার্থীর চাহিদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাসূচি প্রবর্তিত হবে যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে জ্ঞান অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতিত্ব করে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের সহযোগিতা করবেন।

প্রয়োগবাদ ও শিক্ষক

- শিক্ষক হবেন বাস্তববাদী, এবং প্রগতিশীল।
- শিক্ষকের প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ হবে শ্রদ্ধার এবং অনুসরণযোগ্য।
- প্রয়োগবাদ শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়।
- শিক্ষক হয়ে থাকেন সমাজ সংস্কারক, যিনি তার বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।
- শিক্ষক হয়ে থাকেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন যিনি বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোজগতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করেন।

- শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জন করে এ তত্ত্বের আলোকে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারী করণে শিক্ষক হবেন দিশারী কিংবা পথ প্রদর্শক।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেন।

প্রয়োগবাদ ও শিক্ষাক্রম

- প্রয়োগবাদের দৃষ্টিতে শিক্ষাক্রম হবে নমনীয়।
- আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষার্থীর চাহিদার আলোকে শিক্ষাক্রম তৈরি হবে।
- শিক্ষাক্রম এর উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কেন্দ্রিক।
- যা শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে কাজে লাগেনা তার উপস্থিতি শিক্ষাক্রমে থাকবে না।
- শিক্ষাক্রম হবে বিভিন্ন বিষয়ের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বিত একক।
- শিক্ষাক্রম হবে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গরূপ।
- শিক্ষাক্রম হবে পরিবর্তনশীল।
- শিক্ষাক্রম হবে পরিবরর্তনশীল বিশ্বে অভিযোজনে সক্ষম।
- শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং বৃত্তিমূলক বিষয়ের গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।
- শিক্ষাক্রমে ধর্মীয়, নান্দনিক কিংবা কল্পনাপ্রসূত বিষয়ের গুরুত্ব হবে কম থাকে।

প্রয়োগবাদ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

প্রয়োগবাদে শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা আধুনিয় শিক্ষার প্রসারে বিশেষভাবে কার্যকরী। যেমন-

- শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে কর্মকেন্দ্রিক।
- এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি ও আবিষ্কার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।
- শিক্ষার্থীর কার্য উদ্দীপনা তথা কর্মপন্থা জাগ্রত করার উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়।
- প্রয়োগবাদ শিক্ষার্থীর শিক্ষাদানের পরিবেশ হবে মনোরম ও চিত্তাকর্ষণীয় যেখানে আর স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ঞান অর্জন করবে।
- প্রয়োগবাদের দৃষ্টিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, যেখানে শিক্ষক সহযোগী।
- শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বা হাতে কলমে শিক্ষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে থাকে যাতে শিক্ষার্থী একজন সুদক্ষ জনশক্তি হিসেবে তৈরী দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

ভাববাদ, প্রয়োগবাদ এবং প্রকৃতিবাদের তুলনা (Comparison of Idealism, Pragmatism and Naturalism)

- দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে ভাববাদ, প্রয়োগবাদ এবং প্রকৃতিবাদ মতবাদগুলো গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রে এ মতবাদগুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এ মতবাদগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে আবার বৈসাদৃশ্যও কম নয়। নিম্নে মতবাদগুলোর তুলনামূলক আলোচনা ছকের মধ্যে উল্লেখ করা হলো-

ভাববাদ (Idealism)	প্রয়োগবাদ (Pragmatism)	প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

ভাববাদের মতে ভাৰ চিরন্তন, অবিনশ্বর অনন্ত অসীম চিরসুত্য।	যা কাজে লাগে তাহাই হলো প্রয়োগসিদ্ধ সত্য; এর বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।	প্রকৃতিবাদের মূলকথা হচ্ছে বিশ্ব প্রকৃতিই আমাদের কাছে বড় সত্য।
শাশ্বত, সুন্দর ও পবিত্র ভাবের মধ্য দিয়েই সত্যে উপনীত হওয়া যায়।	সত্য সুন্দর যা কর্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রয়োগসিদ্ধ সত্যে উপনীত হওয়া যায়।	প্রকৃতিগত জ্ঞানই জীবনের উপলব্ধি জন্মায়।
শিক্ষার লক্ষ্য আত্মোপলব্ধিকরণ।	শিক্ষার লক্ষ্য মূল্যবোধের জাগরণ।	শিক্ষার লক্ষ্য হলো আত্মপ্রকাশ ও আত্মসংরক্ষণ।
শিক্ষাক্রম হবে শিক্ষার্থীর নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং নান্দনিক জ্ঞান সম্পৃক্ত।	শিক্ষাক্রম হবে সমাজ কল্যাণমূলক সমন্বিত উদ্দেশ্যমুখী।	শিক্ষাক্রমে বস্তুমুখী জ্ঞানের আহরণের সুযোগ থাকবে।
শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে আলোচনা ভিত্তিক শিক্ষক কেন্দ্রিক।	শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক।	শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক।
এটি প্রাচীনতম দার্শনিক মতবাদ।	এটি আধুনিক দার্শনিক মতবাদ।	এটি আধুনিক দার্শনিক মতবাদ।
ভাববাদ শিক্ষাকে সমৃদ্ধকরণে নিবেদিত।	প্রয়োগবাদ ও শিক্ষাকে সমৃদ্ধকরণে নিবেদিত।	এতে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় জগৎ নিয়ে আলোচনা হবে।
এতে পরমাত্মার কথা স্বীকৃত।	এটি পরমাত্মার উপলব্ধি স্বীকার করে না	এতে পরমাত্মার উপলব্ধি সুস্পষ্ট না

পরিশেষে বলা যায় যে বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একক কোন দার্শনিক মতবাদের উপর নির্ভরশীল নয় বরং সবগুলো মতবাদই কোন না কোনভাবে শিক্ষাকে সহায়তা করছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কোন মতবাদে বেশি প্রভাবিত তা এককথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখসহ বেশ কয়েকটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তাদের জাতীয় ঐক্য, সংহতি, আদর্শ এক এবং অভিন্ন কিন্তু ধর্মীয় দর্শন ভিন্ন। মোটের উপর এ দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। নৈরাশ্যবাদ কিংবা নাস্তিকতাবাদ এ দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মানুষ ছাড়া কেউ কমিউনিজমের আদর্শে বিশ্বাস করে না। এদেশের মানুষের মাঝে ধর্মীয় চেতনা প্রবল।

এমতাবস্থায় বাস্তববাদ, প্রয়োগবাদ, প্রকৃতিবাদ কিংবা জড়বাদের একক আদর্শ শিক্ষায় প্রতিফলন হউক এটা কেউ চায় না। কিন্তু এদেশের সকল মানুষ প্রগতিশীল বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার পক্ষপাতি, যাতে ধর্মীয়, সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে। মানুষ জ্ঞান অর্জন করে যান্ত্রিক হউক কিংবা পারস্পরিক মমত্ববোধ, ধর্মীয় দর্শন পরিত্যাগ করুক এটা কেউ প্রত্যাশা করে না। পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অভিযোজনে সক্ষম হয়ে চলতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ এবং প্রয়োগবাদের যে অংশটুকু এদেশের মানুষের ভাবাবেগের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযোজন করা যেতে পারে।

শিখন তত্ত্ব (Learning Theories)

পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে দার্শনিক মতবাদ ও শিখনতাত্ত্বিক মতবাদগুলো এক জিনিস নয়। শিখন তত্ত্বগুলো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। শিখন তত্ত্বের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হল শিখন । শিখন তত্ত্বের আলোচনার পূর্বে শিখন কী বা শিখনের পরিচয় জেনা আসা দরকার।

শিখন (Learning) কী?

শিখন হল অত্যন্ত জটিল এবং গতিশীল প্রক্রিয়া। শিখন জীবের সহজাত প্রক্রিয়া বিশেষ। সাধারণত ভাষায় বলা যায় শিখন হল আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। মানুষের সব ধরণের কার্যকলাপের মূলে রয়েছে শিখন। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে জীবের আচরণের কঙ্ক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনকেই শিখন বা Learning বলে। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি বা জীবের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সার্বিক পরিবেশে খাপ খেয়ে চলতে পারে।

মানুষের সব ধরনের কার্যকলাপের মূলে রয়েছে শিখন। শিখনকে আচরণের যে কোন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা অনুশীলন বা অভ্যাসের ফলে সংঘটিত হয় (Morgan, King, Weiszand, & Schopler, ১৯৮৬; পৃ: ১৭০)। মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের এ শিখনকে নানা ভাবে সজ্ঞায়িত করেছেন।

মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত (Concepts of Psychologists)

শিখন সম্পর্কে কতিপয় স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত নিচে উল্লেখ করা হল-

- বার্নাড বলেন, "শিখন হল ব্যক্তির নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন যা তার নিজের পরবর্তী ক্রিয়ার উপর ছাপ রাখে"।
- উডওয়ার্থ এঁর মতে, "শিখন হল জীবের আচরণের সংশোধন"।
- ম্যাগডুগাল বলেন, "শিখন হল অভ্যাসের ফলে আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন যা কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উপনীত হয়"।
- ই.এল.থর্নডাইক বলেন, "সঠিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সঠিক সংযোজনই হল শিখন"।-
- মর্গান ও কিং মনোবিজ্ঞানীদ্বয়ের মতে, "জীবের আচরণের যেকোন স্থায়ী এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনই হল শিখন"।

শিখন তত্ত্ব বা মতবাদ (Learning Theories)

শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন। শিখন সম্পর্কিত এ সকল তত্ত্ব কতকগুলো ধারণা ও নীতির সমন্বয়ে গঠিত। শিখন সম্পর্কিত এসব তত্ত্বের মাধ্যমে শিখন কীভাবে সংগঠিত হয় বা মানুষকীভাবে শিখে তা অনুধাবন করা যায়। এ তত্ত্বগুলো থেকে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা লাভ করা সম্ভব। শিখন তত্ত্বের আলোচনার মূল বিষয় হলো মানুষ বা প্রাণী একইভাবে শেখে না। শিখনের তত্ত্বগুলো মানুষ বা প্রাণীর শিখন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এসব ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে শিখনের তত্ত্বগুলোকে চারটি প্রেক্ষিতে ভাগ করা যায়।

- আচরণবাদী প্রেক্ষিত (Behavioristic Perspective)
- জ্ঞানবাদী প্রেক্ষিত (Cognitivist Perspective)
- মানবতাবাদী প্রেক্ষিত (Humanistic Perspective)
- সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত (Socialistic Perspective)

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিখনের উপযোগীতা, প্রকৃতি ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার গভীরতা বিবেচনা করে এখানে শিখন মতবাদগুলোর মধ্যে শুধু সর্বাধিক আলোচিত ও গ্রহণযোগ্য আচরণবাদ ও জ্ঞানবাদ মতবাদ আলোচনা করা হলো:

শিখন (Learning) কী?

শিখন হল অত্যন্ত জটিল এবং গতিশীল প্রক্রিয়া। শিখন জীবের সহজাত প্রক্রিয়া বিশেষ। সাধারণত ভাষায় বলা যায় শিখন হল আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। মানুষের সব ধরণের কার্যকলাপের মূলে রয়েছে শিখন। অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে জীবের আচরণের কঙ্ক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনকেই শিখন বা Learning বলে। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি বা জীবের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সার্বিক পরিবেশে খাপ খেয়ে চলতে পারে।

মানুষের সব ধরনের কার্যকলাপের মূলে রয়েছে শিখন। শিখনকে আচরণের যে কোন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা অনুশীলন বা অভ্যাসের ফলে সংঘটিত হয় (Morgan, King, Weiszand, & Schopler, ১৯৮৬; পৃ: ১৭০)। মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের এ শিখনকে নানা ভাবে সজ্ঞায়িত করেছেন।

মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত (Concepts of Psychologists)

শিখন সম্পর্কে কতিপয় স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত নিচে উল্লেখ করা হল

- বার্নাড বলেন, *"শিখন হল ব্যক্তির নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন যা তার নিজের পরবর্তী ক্রিয়ার উপর ছাপ রাখে"।*
- উডওয়ার্থ এঁর মতে, *"শিখন হল জীবের আচরণের সংশোধন"*।
- ম্যাগডুগাল বলেন, *"শিখন হল অভ্যাসের ফলে আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন যা কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উপনীত হয়"।*
- ই.এল.থর্নডাইক বলেন, *"সঠিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সঠিক সংযোজনই হল শিখন"*।
- মর্গান ও কিং মনোবিজ্ঞানীদ্বয়ের মতে, *"জীবের আচরণের যেকোন স্থায়ী এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনই হল শিখন"*।

শিখন তত্ত্ব বা মতবাদ (Learning Theories)

শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন। শিখন সম্পর্কিত এ সকল তত্ত্ব কতকগুলো ধারণা ও নীতির সমন্বয়ে গঠিত। শিখন সম্পর্কিত এসব তত্ত্বের মাধ্যমে শিখন কীভাবে সংগঠিত হয় বা মানুষকীভাবে শিখে তা অনুধাবন করা যায়। এ তত্ত্বগুলো থেকে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা লাভ করা সম্ভব। শিখন তত্ত্বের আলোচনার মূল বিষয় হলো মানুষ বা প্রাণী একইভাবেশেখে না। শিখনের তত্ত্বগুলো মানুষ বা প্রাণীর শিখন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এসব ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে শিখনের তত্ত্বগুলোকে চারটি প্রেক্ষিতে ভাগ করা যায়।

- আচরণবাদী প্রেক্ষিত (Behavioristic Perspective)
- জ্ঞানবাদী প্রেক্ষিত (Cognitivist Perspective)
- মানবতাবাদী প্রেক্ষিত (Humanistic Perspective)
- সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত (Socialistic Perspective)

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিখনের উপযোগীতা, প্রকৃতি ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার গভীরতা বিবেচনা করে এখানে শিখন মতবাদগুলোর মধ্যে শুধু সর্বাধিক আলোচিত ও গ্রহণযোগ্য আচরণবাদ ও জ্ঞানবাদ মতবাদ আলোচনা করা হলো:

আচরণবাদ (Behaviorism)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রত্যক্ষবাদ, বিবর্তনবাদ এবং ক্রিয়াবাদের প্রভাবে মনোবিজ্ঞানের কালজয়ী শিখন তত্ত্ব আচরণবাদ এর উদ্ভব হয়। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী জন ব্রোডার্স ওয়াটসন আচরণবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা John Brodus Watson ১৯১৩ সালে Behaviour নামক গ্রন্থ রচনা করে আচরণবাদকে উপস্থাপন করেন যা বিশ্বব্যাপী পরবর্তীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই John Brodus Watson কে আচরণবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

আচরণবাদীদের মতে শিখন হচ্ছে আচরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবর্তন (Mergel,1998)। আচরণবাদীরা বিশ্বাস করেন, শিখন সংঘটনের মূল উপাদান হলো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া এবং এদের সম্মিলিত ফল। অন্যভাবে বলা যায়, শিখন হলো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ। প্রতিক্রিয়া বলতে যেকোন আচরণকে বোঝাতে পারে, উদ্দীপক বলতে যে কোন সংবেদনকে বোঝাতে পারে। তাঁদের মতে, প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়া একটি উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। যেমন কোন একটি শিশুকে চাঁদ দেখিয়ে বলা হলো 'চাঁদ'। কয়েকবার ঐ চাঁদ দেখানোর সাথে সাথে 'চাঁদ' শব্দটি উচ্চারণ করা হলে, পরে 'চাঁদ' দেখিয়ে কোন শব্দ উচ্চারণ না করলেও শিশু বলবে

'চাঁদ'। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আচরণ ঘটার জন্য শিক্ষার্থীর নিকট উদ্দীপক উপস্থাপন করে উদ্দীপনা (stimulus) লাভের সুযোগ দেয়া হয়। এর আলোকে শিক্ষার্থী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করে যার ফলে শিখন সংগঠিত হয় (response) এবং শিশু চাঁদ শব্দটি উচ্চারণ করতে শিখে। এখানে চাঁদ উদ্দীপক শিশুর মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে ফলে শিশু সাড়া দেয়া এবং এর ফলে পরবর্তী কালে আকাশে চাঁদ দেখলে বা চাঁদের মতো গোল কিছু দেখলে শিশু চাঁদ বলতে পারাই হলো শিখন। আচরণবাদে শিখন প্রক্রিয়ার এই উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক এই চিত্রের মাধ্যমে বুঝতে পারি। যেমন:

চিত্র: শিখন প্রক্রিয়ার উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক

শিখনের মাধ্যমে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয়, সেগুলোকে আচরণবাদীরা বিভিন্নভাবে অভিহিত করেছেন। যেমন,

- কেউ বলেন অভ্যাস (Habits),
- কেউ বলেন উদ্দীপকপ্রতিক্রিয়ার বন্ধন (SR Bond),
- আবার কেউ বলেন সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া।

আচরণবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী আচরণ সংঘটনের জন্য বাহ্যিক পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা শর্ত। আর শেখানোর লক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট উদ্দীপক (পরিবেশ) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ বের করে আনা । আচরণবাদীরা মনে করেন যে, শিখনের সাহায্যে আমরা আসলে কতগুলো অভ্যাস আয়ত্ত করি। নতুন কোন বিষয় শিখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রথমে অতীতের যেসব অভ্যাস বর্তমান শিখন পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেসব অভ্যাসের সাহায্যে বিষয়টি শিখার চেষ্টা করে। পূর্বের অভ্যাসের সাথে মিল রেখে বিষয়টি আয়ত্তকরতে না পারলে ভুল ও চেষ্টা (trial and error) বা বারবার চর্চার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা করতে শিখে। শেখার বিষয়বস্তু এবং প্রক্রিয়ার বারবার চর্চা এবং শেখার জন্য পুরস্কার বা বলবর্ধক (reinforcement) প্রয়োগ আচরণবাদীদের শিখন তত্ত্বেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আচরণবাদীদের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন থর্নডাইক, ওয়াটসন, ওয়াটসন ও রায়নার, হাল, স্কিনার এবং প্যাভেলভ। প্রেত্যেকেই নিজ নিজ আচরণবাদী তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তবে আমরা এখানে থর্নডাইক, প্যাভেলভ এবং স্কিনারের শিখনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। সেক্ষেত্রে আচরণবাদী তত্তেগুলো হলো

- সংযোগবাদ (Connectionism) থর্ন্ডাইক
- চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ (Classical Conditioning) আইভান প্যাভলভ
- করণ শিখন (Operant Conditioning) স্কিনার

সংযোগবাদ (Connectionism)

Thorndike (১৮৭৪-১৯৪৯) তাঁর বিখ্যাত 'Animal Intelligence' গ্রন্থে (১৯৯৮) তাঁর সংযোগবাদ মতবাদটি প্রকাশ করেন। থর্নডাইকের মতে শিখন হলো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ। তাঁর মতে মানুষ বা প্রাণী কোন বিষয় বার বার চেষ্টা করে ভুল ও ত্রুটির মাধ্যমে কোন কিছু শিখে। এই শিখন পদ্ধতিটিকে তিনি বলেছেন প্রচেষ্টা ও ভুল

পদ্ধতি (Trial-and-Error Method) । প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে প্রাণি কীভাবে শিখে থর্নডাইক তাঁর পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

থর্নডাইক পরীক্ষণের শুরুতে একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে রেখে একটুকরা মাছ খাঁচার বাইরে এমনভাবে রাখেন যাতে বিড়ালটা মাছটি দেখতে পায়। মাছটি খাঁচা থেকে এমন দূরত্বে রাখা ছিল যে, বিড়ালটি খাঁচা খুলে বাইরে আসলেই মাছটি পায়। খাঁচার দরজা একটি ছিটকিনি দিয়ে এমনভাবে আটকানো ছিল যে অল্প চাপ লাগলেই ছিটকিনিটা খুলে যাবে। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি প্রথমে খাঁচার ভিতর থেকে মাছটা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। বিড়ালটি খাঁচার মধ্যে এদিক সেদিক ছুটোছুটি, কখনো আঁচড়ানো, আবার কখনো খাঁচার দেয়াল কামড়াতে লাগলো। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ও এলোমেলো ভাবে চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ছিটকিনির উপর বিড়ালটির পায়ের চাপ লেগে দরজাটি খুলে যায় । ফলে বিড়ালটি বাইরে এসে খাবারটি খাওয়ার সুযোগ পায়। বিড়ালটিকে আবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাঁচার মধ্যে রাখা হলে বিড়ালটি একইভাবে এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে খাবারের কাছে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। এইভাবে বিড়ালটি প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিন কম ভুল করলো ও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে খাঁচা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারলো। তৃতীয় দিনে তার প্রচেষ্টার সংখ্যা আরও কমে এলো এবং আগের দিনের তুলনায় সময় আরও কম লাগল। এইভাবে পরীক্ষণ কাজটা চালিয়ে দেখা গেল যে, এক সময় বিড়ালটির ভুলের সংখ্যা কমে আসছে এবং সময় কম লাগছে। শেষদিকে দেখা গেল বিড়ালটি আর ভুল প্রচেষ্টা করছে না। যখনই বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপক (ছিটকিনির উপর চাপ) ও প্রতিক্রিয়ার (খাবার খাওয়া) মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হল, তখনই তার ছিটকিনি খোলার শিখন সমাপ্ত হলো।

থর্নডাইকের প্রাণী সম্পর্কিত গবেষণাগুলো মানুষের শিখন সম্পর্কেও তার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতে মানুষ ও প্রাণীর শিখন মূলত একই প্রক্রিয়ায় ঘটে। থর্নডাইক তিনটি মূখ্য নীতি বা সূত্রের মাধ্যমে শিখন কীভাবে হয়- তা ব্যাখ্যা করেন। সূত্র তিনটি হচ্ছে-

(ক) প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)
(খ) ফলাফলের সূত্র (Law of Effect)
(গ) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)

(ক) প্রস্তুতির সূত্র

থর্নডাইক বলেন, শিখনের প্রথম শর্ত হলো মানসিক প্রস্তুতি। শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি শেখার ইচ্ছা, তাড়না (Drive) বা আগ্রহ না থাকে তাহলে সে কোন কিছু শেখার জন্য ব্যস্ত হবে না। ফলে তার শিখন হবে না। শিখনের জন্য উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াও আরো একধরনের প্রস্তুতি সম্পর্কে শিক্ষকের জানা প্রয়োজন। সেটি হলো পাঠ্যাভাসের প্রস্তুতি বা Reading readiness। পাঠাভ্যাসের প্রস্তুতি হলো পড়াশুনা শুরুর পূর্বে শিশুর পরিপক্বতা বা পরিণমন (maturity) উপযুক্ত পর্যায়ে থাকতে হবে। প্রস্তুতি বলতে থর্নডাইক সরাসরি পরিপক্বতার কথা বলেননি। প্রস্তুতি বলতে তিনি প্রস্তুতিমূলক অভিযোজন-কে (Preparatory adjustment) বুঝিয়েছেন।

(খ) ফলাফলের সূত্র

উদ্দীপক ও প্রতিত্রিনয়ার মধ্যে সংযোগ (S-R bond) দৃঢ়তর ও স্থায়ী হয় যদি প্রাণীর নিকট তা সন্তোষজনক হয়। বিপরীতে সংযোগের ফল যদি বিরক্তিকর হয় সেক্ষেত্রে সংযোগ দুর্বল হবে। অর্থাৎ প্রাণী সে কাজটি বারবার করে যেটি করে তৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সূত্রটির অনেক গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষক পুরস্কার বা সাফল্যের অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। আবার শাস্তি বা ব্যর্থতার পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণকে অপসারণ করতে পারেন।

(গ) অনুশীলনের সূত্র

অনুশীলন নীতির দ্বারা থর্নডাইক সংযোগ বা অনুষঙ্গ (association) কীভাবে শক্তিশালী বা দুর্বল হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। অনুশীলন বেশি হলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ বেশি শক্তিশালী হবে। অন্যদিকে অনুশীলনের অভাবে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দুর্বল হতে থাকে। অনুশীলন নীতি অনুযায়ী শিখন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলে ক) প্রতিক্রিয়াটি (কাঙ্ক্ষিত শিখন) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবঃ খ) প্রতিক্রিয়াটি হওয়ার সম্ভাবনা দীর্ঘদিন পরও বর্তমান থাকে বা স্থায়ী হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সংযোগবাদ তত্ত্বের গুরুত্ব

শিক্ষাক্ষেত্রে থর্নডাইকের শিখনের সূত্রসমূহের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ সূত্রগুলো কীভাবে কাজ করে নিচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১. শেখার জন্য শিক্ষার্থী মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকলেই শিখন সম্ভব। শিক্ষার্থী মানসিক বা শারীরিকভাবে প্রস্তুত না থাকলেশিখন ব্যর্থ হবে। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিবেন না। ভার দৈহিক পরিণমনের (Maturity) ওপর নির্ভর করেই তাকে শেখাবেন।

২. ফললাভের সূত্রে বলা হয়েছে যে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ তৃপ্তিকর বা আনন্দদায়ক হলে প্রাণী তা শেখে এবং শিখন স্থায়ী হয়। আর অতৃপ্তিকর হলে প্রাণী ভুলে যায়। শিখন স্থায়ী করতে হলে, শিক্ষক এমনভাবে পাঠদান করবেন যাতে পাঠ্য বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের নিকট আনন্দায়ক এবং বোধগম্য হয়। শিক্ষক পাঠদানের সময় সহজ হতে কঠিন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবেন। সহজ পাঠ দিয়ে আরম্ভ করলে শিক্ষার্থীরা সফলতার মধ্যে দিয়ে শিখবে। শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের প্রশংসাসূচক শব্দ (যেমন- বাহবা, বেশ, চমৎকার, ভাল ইত্যাদি) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়কভাবে কোন বিষয় শেখাতে পারেন। শিক্ষক উৎসাহ দান, স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি মুখভঙ্গি দিয়েও শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে তুলতে পারেন। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, প্রধ্যমেই শিক্ষার্থীরা কঠিন সমস্যার সমাধান করছে ব্যর্থ হলে তাদের মাঝে হতাশা আসবে এবং শিখন বিষয়টি ভীতিকর হয়ে উঠবে।

৩. থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রে বলা হয়েছে যে, শিখনের একটি শর্ত হচ্ছে বার বার চর্চা বা অনুশীলন করা। চর্চা না করলে শিক্ষার্থী শেখা জিনিস ভুলে যাবে। অবিতা, বানান, নামতাইত্যাদি শেখানোর সময় শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা বিষয়টিভালোভাবে শিখতে পারে।

চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ (Classical Conditioning)

চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের প্রবর্তক হলেন স্বনামধন্য রাশিয়ান শরীর তত্ত্ববিদ Ivan P. Pavlov (১৮৪৯-১৯৩৬)। সাপেক্ষীকরণ বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Conditioning) বলতে বুঝায় একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপককে (Neutral stimulus) স্বাভাবিক উদ্দীপকের (Unconditioned stimulus) সাথে বার বার সংযুক্ত করলে এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকটি নিজেই সাপেক্ষ উদ্দীপকের (Conditioned stmulus) মত কাজ করে এবং সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াটি করতে সক্ষম হয়। সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে প্রাণী কীভাবে শেখে তা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণটি করেছেন তা এখানে আলোচনা করা হলো-

প্যাভলভের পরীক্ষণ

প্যাভলভ তার পরীক্ষণটি একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের ওপর করেছিলেন। তিনি পরিক্ষণটি করার জন্য পরীক্ষাগারটিকে এমনভাবে সজ্জিত করেন যাতে যান্ত্রিক উপায়ে মাংস কুকুরের মুখে পরিবেশন করা সম্ভব হয় এবং পরীক্ষক একটি কক্ষ থেকে সবকিছুই দেখতে পান। তবে কুকুরটি পরীক্ষককে দেখতে না পায়। পরীক্ষণের শুরুতে মেট্রোনোম নামক এক ধরনের পরিমাপক ঘড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়। কুকুরটিকে প্রথমে ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনানো হয়। দেখা গেল টিক টিক

শব্দ শুনে কুকুরটি প্রথমে কান খাড়া করে, তবে লালাক্ষরণ করে না। এক্ষেত্রে টিক টিক শব্দটি নিরপেক্ষ উদ্দীপক (Neutral stimulus)। কয়েক সেকেন্ড পরে কুকুরটিকে মাংস দেয়া হলো। দেখা গেল, এখন লালা নির্গত হচ্ছে এবং ঐ লালা পরিমাপক বোতলটিতে গিয়ে জমা হচ্ছে।

এখানে ক্ষুধার্ত কুকুরটির কাছে মাংস ছিল স্বাভাবিক উদ্দীপক (Unconditioned stimulus) এবং লালাক্ষরণ ছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Unconditioned response)। পরীক্ষক এরপর প্রথমে টিক টিক শব্দ শোনানোর পর পরই কুকুরটিকে মাংস দেওয়া শুরু করলেন। বেশ কয়েকবার টিক টিক শব্দের পর পরই কুকুরটিকে মাংস দেওয়ার এক পর্যায়ে দেখা গেল মাংস না দিলেও শুধুমাত্র টিক টিক শব্দ শুনা মাত্রই কুকুরটির মুখ থেকে লালা নির্গত হচ্ছে। এখানে টিক টিক শব্দটিই হচ্ছে সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned stimulus) এবং এই টিক টিক শব্দটিকে মাংসের সাথে উপস্থাপন করে সাপেক্ষীকরণ (Conditioned) করা হয়েছে। সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়াটিকে নিচের এ ছকটির মাধ্যমে বুঝতে পারি। যেমন-

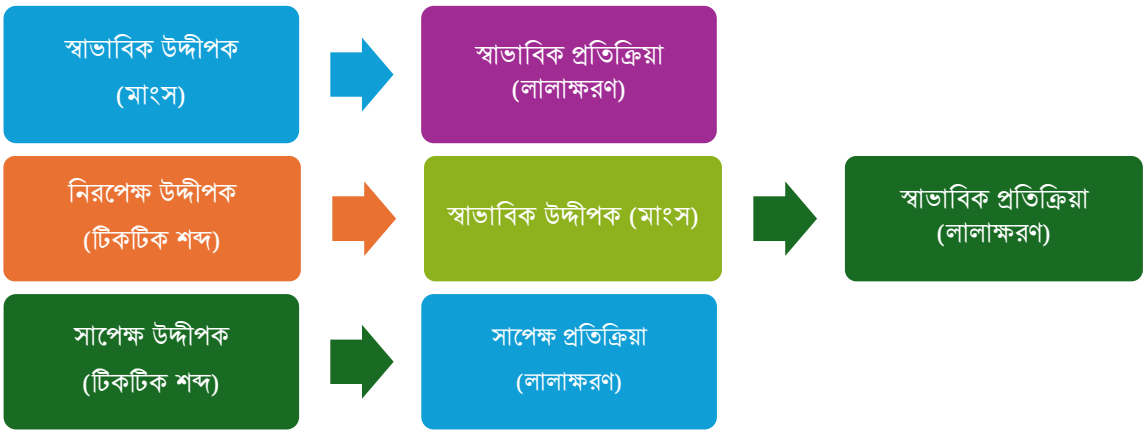

চিত্র: সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়া ছক

শিক্ষাক্ষেত্রে চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্ষেত্রে চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ তত্ত্বের গুরুত্ব অনেক। কারণ এই তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষালব্ধ বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস, শিক্ষা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি সর্বকিছুই হলো এক ধরনের অবিচ্ছিন্ন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া। এরূপ কিছু গুরুত্ব হলো -

- শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা সাপেক্ষীকরণের বেশ অবদান রয়েছে। সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই শিশু বিভিন্ন বস্তুর নামগুলো শিখে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু জীবনের গুরুতে কেবল কতগুলো অর্থহীন শব্দ করতে পারে। যখন তার ভাষার বিকাশ হতে থাকে তখন সে দেখে কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে সাধারণত সে যা চায় তাই পায়। উদাহরণস্বরূপ, গ্লাসের সাথে পানি অথবা ফিডারের সাথে দুধকে সংযোগ করার মাধ্যমে তার চাহিদা বুঝানোর চেষ্টা করে। এভাবেই ধীরে ধীরে সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু দেখলে বা বোঝাতে গেলে ঐ শব্দটি উচ্ছারণ করে।
- শিশুদের অনেক অভ্যাস, যেমন- সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা কিংবা বিছানায় শুতে যাওয়া ইত্যাদি সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই গড়ে তোলা যায়।
- আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি মনোভাবগুলো সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের আচরণ বা তার শেখানোর পদ্ধতি যদি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর বা ভীতিকর হয়, তবে ঐ পদ্ধতি বা শিক্ষকের প্রতি যে ভয় তা পাঠ্য বিষয়টিতে সঞ্চারিত হয়।

- শুধু ভাল অভ্যাস গঠনে নয় খারাপ বা নেতিবাচক অভ্যাস বর্জনেও প্যাভলভের সাপেক্ষীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

করণ শিখন (Operant Conditioning)

Burrhus Frederic Skinner (১৯০৪) করণ শিখনের প্রবর্তক। স্কিনারের মতে, প্রাণী সেই আচরণই শেখে যা তার কোন প্রয়োজন বা অভাব মেটায়। যেমন- শিশু ক্ষুধা পেলেই কাঁদে। কান্নাকে সে খাবার পাওয়ার কৌশল (Instrument) হিসেবে ব্যবহার করে। তাই বলা যায়, যে আচরণ মানুষ বা প্রাণীর জীবনে কোন প্রেষণা বা অভাব মেটায় সে আচরণ শেখাকেই বলা হয় করণ শিষন। করণ আচরণ শেখার প্রক্রিয়ায় কোন একটি নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে আচরণ সংঘটিত হয় এবং সংঘটিত আচরণের জন্য বলবর্ধক দিয়ে সে আচরণকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় সাপেক্ষীকরণ (Conditioning)। করণ সাপেক্ষীকরণে কোন নির্দিষ্ট আচরণের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার জন্য আগে থেকে কোনো উদ্দীপক ব্যবহার করা হয় না, বরং প্রতিক্রিয়া বা আচরণ সংঘটনের পর প্রাণী পুরস্কার পায়, যাকে বলা হয় (Reinforcement)। প্রাণী কীভাবে শেখে তার ওপর স্কিনার যে পরীক্ষণ করেছেন তা এখানে আলোচনা করা হলো।

স্কিনারের পরীক্ষণ

বি. এফ. স্কিনার একটি ক্ষুধার্ত ইদুর নিয়ে তাঁর পরীক্ষণটি করেন। পরীক্ষণটি করার জন্য তিনি একটি বাক্স বা খাঁচা ব্যবহার করেন যাকে বলা হয় স্কিনার বক্স (Skinner Box)। এই বক্সের ভিতরে এক পাশে একটি চাবি আছে। চাবিটিতে চাপ দিলে বক্সের ভিতর নির্দিষ্ট একটা পাত্রে খাদ্য যান্ত্রিক উপায়ে উপস্থিত হয়। খাবার খোঁজার জন্য ক্ষুধার্ত ইঁদুরটি খাঁচার ভেতর ছুটোছুটি করার সময় হঠাৎ একবার চাবিতে চাপ পড়ে যায়। চাবিতে চাপ পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে খাঁচার ভেতর খাবার চলে আসে এবং ইঁদুরটি খাবার খায়। তবে ইঁদুরটি প্রথমে খেয়ালই করেনি যে, চাবিতে চাপ দেওয়াতে খাবার এসেছে। এরপর ইঁদুর খাবারের আশায় আবার ছুটোছুটি করতে লাগলো। এভাবে দ্বিতীয়বার হঠাৎ করে চাবিতে পড়ার সাথে সাথে আবার খাবার আসলো। তৃতীয়বারও ইঁদুরটি দৈবক্রমে চাবিতে চাপ দিল এবং খাবার আসলে ইঁদুরটি খেল। চতুর্থবার চাবিতে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইঁদুরটি খাবার খেতে খাবারের চেম্বারে ঢুকলো। কারণ ইঁদুরটি ইতোমধ্যে বুঝে গেল যে চাবিতে চাপ দেওয়ার সাথে খাবার পাওয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে। এরপর ইঁদুরটি খুব ঘন ঘন চাবিতে চাপ দিতে লাগলো। এখানে ইঁদুরটি চাবি চাপ দেওয়া ও খাবার পাওয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন করে খাবার খেতে শিখলো।

বলবর্ধক (Reinforcement) কী?

কোন উদ্দীপক যদি একটি প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বা হার বৃদ্ধি করে তবে তাকে বলা হয় বলবর্ধক। অর্থাৎ প্রাণীপুরস্কারের লোভে সেটি বারবার করতে চায়। বলবর্ধন দু'ধরনের, যেমন-

- ধনাত্মক বলবর্ধন (Positive Reinforcement) এবং
- ঋণাত্মক বলবর্ধন (Negative Reinforcement) |

ধনাত্মক বলবর্ধন হলো এমন একটি শর্ত, যার উপস্থিতিতে প্রাণীর মধ্যে নির্দিষ্ট আচরণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, ঋণাত্মক বলবর্ধনপ্রাণীকে কোনো কাজ পুনরায় করতে নিরুৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, স্কিনারের পরীক্ষণে ইঁদুরটি চাবিতে চাপ (প্রতিক্রিয়া) দিয়ে খাবার (পুরস্কার বা ধনাত্মক বলবর্ধক) পেত বলেই সেঐ প্রতিক্রিয়াটি বারবার করত। প্রতিক্রিয়ার পর যদি খাবারের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক (ঋণাত্মক বলবর্ধক) দেয়া হয় তবে ইঁদুরটি আর চাবিতে চাপ দিবে না অর্থাৎ আচরণ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্কিনারের মতবাদের গুরুত্ব

প্রাণীর ও মানুষের সব রকমের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। করণ শিখনের মূল কথাই হচ্ছে প্রাণীর সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি লাভ যাকে স্কিনার বলেছেন পুরস্কার অর্থাৎ বলবৃদ্ধি (Reinfroement)। কোনো আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন তা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বা প্রাণী পুরস্কৃত হয়। শ্রেণি শিখনকে

সার্থক করতে হলে শিক্ষার্থীর নতুন আচরণকে বিভিন্ন উপায়ে বলবর্ধন প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কিনারের তত্ত্ব বা মতবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

১. কাঙ্ক্ষিত আচরণ বা শিখন সাধনের জন্য শিক্ষককে যথাযথ সংকেত বা পুরস্কার দিতে হবে।
২. শিখন পদ্ধতির প্রত্যেকটি স্তর হবে সংক্ষিপ্ত এবং তা আগের শেখা আচরণের ওপর ভিত্তি করে হবে।
৩. শিখনের প্রথম দিকে পুরস্কার দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে পুরস্কার কমিয়ে এনে তা মাঝে মাঝে সতর্কতার সাথে দিতে হবে। এতে শিক্ষার্থীর সঠিক আচরণ বা শিখন দীর্ঘস্থায়ী হবে।
৪. সঠিক আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করার পরপরই পুরস্কার দিতে হবে কারণ পুরস্কার দিতে বিলম্ব হলে শিখন বিঘ্নিত হতে পারে।

জ্ঞানবাদ

জ্ঞানবাদ শিখনের আধুনিক তত্ত্ব যা শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্ষমতার পাশাপাশি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক সংগঠন ও বিশ্বাসের প্রভাবের কথা স্বীকার করে। এই মতবাদে শিক্ষার্থী কীভাবে শেখে এবং জ্ঞানের প্রকৃতি কেমন তা ব্যাখ্যা করে। জ্ঞানবাদী তত্ত্বের মধ্যে সমগ্রতাবাদ ও গঠনবাদ তত্ত্ব অন্যতম। সমগ্রতাবাদে শিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। অন্যদিকে গঠনবাদে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় যা অধিকাংশক্ষেত্রে শিখনে সহায়তা করে। গঠনবাদের ক্ষেত্রে ভিগটস্কির সামাজিক গঠনবাদ মতবাদ অন্যতম যা শিখনের ক্ষেত্রে শিশুর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথা স্বীকার এবং শিখন প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয় ও সমাজের সংযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

আচরণবাদীরা শিখনের ফলকে পরিমাপ করেন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ায় মানসিক কোন সংযুক্তি থাকে কিনা তা বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু শিখনে উদ্দীপক ছাড়া আরও কিছু জড়িত থাকে যা আচরণবাদীরা খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। এই অতিরিক্ত উপাদানটি হলো জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া। জ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করা হয় শিখন হলো ব্যক্তির নিজস্ব ও অন্তর্নিহিত কোন এক প্রক্রিয়া যা শিখন সম্পাদন করে থাকে। তাদের কাছে শিখন একটি প্রক্রিয়াজাত বিষয় এবং এটি সরাসরি পরিমাপ করা যায় না বরং তা ব্যাখ্যার বিষয়। তাদের মতে মানুষ বা প্রাণী উদ্দীপকের প্রভাবে যা শিখছে তা বোঝা যাবে তার আচরণ দেখে। সুতরাং আচরণ হচ্ছে শিখনের একটি ইন্ডিকেটর বা নির্ণায়ক মাত্রা।

শিখনের জ্ঞানবাদী মতবাদ তুলনামূলক নতুন এবং এর সৃষ্টি হয়েছে আচরণবাদী মতবাদের সীমাবদ্ধতাগুলোকে বিবেচনায় এনে। কারণ মানুষের অনেক জটিল আচরণের ব্যাখ্যা আচরণবাদের আলোকে দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া কম্পিউটার ও নিউরোসাইন্সের উন্নতির ফলে শিখনের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলো যান্ত্রিকভাবে দেখা সম্ভব হয়েছে। ফলে জ্ঞানবাদী মতবাদ শিখনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং আধুনিক শিক্ষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যারা এই মতবাদের পক্ষে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারা হলেন ওয়ার্দিমার, কোহলার ও কাফকার সমগ্রতাবাদ (Guestal Theory) এবং পিঁয়াজে, ভাইগটস্কি, ব্রুনার, অসুবেল প্রমুখের তত্ত্বের আলোকে প্রণীত গঠনবাদ (Constructivism)। এছাড়া কার্ট লিউইনের মনসমীক্ষণবাদ এর মধ্যেও জ্ঞানবাদের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। জ্ঞানবাদের দুটি প্রধান তত্ত্ব সমগ্রতাবাদ ও গঠনবাদ এখানে আলোচনা করা হলো:

সমগ্রতাবাদ (Guestal Theory)

জার্মানিতে ১৯১২ সালে ম্যাক্স ওয়ার্দিমার কর্তৃক গেস্টাল মতবাদের বিকাশ ঘটে। গেস্টাল একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ রূপ অথবা আকার। শব্দটিকে পরে বাংলায় সমগ্রতাবাদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্রতাবাদীরা মনে করেন যে, কেবল উদ্দীপক অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ঘটে না। বরং ব্যক্তি উদ্দীপককে কীভাবে প্রত্যক্ষণ করে এবং প্রত্যক্ষণ অনুযায়ী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কীভাবে সাজায় তার ওপর নির্ভর করে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। এ কারণেই একই উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে

সবার প্রতিক্রিয়া সমান হয় না। মূলত উদ্দীপককে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন তত্ত্ব প্রদান করেন। তারা একটি শিম্পাঞ্জি নিয়ে এই গবেষণাটি করেন। শিম্পাঞ্জিটি খাঁচায় রেখে তার ভেতরে ২টি লাঠি এমনভাবে রাখলেন যাদের দুটিকে একত্রে জোড়া দিয়ে লম্বা করা যায়। এবার খাঁচার বাইরে একটি কলা এমনভাবে রাখলেন যা হাত বাড়িয়ে আনা যায় না, আবার কেবল একটি লাঠি দিয়েও আনা যায় না। কিন্তু দুটি লাঠি জোড়া দিয়ে লম্বা করে সেটা আনা যায়। শিম্পাঞ্জিটি বহু চেষ্টা করেও হাত, পা বা একটি লাঠি দিয়ে কলার নাগাল পেল না। অতএব সে যখন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বসেছিল তখন হঠাৎ করেই তার মনে লাঠি জোড়া দেওয়ার চিন্তা আসলো এবং মুহূর্তের মধ্যে উঠে গিয়ে তাই করলো। লম্বা লাঠি দিয়ে কলা পাওয়া সহজ হলো এবং তা খেতে পারলো।

এই পরীক্ষণে লাঠি জোড়া দেওয়ার শিখনটি কোন প্রচেষ্টার ফল নয়, আবার সরাসরি উদ্দীপকের কারণেও ঘটেনি। বরং শিম্পাঞ্জিটির মনে হঠাৎ করেই চিন্তাটি আসে, যাকে এর তাত্ত্বিকগণ অন্তর্দৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ শিম্পাঞ্জিটি কলা খাওয়ার জন্য তার অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়েছে। কোন শিখন পরিস্থিতিতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটানোর কাজটি অনুশীলন অথবা বলবর্ধক ছাড়া কীভাবে সম্পাদিত হয় তা আচরণবাদ মতবাদে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অন্তর্দৃষ্টিমূলক মতবাদের আলোকে জ্ঞানবাদী তাত্ত্বিকরা এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন। মূলত অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন একটি সমগ্রতাবাদী বিষয়। কারণ এখানে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রাণীর চিন্তা চেতনায় প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি হয় এবং সে অনুযায়ী আচরণ সম্পন্ন করে।

গঠনবাদ (Constructivism)

গঠনবাদের মূলধারণা হলো ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী কোনো তথ্য বা জ্ঞানকে সরাসরি গ্রহণ করে না বরং কোন কিছু সম্পর্কে তার শিখন হয়ে থাকে ধারণা গঠন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে। জ্ঞান কীভাবে গঠন হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক সংগঠন এবং বিশ্বাসের ওপর। এই ধারণা গঠনের মূল উপাদান হলো সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বা ভাষা। গঠনবাদীদের মতে, শিশুরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে তার চারপাশে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা গঠন করে এবং নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করে। শিখন মতবাদগুলোর মধ্যে বর্তমানে গঠনবাদ অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী একটি মতবাদ। এই মতবাদদ্বারা শিক্ষার্থী কীভাবে শেখে এবং জ্ঞানের প্রকৃতি কীরূপ হবে-তা ব্যাখ্যা করা যায়। যাদের কাজের মধ্য দিয়ে গঠনবাদের বিকাশ ঘটেছে, সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন জন ডিউই (John Dewe), জ্যাঁ পিয়াজে (Jean Piaget), ভিগটস্কি (L. S. Vigotsky), ব্রুনার (Jerome Bruner) প্রমুখ।

কারো কারো মতে, গঠনবাদের প্রধান পথিকৃৎ হলেন জন ডিউই যিনি কর্তৃত্বপরায়ণ শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার (authoritarian process) পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলেন। তিনি এটিকে প্রগতিশীল শিক্ষা (progressive education) পদ্ধতি বলেছেন। এই প্রগতিশীল শিক্ষাই পরে জ্ঞানীয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গঠনবাদ (constructivism) নামে আত্মপ্রকাশ করে গঠনবাদের প্রকৃতি তিনটি মৌলিক তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে(হক এবং হোসেন, ২০১৫), যেমন-

১. বর্তমানে অর্জিত শিখনের ভিত তৈরি হয়েছে পূর্ববর্তী শিখনের কাঠামোর উপর।
২. সকল শিখনই তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং
৩. বিষয়ের অর্থ বা সংবোধন নির্ভর করে অন্যান্য বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কের ওপর।

গঠনবাদকে দুইটি ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

(১) জ্ঞানমূলক গঠনবাদ (Cognitive constructivism)

(২) সামাজিক গঠনবাদ (Social constructivismi)। এখানে আমরা শুধু সামাজিক গঠনবাদের অন্তর্ভুক্ত ভিগটস্কির মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

শিখন প্রক্রিয়ায় গঠনবাদের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার ক্ষেত্রে গঠনবাদের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষকের গঠনবাদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে তা শিক্ষাদান কাজে লাগাতে পারেন। এই মতবাদে অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা একেবারেই শূন্য জ্ঞান নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না, বরং তার কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে এবং তার চিন্তা করার ও ভিন্নমত প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে। শিক্ষার্থীর কাছে কোন নতুন তথ্য উপস্থাপন করা হলে সে তার অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলনের মাধ্যমে জ্ঞান বা ধারণাকে পুনর্গঠন করে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে বা সামষ্টিকভাবে নতুন তথ্যের অর্থ গঠন করে শেখে। গঠনবাদ অনুসারে অর্থ গঠন বা তৈরি করার প্রক্রিয়াই হলো শিখন । এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক তার শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু ও তার চিন্তার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করার এবং শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব ধারণা তৈরি করার সুযোগ দেবেন। শিক্ষাবিদগণ গঠনবাদ অনুসারে শিখন কেমন হতে পারে তার কিছু নীতিমালা প্রদান করেছেন। শিক্ষকরা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে পারেন।

- শিখন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। তাই শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।
- গঠনবাদ অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থ গঠন বা তৈরি করার প্রক্রিয়াই হলো শিখন যা মানসিকভাবে সংঘটিত হয়। তাই শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব ধারণা তৈরি ও চিন্তার জন্য শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিতে হবে।
- শিখনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানহলো ভাষা। সুতরাং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তার মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন।
- শিখনের জন্য প্রয়োজন পূর্বজ্ঞান যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নতুন জ্ঞান আহরণ করবে। তাই শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন বিষয় শিখতে পারে।
- শিখন একটি সামাজিক এবং সামষ্টিক কার্যাবলি। আর এই কার্যাবলির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সামাজিক প্রেক্ষাপট, কথপোকথন বা ভাষা ও মিথস্ক্রিয়া। এগুলোর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বিকাশ ঘটে সে কারণে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের জন্য মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক, সহপাঠী, বন্ধু, পরিবার এবং আশপাশের ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা বা গুরুত্ব রয়েছে।
- গঠনবাদী শিখন পদ্ধতি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। এই মতবাদে মুখস্থবিদ্যা এবং শিক্ষক নির্ভরতা পরিহার করা হয়।
- এই প্রক্রিয়ায় পাঠদানে সমস্যাযুক্ত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

সামাজিক গঠনবাদ: ভিগটস্কির শিখন মতবাদ

রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী L. S. Vigotsky- তাঁর সামাজিক গঠনবাদ মতবাদটি ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকের দিকে দিলেও পাশ্চাত্য বিশ্বে তাঁর মতবাদটি ১৯৫০ দশকে পরিচিতি লাভ করে। ভিগটস্কির শিখন মতবাদের মূলধারণা হলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social interaction) অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর জ্ঞানের কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে তার জ্ঞানমূলক বা বুদ্ধি বিকাশ ঘটে। ভিগটস্কি মনে করেন এই মিথস্ক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো ভাষা। এছাড়া তিনি তাঁর 'Thought and Language'বইতে উল্লেখ করেছেন যে, শিশুরধারণার বিকাশও তার ভাষার ওপর নির্ভরশীল। শিশু যখন ভাষা দিয়ে তার পর্যবেক্ষিত বস্তুটিকে বর্ণনা করতে পারে তখনই তার ধারণার বিকাশ ঘটে। ভিগটস্কির মতবাদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-

1. More Knowledgeable Other (MKO)
2. Zone of Proximal Development (ZPD)

১. More knowledgeable Other: এই ধারণাটি দ্বারা কোন কাজ, শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় বা ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে শিশু বা শিক্ষার্থীর চেয়ে অধিকতর ভালো ধারণা বা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বুঝানো হয়, যাদের কাছ থেকে শিশু জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর বাবা, মা, বড় ভাই বা বোন এবং শিক্ষক সবাইকে ভালো ধারণা বা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলা যেতে পারে, যাদের কাছ থেকে শিশু নতুন নতুন জ্ঞান বা তথ্য জানতে, বুঝতে ও শিখতে পারে।

২. Zone of Proximal Development: ভিগটস্কির মতে জ্ঞানমূলক বিকাশের ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত হয়ে থাকে, যাকে তিনি বলেছেন Zone of Proximal Development (ZPD)। এর অর্থ হলো শিশুর বিকাশ শুরু হতে থাকে যখন সে সামাজিক আচরণে সম্পৃক্ত হয় এবং এর পরিপূর্ণ বিকাশ নির্ভর করে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর। বিকাশের একটি পর্যায়ে যেয়ে শিশু স্থির হয়ে যায়। এ পর্যায়ে শিশুর একক প্রচেষ্টার চেয়ে সমবয়সীদের সহযোগিতা বা বড়দের নির্দেশনার মাধ্যমে তার জ্ঞান বিকাশ অনেক বেশি হয়।

নিচের চিত্রটিতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো

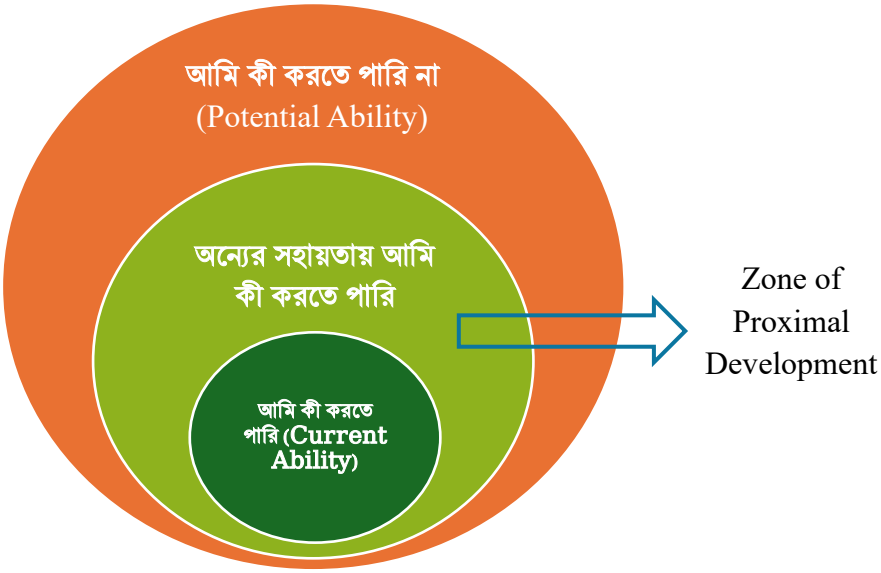

চিত্র: Zone of Proximal Development-**এর ধারণা।**

ভিগটস্কির মতে, সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই শিশুর সচেতনতার বিকাশ ঘটে। ভিগটস্কি জ্যাঁ পিয়াজে মত জ্ঞানমূলক বিকাশ নিয়ে কথা বলেছেন। তবে তিনি যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন সেগুলো হলো-

- শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ কৃষ্টি(Culture) দ্বারা প্রবাহিত হয়। আর সে কারণে বিভিন্ন কৃষ্টিতে শিশুর জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।
- বিভিন্ন সামাজিক উপাদান বিশেষ করে সমাজিক মিথস্ক্রিয়ার (Social interaction) মাধ্যমে শিশুর জ্ঞানের বিকাশ ঘটে।
- এই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার উৎস হলো Zone of Proximal Development (ZPD)-এ উল্লেখিত নির্দেশিত শিখন (Guided learning)
- শিশু যে পরিবেশে বড় হয় সে পরিবেশ তার চিন্তাকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ সে কী চিন্তা করবে এবং কীভাবে চিন্তা করবে তা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ভিগটস্কি ভাষার ওপর গুরুত্বরোপ করেছেন কারণ শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশের ওপর ভাষার ভূমিকা অত্যাধিক। তাঁর মতে জীবনের প্রারম্ভে শিশুর চিন্তা ও ভাষা পৃথক থাকলেও তিন বছর বয়সে এদু'টি বিষয়কে সমন্বিত করে শিশু কোনো কিছু করার বা শেখার চেষ্টা করে।

ভিগটস্কির বিকাশ মতবাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো Scaffolding, যা জানা থেকে অজানার জগতে প্রবেশের জন্য শিক্ষার্থীদের কীভাবে পরিচালিত করা যায় তার দিক নির্দেশনা রয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কোনো জটিল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য Scaffolding ধারণা প্রয়োগ করেন। Scaffolding ধারণা প্রয়োগ করা হয় যখন কোনো বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমস্যা পড়ে বা বিষয়টি অনুধাবন করতে বেগ পেতে হয় তখন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যে বিষয়টি ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছে তাকে দিয়ে বিষয়টি তার সহপাঠীদের শিখাতে পারেন। এর ফলে সমবয়সী হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়া ফলপ্রসূ হয় যা সকলের জন্য প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। অন্যান্য কৌশলের পাশাপাশি Scaffolding এর জন্য Tharpe and Gallimore (১৯৮৮) উদ্ভাবিত নিচের ছয়টি পদক্ষেপ শিক্ষকরা অনুসরণ করতে পারেন।

১. **মডেলিং:** এখানে মূলত কী করতে হবে তা বলে বা করে দেখানো। এই পদ্ধতি শিশুর শিক্ষার জন্য অত্যন্ত সহায়ক।
২. **পুরস্কার ও শাস্তির দক্ষ ব্যবস্থাপনা:** কোনো পদক্ষেপ সম্পাদিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত বলবর্ধন প্রদান। বলবর্ধন শিক্ষার্থীকে একই কাজ বার বার করতে উৎসাহিত করে।
৩. **কর্মদক্ষতার ফলাবর্তন প্রদান:** সম্পাদিত কাজের যথাযথ ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক প্রদান। নিজের কাজের সঠিকতা বা ত্রুটির মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে শিশু পরবর্তী ধাপে তা শুধরে নিতে পারে।
৪. **উপযুক্ত কর্ম সম্পাদনের নির্দেশনা:** কোন কাজ কীভাবে সম্পাদিত হবে তার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া। প্রকৃত নির্দেশ পেলে শিশুর পক্ষে ZPD-এর একটি স্তর থেকে উন্নততর স্তরে যাওয়া সহজ হয়।
৫. **প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান:** শিক্ষার্থীর মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেওয়া। ZPD- এর একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে নানবিধ প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে, সেগুলোর উত্তর না পেলে এই স্তর উৎরানো যায় না।
৬. **চূড়ান্ত জ্ঞানীয় কাঠামো প্রদান:** কোন সমস্যার সমাধান যেহেতু অপরের সহায়তায় দলীয়ভাবে করা হয়। তাই অর্জিত জ্ঞানের সঠিক কাঠামো সম্মিলিতভাবেই প্রস্তুত করা এই পর্যায়ের কাজ।

ভিগটস্কির বিকাশ মতবাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ZPD ও Scaffolding, যা শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের মধ্যে কার্যকর মেলবন্ধন তৈরিতে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । নতুন কোনো বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় যদি তার গঠন ও কাঠিন্যের মাত্রা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকে, তবে শিক্ষার্থী কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা তিনি সহজে অনুমান করতে পারেন। যখন শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের প্রান্তসীমায় গিয়ে ঠেকবে তখনই তিনি Scaffolding ধারণাটি ব্যবহার করবেন।

ভিগটস্কি ও জ্যাঁ পিয়াজের তত্ত্বের পার্থক্য

বিষয়	ভিগটস্কি'র তত্ত্ব	পিয়াজে'র তত্ত্ব
১.সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত	সামাজিক ও সংস্কৃতি পরিবেশের ওপর জোরালো গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।	সামাজিক সংস্কৃতি প্রেক্ষিতের ওপর গুরুত্বারোপ করলেও তা ভিগটস্কির মত দৃঢ় নয়।
২. গঠনবাদ	সামাজিক গঠনবাদ	জ্ঞানীয় গঠনবাদ
৩. পর্যায়	কোন পর্যায়ক্রমিক স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়নি।	শিশুর বিকাশকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন- ইন্দ্রিয় পেশীর সমন্বয় কাল, প্রাক-প্রয়োগিক কাল, বাস্তব প্রায়োগিক কাল এবং রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক কাল।

৪.বিকাশের প্রক্রিয়া/ প্রক্রিয়াসমূহ	বিকাশের প্রান্তবর্তী সীমা বা অবস্থা, ভাষা, সংলাপ (dialogue), সাংস্কৃতিক উপাদান।	স্কীমা, উপযোজন, সাদৃশ্যকরণ, প্রয়োগ, সংরক্ষণ, শ্রেণিকরণ, hypothetical deductive reasoning
৫. ভাষার ভূমিকা	শিশুর বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিশেষকরে চিন্তা গঠনে ভাষার শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে।	ভাষার ভূমিকা থাকলেও শিশুর ভাষাকে পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রধান ভূমিকা পালন করে।
৬. শিক্ষার গুরুত্ব	সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান শেখাতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	শিক্ষা শুধু শিশুর জ্ঞানীয় দক্ষতাকে পরিমার্জিত করে।
৭. শিখন শেখানো ক্ষেত্রে ব্যবহার	শিক্ষক হলেন একজন সাহায্যকারী (Facilitator) এবং নির্দেশক। তিনি পরিচালক নন।	পিয়াজের তত্ত্বও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। অর্থাৎ শিক্ষক হবেন একজন সাহায্যকারী ও নির্দেশক। তিনি পরিচালক হবেন না। তিনি শিক্ষার্থীদের তাদের জগৎ অনুসন্ধান করতে এবং জ্ঞান আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন।

শিক্ষায় ভিগটস্কির মতবাদের ব্যবহার

শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিখে তা একজন শিক্ষককে জানতে হবে। শিশুরা বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তবে শিক্ষার্থীরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বা সমাজ থেকে যে শিখন অভিজ্ঞতা বা ধারণা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে সেগুলোকে পরবর্তীতে যাতে যৌক্তিকভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারে সেদিকেই শিক্ষককে গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে ভিগটস্কির মতবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে চারটি মূলনীতি কাজ করে সেগুলো হলো-

১. শিখন এবং বিকাশ হলো এক ধরণের সামাজিক সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ।
২. ZPD ধারণাটি শিক্ষাক্রম ও পাঠটাকা প্রণয়নের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে থাকে।
৩. বিদ্যালয়ের শিখন একটি অর্থপূর্ণ প্রেক্ষিতে সংগঠিত হওয়া উচিত। 'বাস্তব জগৎ' থেকে শিশুর যে শিখন ও জ্ঞানের বিকাশ হয় তা থেকে বিদ্যালয়ের শিখন পৃথক হবে না।
৪. বিদ্যালয়ের বাইর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ শিশুর বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

জাতীয় কারিকুলাম ২০২১ (পরিমার্জিত-২০২৫) এর দার্শনিক ভিত্তি ও গঠনবাদ

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নে দার্শনিক ভিত্তির গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিখন মতবাদগুলোর মধ্যে গঠনবাদ (Constructivism) অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী মতবাদ। কারো কারো মতে, গঠনবাদের প্রধান পথিকৃৎ হলেন জন ডিউই, যিনি কর্তৃত্বপরায়ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতির কথা বলেন। তিনি এটিকে প্রগতিশীল শিখন পদ্ধতিও বলেছেন। এই প্রগতিশীল শিক্ষাই পরে জ্ঞানীয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গঠনবাদ নামে আত্মপ্রকাশ করে। যাঁদের গবেষণা কাজের মধ্য দিয়ে গঠনবাদ সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- জন ডিউই (John Dewey), জ্যাঁ পিয়াজে (Jean Piaget), ভিগটস্কি (L.S.Vigotsky), রুনার (Jerome Bruner) প্রমুখ। এই মতবাদে শিক্ষার্থী কী শিখবে এবং কীভাবে শেখে-তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গঠনবাদীদের মতে, শিশুরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে, তার চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা গঠন করে এবং নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করে। গঠনবাদের প্রধান ধারণা হলো- মানুষ কোনো তথ্য বা জ্ঞানকে সরাসরি গ্রহণ করে না, বরং তার শিখন হয় ধারণা গঠন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে। শিখন কীভাবে সংঘটিত হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক সংগঠন এবং বিশ্বাসের ওপর। আর এই ধারণা গঠনের মূল উপাদান হলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বা ভাষা। শিশু যখন ভাষা দিয়ে তার পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করতে পারে তখনই তার

ধারণার বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর জ্ঞানের কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটে বা শিখন সংঘঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) প্রণয়নে গঠনবাদকে মূল দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সহায়ক তথ্যসূত্র:

- ঘোষ, অরুণ ও সুশীল রায় (১৯৮৭), শিক্ষাবিজ্ঞান, ব্যানার্জী পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- ঢালী, স্বপন কুমার ও রেজা ইমাম (২০০২), শিক্ষার ভিত্তি, প্রভাতী লাইব্রেরী, ঢাকা
- মালেক, আব্দুল ও অন্যান্য (২০০৭), শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যাল্য মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাও, ধাকা১২০৭
- খান, ড. মোঃ আব্দুল আউয়াল ও অন্যান্য(২০০৫), শিক্ষার ভিত্তি, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকাচট্টগ্রাম
- হক, নাজমুল ও অন্যান্য(২০১৫), শিক্ষায় জ্ঞানবিকাশ তত্ত্ব, বিশ্বসাহিত্য ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা
- রায়, সুশীল (২০০১), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সি, ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলিকাতা।
- আলী, মুহম্মদ আনওয়ার ও অন্যান্য (১৯৯৬), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা
- খাতুন, শরীফা (১৯৯৯), দর্শন ও শিক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- বেগম, লুৎফুন্নেসা (১৯৯৮), আধুনিক মনোবিজ্ঞান, আমাদের বাংলা প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
- বেগম, লুৎফুন্নেসা (১৯৯৩), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ঢাকা।
- পেশাগত শিক্ষা ২য় খন্ড, ডিপিএড, ২০১৯, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী

গ্রন্থপঞ্জিকা:

- আলী, মুহম্মদ আনওয়ার ও অন্যান্য (১৯৯৬), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা
- আলী, আজহার ও অন্যান্য (২০০৪), শিক্ষার ভিত্তি, মিতা প্রকাশনী, ঢাকা।
- এহসান, মো: আবুল (১৯৯৭) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন: নীতি ও পদ্ধতি, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি, ঢাকা।
- খাতুন, শরীফা (১৯৯৯), দর্শন ও শিক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- খান, লুৎফর রহমান ও আব্দুল মালেক (২০০০), সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ঘোষ, অরুণ ও সুশীল রায় (১৯৮৭), শিক্ষাবিজ্ঞান, ব্যানার্জী পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- ঘোষ, অরুণ (১৯৯৭), শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, কলিকাতা।
- ঘোষ, অরুণ (১৯৯১), শিক্ষাবিজ্ঞানের দর্শন ও মূলতত্ত্ব, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ, কলিকাতা।
- ঘোষ, অরুণ (১৯৮৯), স্নাতক স্তরের শিক্ষাতত্ত্ব, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, অষ্টম সংস্করণ কলিকাতা।
- ঘোষ, সুনন্দা (১৯৮০), শিক্ষা তত্ত্বের ভূমিকা, পশ্চিবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ, কলিকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিভূষণ (১৯৯৫), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
- চৌধুরী, কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী (১৯৬১), শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
- বেগম, রওশন আরা ও অন্যান্য (১৯৯৮), শিক্ষাবিজ্ঞান পরিচিতি, স্কুল অভ্ এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
- বেগম, লুৎফুন্নেসা (১৯৯৮), আধুনিক মনোবিজ্ঞান, আমাদের বাংলা প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

- বেগম, লুৎফুন্নেসা (১৯৯৩), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ঢাকা।
- রায়, সুশীল (১৯৯৫), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা।
- রায়, সুশীল (২০০৫), শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা।
- রায়, সুশীল (২০০১), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সি, ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলিকাতা।
- সরকার, নীহাররঞ্জন (২০০৬), মনোবিজ্ঞান ও জীবন, জিজি অফসেট প্রেস, ঢাকা।
- সিমসন, জর্জ (১৯৮৪), মানুষের সমাজ (অনু: রংগলাল সেন), মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- সেনগুপ্ত, রমনী রঞ্জন (১৯৫১), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ।
- সেনগুপ্ত, রমনী রঞ্জন (১৯৫১), শিক্ষা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ।
- Allport, G.W. (1937) Personality: A Psychological Interpretation, Henry Holt & Company. Inc., New York
- Bowen, James and Peter R. Hobzon (1974), Theories of Education, John Wiley and Sens Australasia Pty Ltd. Sydney London
- Chandra, Soti Shivendra, and Rajendra Sharma, (1996), Sociology of Education, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi
- Chauhan. S.S (1984), Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt Ltd. New Delhi
- Deway John (1915), The School and Society (2nd Ed.), Chicago University Press, Chicago.
- Dewey, John (1916). Democracy and Education, The Macmillan Company, New York
- Dewey, John (1940), My Pedagogic Creed, Education Toda Patnam, New York
- Dewey, John (1963). Experience and Education, The Macmillan Company, New York
- Drever, (1986) 1. A Dictionary of Psychology, MacGrawHill Biook Company, New York
- Durkhiem. Emile (1956), Education and Sociology, The Free Press, New York
- Findla, G.J. (1968), The Foundation of Education Macmillan & Co., New York
- Garrett, (1985), A Development Theory of Intelligence, The Macmillan Company, New York

অধ্যায়-০৬

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা

বিশ্বায়নের এই যুগে সমাজের প্রগতি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার বিশ্বপ্রেক্ষাপট প্রতিনিয়ত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশ ও সমাজ একে অপরের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হচ্ছে। আজকের দিনে একটি জাতির সফলতা, একটি দেশের উন্নয়ন কিংবা মানবসভ্যতার সামগ্রিক পূর্ণতা নির্ভর করছে উচ্চশিক্ষা, জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের উপর। এই উপাদানগুলিই পারে বৈশ্বিক উষ্ণতা, পরিবেশ দূষণ, জ্বালানির সংকট, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্যঝুঁকি, বার্ধক্য, জাতিগত দ্বন্দ্ব বা ধর্মীয় উগ্রতা এবং সহিংসতার মতো সমস্যাগুলো কাটিয়ে একটি টেকসই ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।

এ কারণেই আজকের যুগে উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে। সময়ের জনপ্রিয় প্রবাদ, *"Never in human history the need for higher education was so intensely felt as it is now"* এই বাস্তবতাকেই তুলে ধরে।

আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন যত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, ততই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে তৈরি হচ্ছে একটি বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তুলছে। প্রতিটি দেশে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে আন্তর্জাতিক উপাদানসমূহ ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি নানা ধরনের কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এই সংস্থাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষার বিশ্বপ্রেক্ষিতের কিছু প্রধান দিক স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিক্ষার রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষার আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র: জাতিসংঘ/আন্তর্জাতিক সনদ ও কমিশনে শিক্ষা

মানব অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights)

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ২১৭ক (১১১) বিধিতে বিশ্বের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় এক সর্বজনীন ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ ঘোষণায় মানব জীবনের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষাও এর গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। এ ঘোষণাপত্রের ২৬ অনুচ্ছেদে মানুষের শিক্ষার অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের এক উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *"প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। প্রাথমিক/প্রারম্ভিক ও মৌলিক স্তরসমূহে শিক্ষা অবৈতনিক হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা লাভের সুযোগ সাধারণভাবে সহজলভ্য হবে এবং মেধা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণে সকলের সমান সুযোগ থাকবে।"*

দুই উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *"ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সকল জাতি, নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা, বন্ধুত্ব উন্নয়ন সাধনে এবং শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘ কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে।"*

তিন উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *সন্তানদের যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে, তা আগে থেকে বেছে নেয়ার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে।"*

মানবাধিকার সংক্রান্ত এই সর্বজনীন ঘোষণার মাধ্যমে শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এক মৌলিক অধিকার হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে শিশু অধিকার সনদ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার–সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) প্রভৃতি নথিতে শিক্ষার এই অধিকারের স্বীকৃতি আরও সুসংহত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তার পেছনেও এ আন্তর্জাতিক ঘোষণার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (১৯৭১-১৯৭২): International Commission on Education (1971-1972)

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO) বিশ্ব শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। মানুষ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানে সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করে আসছে। ফিলিপ এইচ কোবসকে (Philip H. Coombs) The World Educational Crisis: A System Analysis শীর্ষক একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করে। কোবস ছিলেন ইউনেস্কোর শিক্ষা পরিকল্পনা বিষয়ক আন্মর্জাতিক ইন্সটিটিউটের পরিচালক। এ গবেষণা কর্মটির তিন বছরের মাথায় ১৯৭১ সালে ইউনেস্কো মহাপরিচালক রেনে মাহিউ (Rene Maheu) ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এদগার ফরে (Edgar Faure) কে প্রধান করে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের ওপর দু'টি প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয়। একটি হচ্ছে "... defining the new aims to be assigned to education as a result of the rapid changes in knowledge and in societies, the demand of development, the aspirations of the individual understanding and peace." (Aggarwal: 2000:17) অর্থাৎ দ্রুত পরিবর্তনশীল জ্ঞানরাজ্য ও সমাজব্যবস্থায় আন্ত র্জাতিক সমঝোতা ও শান্তির চাহিদার নিরিখে শিক্ষার নতুন নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা। অন্য কাজটি হচ্ছে, "... Putting forward suggestions regarding the intellectual, human and financial means needed to attain the objectives set." অর্থাৎ নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক, মানবীয় ও অর্থ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এই কমিশন ১৯৭২ সালে "Learning to Be" (বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা) শীর্ষক প্রতিবেদন পেশ করে।

এ কমিশন রিপোর্টে বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ধারা তুলে ধরা হয়। সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে:

> ১) ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষার অগ্রগতির ফল হিসেবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা থেকে এমনি ফল পাওয়া গিয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ যথেষ্ট অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করে হলেও এই পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।
> ২) ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের এমন এক ধরনের সমাজের জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে যা এখনো অনাগত। প্রাচীনকালে দীর্ঘকাল ধরে সমাজের যে স্থিতি দেখা যেত আজ দ্রুত সামাজিক রূপান্তরের ফলে তার অবসান ঘটেছে। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর অভাবিতপূর্ব চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।
> ৩) ইতিহাসে এই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থীকে
> সমাজ তার প্রয়োজনের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করছে। স্পষ্টতই সমাজের চাহিদা দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না (লতিফ: ২০০৫:০৯)

এ কমিশন রিপোর্টের সুপারিশগুলোর মধ্যে একটি সুপারিশ বিশ্ব শিক্ষাক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি হচ্ছে 'জীবনব্যাপী শিখন' (lifelong learning) বিষয়ক সুপারিশ। কমিশনের মতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হতে হবে, শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলা। সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ কোন শিক্ষা কর্মসূচির পক্ষে তা সাধন করা সম্ভব

নয়। এজন্য প্রয়োজন 'জীবনব্যাপী শিখন' দর্শনে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এর জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে ও দক্ষতা অর্জন করাতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার সাথে সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বস্তুত এদগার ফরে কমিশনের এ সুপারিশটি বিশ্বের শিক্ষা জগতে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করে। শিক্ষা বিষয়ে প্রচলিত তথা গতানুগতিক ধারণা ও তত্ত্বে ধাক্কা দেয়। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক গঠিত দেলর কমিশন রিপোর্টেও এ ধারণার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

সিডো (CEDAW) সনদ

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)" সনদ গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ২০টি দেশ এ সনদের কিছু ধারা সংশোধন করে সনদটি গ্রহণের পক্ষে মতামত রাখে। ১৯৮৯ সালে এ কনভেনশনের দশম বার্ষিকীতে ১০০টি দেশ এ সনদের ধারাসমূহ মানতে বাধ্য থাকার অঙ্গীকার করে। নিচে এ সনদের শিক্ষাবিষয়ক ধারা ও উপধারাসমূহ তুলে ধরা হলো: ধারা-১০: শিক্ষায় সমঅধিকার শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এগুলো হচ্ছে:

ক) কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্যে একই শর্তাবলি; স্কুলপূর্ব, সাধারণ, কারিগরি, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা;

খ) একই শিক্ষাক্রম, একই পরীক্ষা, একই মানের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং একই মানের বিদ্যালয় চত্বর ও সরঞ্জামাদি লাভের সুযোগ প্রদান;

গ) সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরনের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচি সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোনো ধারণা দূরীকরণ;

ঘ) বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষামঞ্জুরি থেকে লাভবান হওয়ার সমান সুযোগ প্রদান;

ঙ) বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচি, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোন দূরত্ব সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

চ) ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন, তাদের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন;

ছ) খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্যে একই সুযোগ প্রদান;

জ) পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ।

শিক্ষা নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রসমূহের কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণে সিডো সনদ প্রধানত গুরুত্ব আরোপ করেছে।

শিশু অধিকার কনভেনশন ১৯৮৯ (Convention on the Rights of the Child 1989)

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্ব শিশু অধিকার সনদ ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণাপত্রের ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে শিশুদের শিক্ষার অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে। ২৮ অনুচ্ছেদের তিনটি উপ-অনুচ্ছেদের শিশুদের শিক্ষা অধিকারের দিকগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। নিচে তা তুলে ধরা হলো:

উপ-অনুচ্ছেদ-১: অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র, সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করবে এবং এই অধিকারকে অধিক বাস্তবায়নের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, সুনির্দিষ্টভাবে।

ক) সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সহজলভ্য করতে হবে

খ) সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাকে উৎসাহ দেয়া, প্রতিটি শিশুর জন্যে অনুরূপ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। সকল শিশু যেন এ সুযোগ লাভকরতে পারে সে জন্যে বিনাখরচে শিক্ষা লাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে;

গ) যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ যাতে সবাই পায় সে জন্যে সব যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

ঘ) শিক্ষা বিষয়ক ও বৃত্তিমূলক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা সব শিশুর জন্যে সহজে গ্রহণযোগ্য ও পর্যাপ্ত হবে

ঙ) স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি উৎসাহিত করা এবং স্কুল ত্যাগের হার কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে

উপ-অনুচ্ছেদ-২: অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ, স্কুলের শৃঙ্খলা বিধানের নিয়মকানুন যাতে শিশুর মানবিক মর্যাদা এবং এই সনদের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় সে জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

উপ-অনুচ্ছেদ-৩: অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষা বিষয়াদিতে বিশেষ করে, বিশ্বব্যাপী অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে জ্ঞান সম্প্রসারণ এবং আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার ও উৎসাহিত করবে। এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদাকে বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে।

২৯ অনুচ্ছেদের দু'টি উপ-অনুচ্ছেদে শিশুদের শিক্ষা অধিকারের বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হলো:

উপ-অনুচ্ছেদ-১: অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ একমত পোষণ করে যে, শিশুর শিক্ষা যেসব লক্ষ্যে পরিচালিত হবে তা হচ্ছে:

ক) শিশুর ব্যক্তিত্ব মেধা, এবং মানসিক ও শারীরিক দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ;

খ) মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

গ) শিশুর পিতামাতার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং যে দেশে বাস করে, সে দেশের মূল্যবোধ ও শিশুর নিজস্ব মাতৃভূমিসহ অপরাপর সভ্যতার প্রতি সম্মান বোধকে জাগিয়ে তোলা;

ঘ) মৈত্রীর চেতনায় একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্যে শিশুর প্রস্তুতি নিতে হবে। সে কারণে সমঝোতার সাথে শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারীপুরুষের সমান অধিকারসহ সকল জনগণ, নৃতাত্ত্বিক, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসীসহ সকল লোকজনের প্রতি সমান সম্মান দেখাবে

ঙ) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে;

উপ-অনুচ্ছেদ-২: এই অনুচ্ছেদ কিংবা ২৮ নং অনুচ্ছেদ এর যেকোনো অংশ অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হলে এমনভাবে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাবে নাযদি না ১ নং প্যারায় উল্লিখিত নীতিমালা উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুসরণ না করে থাকে এবং তাদের শিক্ষা মান যদি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত মানের ন্যূনতম সংগতিপূর্ণ না হয়

শিশু অধিকার কনভেনশন বিশ্বের সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের দায়বদ্ধতার বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সবার জন্য শিক্ষার বিশ্ব ঘোষণা ১৯৯০ (World Declaration on Education for All 1990)

১৯৯০ সালের ৫ থেকে ৯ মার্চ থাইল্যান্ডের জমতিয়েন (Jomtein) এ 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক বিশ্ব ঘোষণা প্রদান করা হয়। এটি জমতিয়েন ঘোষণা নামেও পরিচিত। ঘোষণার সারমর্ম নিচে তুলে ধরা হলো:

১. মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ (Meeting Basic Learning Needs): মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্যে পরিকল্পিত সুযোগ থেকে প্রত্যেক শিশু, যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি উপকৃত হতে হবে।

২. দৃষ্টিভঙ্গি গঠন (Shaping the Vision): সকলের জন্যে মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রচলিত মৌলিক শিক্ষার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করাই যথেষ্ট নয়। আসলে প্রয়োজন একটি বিস্মৃত দৃষ্টিভঙ্গি যা বিদ্যমান সম্পদ পর্যায় ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোদির সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে সক্ষম।

৩. সর্বজনীন সুযোগ সৃষ্টি ও সমতা বিস্তৃতি (Universalizing Access and Promoting Equity): সকল শিশু, যুবা ও বয়স্ক ব্যক্তিকে মৌলিক শিক্ষা দিতে হবে।

৪. শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান (Focusing on Learning Acquisition): শিক্ষার সম্প্রসারিত সুযোগ কোনো ব্যক্তি বা সমাজের অর্থবহ উন্নয়নের কাজে লাগে কিনা তা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে প্রাপ্ত সুযোগ থেকে ঐ ব্যক্তি বা সমাজ প্রকৃতপক্ষে কোনো শিক্ষা অর্জন করে কিনা তার ওপর। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যদি আত্মস্থ ও আত্মীকরণ করা যায়, তবেই তা উন্নয়নের কাজে লাগে।

৫. মৌলিক শিক্ষার পদ্ধতি ও পরিধি বিস্তৃতকরণ: শিশু, যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি সকলের মৌলিক শিক্ষা চাহিদার বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং পরিবর্তনশীলতার কারণে মৌলিক শিক্ষার সংজ্ঞায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে তার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। এর অন্তর্গত উপাদানসমূহ হচ্ছে:

ক) জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষা শুরু হয়। একে প্রাথমিক শৈশবকালে যত্ন ও প্রারম্ভিক শিক্ষা বলা হয়।

খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা হচ্ছে পরিবারের বাইরে শিশুর মৌলিক শিক্ষাদানের প্রধান ব্যবস্থা।

গ) যুবা ও বয়স্কদের বহুমুখী মৌলিক শিক্ষা প্রয়োজন এবং তা প্রদানের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশলের অবলম্বন করা উচিত

ঘ) মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সঞ্চালনে ও সামাজিক সমস্যাবলি অবহিতকরণে ও নিরসনে জন্য লভ্য সকল কৌশল/উপকরণ ও তথ্য যোগাযোগের চ্যালেঞ্জ এবং সামাজিক কর্মকান্ড ব্যবহার করতে হবে

৬. শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণ (Enhancing the Environment for Learning): সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষা লাভ হয় না। যাদের জন্যে শিক্ষার আয়োজন তারা যেন শিক্ষা কর্মকান্ড থেকে উপকৃত হতে পারে এবং সে জন্যে তারা যেন প্রয়োজনীয় পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, শারীরিক ও আবেগিক সমর্থন পেতে পারে সমাজকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ (Strengthening Partnerships):জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর সকলের জন্যে মৌলিক শিক্ষা আয়োজনের যে বিশেষ দায়িত্ব তা পালনে কোনো কর্তৃপক্ষ এককভাবে লোকবল, সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন দিতে সক্ষম হবে এমন আশা করা যায় না। সে জন্যেই সকল স্তরে নতুন উদ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮. প্রাসঙ্গিক সমর্থন নীতিমালা গঠন (Developing a Supporting Policy Context):ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তার সদ্ব্যবহার করার জন্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমর্থননীতিমালা গঠন করা প্রয়োজন।

৯. সম্পদ সংগ্রহ (Mobilizing Resources): অতীতের চেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃততর আকারে সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষার আয়োজন করতে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সরকারি, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবি কর্মকাণ্ডে অধিকতর অর্থসম্পদ যোগানো অপরিহার্য।

১০. আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়করণ (Strengthening International Solidarity): মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটানো সকলের ও বিশ্বের মানবিক দায়িত্ব। তাই বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকারকল্পে ন্যায্য ও নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃঢ় করা প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর রাষ্ট্র জমতিয়েন ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করে। ফলে শিক্ষার এসব দিক বাস্তবায়নে এসব দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

একবিংশ শতাব্দির শিক্ষা: ডেলরস' কমিশন

একবিংশ শতাব্দিতে পৃথিবী জুড়ে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে বিশ্বায়ন, প্রযুক্তির বিস্তার, জলবায়ু পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতা এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষাকে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। একসময় শিক্ষা কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জন ও পেশা পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতো, কিন্তু বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে দেখা হচ্ছে একটি মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে। এই পটভূমিতে ১৯৯৬ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) গঠন করে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন, যার নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জ্যাক ডেলর। এই কমিশন তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশ করে একটি যুগান্তকারী প্রতিবেদন "Learning: The Treasure Within" যা বিশ্বব্যাপী ডেলরস কমিশনের রিপোর্ট হিসেবে পরিচিত।

ডেলরস কমিশন শিক্ষা বিষয়ে এমন একটি দর্শন উপস্থাপন করে, যা শুধুমাত্র দক্ষতা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং মানবিক বিকাশ, সামাজিক সংহতি ও সহনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কাঠামো গঠনের জন্য চারটি মৌলিক ভিত্তির কথা বলা হয়, যেগুলো পরিচিত "শেখার চার স্তম্ভ" (The Four Pillars of Learning) নামে। এই চারটি স্তম্ভ শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবিক ও টেকসই পথে পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়।

প্রথম স্তম্ভটি হলো "জানার জন্য শেখা (Learning to Know)", যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের দক্ষতা গড়ে তোলে। এটি কেবল তথ্য মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং চিন্তা, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও সমালোচনামূলক চেতনা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়। এই শেখার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজে শিখতে শেখে এবং আজীবন শেখার মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় স্তম্ভটি হলো "কাজ করার জন্য শেখা (Learning to Do)"। এই স্তম্ভ মূলত কর্মদক্ষতা, হাতেকলমে কাজ শেখা, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা ও দলে কাজ করার যোগ্যতার ওপর জোর দেয়। একবিংশ শতাব্দিতে শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, বাস্তব জীবনে কাজ করে সে জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে জানতে হবে এই ধারণাই এই স্তম্ভের কেন্দ্রবিন্দু।

তৃতীয় স্তম্ভ হলো "একসাথে বেঁচে থাকার জন্য শেখা (Learning to Live Together)"। এটি সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা ও সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক। আজকের বিভক্ত ও সহিংসতায় ভরা পৃথিবীতে একসঙ্গে সহাবস্থান করতে শেখানো শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ, এবং এই স্তম্ভ সেই চেতনার জন্ম দেয়।

চতুর্থ ও সর্বশেষ স্তম্ভটি হলো "হওয়ার জন্য শেখা (Learning to Be)"। এই স্তম্ভ ব্যক্তি হিসেবে আত্মবিকাশ, নৈতিকতা, মানসিক স্বাস্থ্য, সৃজনশীলতা এবং স্বশিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরে। এই স্তম্ভ একজন মানুষকে শুধু পেশাজীবী নয়, একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলে।

ডেলর কমিশনের এই চারটি স্তম্ভ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয় যেখানে মানুষ কেবল জ্ঞানার্জনকারী নয়, বরং একজন মানবিক, সচেতন, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। শিক্ষা হয় ব্যক্তির নিজস্ব বিকাশের একটি রূপ, যা তাকে শুধু তার জন্য নয়, সমাজ ও মানবজাতির কল্যাণে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেয়। ডেলরস কমিশন মনে করে, এই চারটি স্তম্ভের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা গেলে বিশ্ব হবে আরও শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক।

এই রিপোর্ট শিক্ষা নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে যাতে প্রতিটি দেশ তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলে, যেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানসম্পন্ন ও ন্যায্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত হয়। একবিংশ শতাব্দির শিক্ষার এই দর্শন শুধু আজকের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের একটি টেকসই সমাজ গঠনের জন্যও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও শিক্ষা

একবিংশ শতাব্দী হলো বৈশ্বিক পরিবর্তন, জটিলতা ও সম্ভাবনার সময়। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য, বৈষম্য, স্বাস্থ্যঝুঁকি, সহিংসতা ও প্রযুক্তিগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাঝে একটি বিষয় স্থায়ীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। এই প্রেক্ষাপটে, ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে গৃহীত করে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals; SDGs), যার লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, টেকসই, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলা।

SDG 4: শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্য

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) হলো জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ১৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্য, যা ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, সমতা ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ার রূপরেখা দেয়। এই ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে চতুর্থ লক্ষ্য (SDG৪) সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাকে ঘিরে। এটি কেবল একটি শিক্ষাবিষয়ক ঘোষণা নয়, বরং একটি সার্বিক সামাজিক রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দু, যা মানবিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের সহায়ক। SDG4 এর মূল প্রতিশ্রুতি হলো: *"Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"*। এর বাংলা অর্থ সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং আজীবন শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা।এই লক্ষ্য অনুসারে, শিক্ষা কেবল একটি মৌলিক অধিকার নয়, বরং টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষা মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলে, দারিদ্র্য থেকে বের করে আনে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায় এবং সামাজিকনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করে। শিক্ষা ছাড়া স্বাস্থ্য, পরিবেশ, লিঙ্গ সমতা বা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের কোনো লক্ষ্যই দীর্ঘমেয়াদে সম্ভব নয়।

SDG 4 এর মূল বার্তা হলো:

"Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all."

অর্থাৎ, সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive), ন্যায্য (equitable) ও মানসম্পন্ন (quality) শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং আজীবন শেখার (lifelong learning) সুযোগ তৈরি করা। SDG4 এর লক্ষ্যগুলো হলঃ

লক্ষ্য নম্বর	লক্ষ্য বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)
৪.১	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অবৈতনিক, মানসম্পন্ন ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৪.২	প্রাক-প্রাথমিক স্তরে উন্নত শিশু বিকাশ, যত্ন ও শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৪.৩	উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
৪.৪	যুব ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা, যাতে কর্মসংস্থানে সক্ষমতা বাড়ে।
৪.৫	লিঙ্গ বৈষম্যসহ সব ধরনের অসমতা দূর করা।
৪.৬	প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা ও সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা।
৪.৭	টেকসই উন্নয়ন, মানবাধিকার, শান্তি ও বৈচিত্র্য গ্রহণের বিষয়ে শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৪.a	নিরাপদ, প্রতিবন্ধীবান্ধব ও শিক্ষার জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরি করা।
৪.b	উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষা বৃত্তির সুযোগ বাড়ানো।
৪.c	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও পেশাগত উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

SDG4 এমন একটি সমন্বিত লক্ষ্য, যা শুধু শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানো নয়, বরং তাদের কী শেখানো হচ্ছে, কীভাবে শেখানো হচ্ছে এবং তারা তা কীভাবে প্রয়োগ করতে পারছে এই সব কিছুর মান নিশ্চিত করতে চায়।

এ লক্ষ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ওপর। অর্থাৎ, সমাজের প্রতিটি শ্রেণির শিশু যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেই নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে। দারিদ্র্য, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা বা কোনো ধরনের সামাজিক বৈষম্য যেন শিক্ষার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। একইসাথে, শিক্ষা হতে হবে ন্যায্য ও গুণগতমানসম্পন্ন, যাতে শিশুর কেবল সার্টিফিকেট না হয়, তার চিন্তাভাবনা, দক্ষতা ও মূল্যবোধও গড়ে ওঠে। SDG4 আরও বলে, শিক্ষা যেন একটি চলমান প্রক্রিয়া হয় শৈশব থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত আজীবন শেখা (lifelong learning) যেন সর্বজনীন অধিকার হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ SDG4 বাস্তবায়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৮ শতাংশের বেশি, লিঙ্গ সমতায় ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে, উপবৃত্তি ও মিড ডে মিল কার্যক্রম শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করতে ভূমিকা রাখছে। একইসাথে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং ডিজিটাল শিক্ষার উদ্যোগ বাংলাদেশের সফলতা নির্দেশ করে। তবে শিক্ষার মান, গ্রামীণ ও শহরের ব্যবধান, ঝরে পড়ার হার, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও শিক্ষক সংকট এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

একজন শিক্ষক হিসেবে SDG4 বাস্তবায়নে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানই কেবল দায়িত্ব নয়; বরং শিক্ষার্থীদের টেকসই উন্নয়নের ধারণা দেওয়া, মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, পরিবেশসচেতনতা তৈরি করা এবং সহনশীলতা ও শ্রদ্ধার সংস্কৃতি শেখানো একজন শিক্ষকের দায়িত্বের অংশ। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে ন্যায্য, মানবিক ও টেকসই করে তোলা সম্ভব এই বিশ্বাস নিয়েই SDG4 এর পথচলা।

অতএব, SDG4 শুধু একটি শিক্ষা লক্ষ্য নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার মানচিত্র। এর সফল বাস্তবায়ন শুধু উন্নয়ন নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক, সমতা ও সহানুভূতিমূলক বিশ্ব গড়ার পথে এক অগ্রগণ্য পদক্ষেপ।

SDG4 এর গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি

১. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education):

SDG4 এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলে, যেখানে কোনো শিক্ষার্থী পেছনে পড়ে থাকবে না সে হোক মেয়েশিশু, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য বা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শিশু। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সামাজিক বৈষম্য কমে এবং সমান সুযোগ তৈরি হয়।

২. ন্যায্যতা (Equity):

সমতা ও ন্যায্যতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সমতা মানে সবার জন্য একই সুযোগ, আর ন্যায্যতা মানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা দেওয়া। SDG4 এই ন্যায্যতার পক্ষে অবস্থান নেয়। এর লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিক্ষার্থী তার আর্থসামাজিক অবস্থান বা শারীরিক সক্ষমতার কারণে যেন পিছিয়ে না পড়ে।

৩. মানসম্পন্ন শিক্ষা (Quality Education):

শুধু বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নয়, বরং শেখার মান নিশ্চিত করাই SDG4 এর মূল চেতনা। এতে শিক্ষার উপকরণ, দক্ষ শিক্ষক, নিরাপদ পরিবেশ, সময়োপযোগী পাঠ্যক্রম এবং কার্যকর মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা একটি শিশুকে চিন্তাশীল, সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

৪. আজীবন শিক্ষা (Lifelong Learning):

SDG4 শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেবল স্কুল বা কলেজ কেন্দ্রিক করে দেখেনি। এটি শৈশব থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত শেখার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেয়। প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা, পেশাগত দক্ষতা, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুনঃশিক্ষা (reskilling/upskilling) এসবই এই লক্ষ্যের অংশ।

৫. শিক্ষা: টেকসই উন্নয়নের চালিকা শক্তি

SDG4 শুধুমাত্র শিক্ষা খাতের উন্নয়নের কথা বলে না, এটি আরও বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলে সমাজ ও দেশের অন্যান্য খাতেও। উদাহরণস্বরূপ:

- **দারিদ্র্য হ্রাস:** শিক্ষা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, আয় বাড়ায়, যার ফলে পরিবার ও সমাজের দারিদ্র্য কমে।
- **স্বাস্থ্য সচেতনতা:** শিক্ষিত জনগণ স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতন থাকে।
- **নারীর ক্ষমতায়ন:** মেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত হলে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়, সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়।
- **পরিবেশ সুরক্ষা:** পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা মানুষকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, পরিবেশবান্ধব আচরণ শেখায়।
- **শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন:** শিক্ষা মানুষকে সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল এবং দায়িত্বশীল করে তোলে যা সহিংসতা ও বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখে।
- **উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তি দক্ষতা:** শিক্ষার মাধ্যমে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখে মানুষ আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে SDG4 এর প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ, এবং এর মধ্যে SDG4: মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত এক দশকে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে, যা SDG4 এর দিকনির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যা বর্তমানে প্রায় শতভাগের কাছাকাছি পৌঁছেছে। শিক্ষার সুযোগে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য কমে এসেছে, এবং অনেক এলাকায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ ছেলেদের চেয়েও বেশি। শিক্ষায় এই লিঙ্গ সমতা অর্জন SDG4 এর অন্যতম বড় সাফল্যের দিক।

বাংলাদেশ সরকার উপবৃত্তি কর্মসূচি ও 'মিডডে মিল' (মধ্যাহ্নভোজ) কার্যক্রম চালু করে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা, যাতে শিশুদের শৈশবেই শেখার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়, এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ করা, যাতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী দক্ষ হয়ে উঠতে পারেএসব উদ্যোগ SDG4 বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশের ইতিবাচক অগ্রগতিকে নির্দেশ করে।

তবে এই সাফল্যের পাশাপাশি এখনো কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যা SDG4 অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার গুণগত মানে বৈষম্য, বিশেষ করে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক ঘাটতি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হার, বিদ্যালয়ের শারীরিক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার সক্ষমতার অভাব এখনো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। বিশেষ করে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলো এসব চ্যালেঞ্জের মুখে বেশি পড়ে।

এসব সমস্যার টেকসই সমাধানে SDG4 এর উপলক্ষ্যগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়। সেইসাথে শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তির সমন্বয়, শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন, এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব, SDG4 বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য শুধু একটি আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং একটি জাতীয় উন্নয়ন কৌশল, যার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব।

বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা ও বাংলাদেশ

একবিংশ শতাব্দির বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষা শুধু একটি জাতীয় বিষয় নয়, বরং একটি আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ ও অঙ্গীকার। তথ্যপ্রযুক্তি, বিশ্বায়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজে উত্তরণের এই সময়ে প্রতিটি দেশের জন্য একটি শক্তিশালী ও মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর জীবনের প্রথম কাঠামোগত শিক্ষার স্তর, যা তার মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ভিত্তি গড়ে দেয়। একজন সচেতন নাগরিক, দক্ষ পেশাজীবী এবং মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরির শুরু হয় এই পর্যায় থেকেই। তাই বিশ্বব্যাপী উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললেও, একটি মৌলিক লক্ষ্য সবার মধ্যেই বিদ্যমান সবার জন্য সমান সুযোগ, গুণগত শিক্ষা এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবেশ। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থারও রয়েছে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সফলতা, যেমন প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক ভর্তির হার, লিঙ্গ সমতায় অগ্রগতি, মিডডে মিল, উপবৃত্তি এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু। তবে এসব অর্জনের পাশাপাশি এখনো রয়েছে মান, মূল্যায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ।

এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে জাপান, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্রের (USA) মতো উন্নত দেশের সাথে এবং দক্ষিণ এশিয়ার (ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান) দেশের সাথে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা। এর মাধ্যমে শিক্ষকরা যেমন জানতে পারবেন বিশ্বের অন্যান্য দেশে কীভাবে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে, তেমনি নিজেদের অবস্থান মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতে কী উন্নয়ন দরকার, তা বোঝার সুযোগ তৈরি হবে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির গঠন, পাঠ্যক্রমের পদ্ধতি, মূল্যায়ন কাঠামো, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষকের ভূমিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থার শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারি। এই তুলনা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা:

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, কারণ এটি শিশুর মানসিক বিকাশ, সামাজিকতা ও মূল্যবোধ গঠনের প্রথম কাঠামোগত ধাপ। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এবং সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সম্প্রদায়ভিত্তিক স্কুল এবং বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও এই স্তরে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoPME) এই স্তরের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, এবং ঝরে পড়া রোধে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বর্তমানে প্রায় ৯৮%, যা একটি গৌরবজনক অর্জন। মেয়েশিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে, এবং বর্তমানে অনেক এলাকায় বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের চেয়ে বেশি।

শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি কার্যক্রম, এবং 'মিডডে মিল' বা দুপুরের খাবার কর্মসূচি চালু হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে উন্নয়নশীল একটি কাঠামোতে রূপ নিচ্ছে, যেখানে শিশুকেন্দ্রিক, জীবনঘনিষ্ঠ ও দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করায় শিশুরা শৈশব থেকেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে।

তবে এসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এখনও রয়েছে। যেমন: শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ঘাটতি, শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার, ঝরে পড়া সমস্যা, শারীরিক অবকাঠামোর দুর্বলতা, এবং প্রযুক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার না থাকা। অনেক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের সরঞ্জাম থাকলেও দক্ষ ব্যবহারকারী শিক্ষক না থাকায় তা পর্যাপ্তভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে কারিকুলাম ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রয়াস রয়েছে। এই নতুন পাঠ্যক্রমে শেখাকে আনন্দময়, অংশগ্রহণমূলক ও জীবনঘনিষ্ঠ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণক্ষমতা ও মানবিক গুণাবলি গড়ে তোলাই এখন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমবিকাশমান এবং উন্নয়নের ধারায় রয়েছে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য এই ব্যবস্থায় মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা সম্প্রসারণ, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের আধুনিকায়ন এবং দুর্বল অঞ্চলগুলোর বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে, প্রাথমিক শিক্ষাই হবে একটি শিক্ষিত, দক্ষ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার মূল ভিত্তি।

উন্নত দেশের সাথে তুলনা: জাপান, সুইডেন, ইউএসএ

প্রাথমিক শিক্ষা একটি দেশের সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের ভিত্তি। উন্নত দেশগুলো এই স্তরের শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সময়োপযোগী, গবেষণানির্ভর ও শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করে। বাংলাদেশও প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ও টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে উন্নত দেশগুলোর শিক্ষানীতির দৃষ্টান্ত থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। নিচে তিনটি উন্নত দেশের জাপান, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্র (USA) প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

জাপান:

জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা ৬ বছর মেয়াদি ও বাধ্যতামূলক। শিশুর বিদ্যালয়জীবনের সূচনাতেই তাকে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, সামাজিক দায়িত্ব ও জাতীয় চেতনার চর্চা শেখানো হয়। জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত শৃঙ্খলিত এবং কার্যকরভাবে কাঠামোবদ্ধ, যা শিশুর একাডেমিক দক্ষতার পাশাপাশি নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলে। পাঠ্যক্রমে শুধুমাত্র ভাষা ও অঙ্ক নয়, বরং নৈতিক শিক্ষা, জীবনদক্ষতা ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা শেখানো হয়। শিক্ষকেরা পেশাদার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এবং শিক্ষকতা একটি সম্মানজনক ও উচ্চ মর্যাদার পেশা হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রকল্পভিত্তিক কাজ, দলগত আলোচনা ও বিশ্লেষণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক থাকে, যা তাদের বাস্তবজ্ঞান ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে সহায়ক।

সুইডেন:

সুইডেনে প্রাথমিক শিক্ষা ৯ বছর মেয়াদি ও বাধ্যতামূলক। শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত উদার, মানবিক ও শিশুর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুইডেনের বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি হয় পর্যবেক্ষণ ও নিয়মিত ফিডব্যাকএর ভিত্তিতে। শিশুদের মধ্যে 'শিখতে শেখা'র দক্ষতা গড়ে তোলাই শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সুইডেন লিঙ্গসমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। এখানকার শিক্ষকরা পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত এবং নিয়মিতভাবে পেশাগত উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বন্ধুসুলভ, যা শেখার জন্য ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA):

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যভিত্তিক হলেও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা নীতিমালার নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণত ৫-৬ বছর মেয়াদি এবং বাধ্যতামূলক। এখানে শিশুকেন্দ্রিক, গবেষণাভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা, দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী 'Individualized Education Program (IEP)' গঠন করা হয়, যা বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী সক্ষমতার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। ক্লাসে বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষা, সৃজনশীলতা, STEM এবং ক্রীড়াকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মূল্যায়নের আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তুলেছে। এছাড়া স্কুলগুলোতে 'অভিভাবকশিক্ষক অংশীদারিত্ব', পরামর্শ সেবা এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান বাধ্যতামূলক।

তুলনামূলক চিত্র :

দিক	বাংলাদেশ	জাপান	সুইডেন	ইউএসএ
শিক্ষা মেয়াদ	৫ বছর	৬ বছর	৯ বছর	৫-৬ বছর
বাধ্যতামূলকতা	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক
প্রযুক্তি ব্যবহার	সীমিত	উন্নত	অত্যাধুনিক	ব্যাপক
মূল্যায়ন পদ্ধতি	পরীক্ষাভিত্তিক	পর্যবেক্ষণমূলক	ফিডব্যাক নির্ভর	গবেষণাভিত্তিক
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	সীমিত	কঠোর ও নিয়মিত	উচ্চ মানসম্পন্ন	নিয়মিত ও পেশাদার
শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ	মাঝারি	অত্যন্ত জোরালো	মানবিক ও নমনীয়	স্বাধীনতা ও সমতা
শিশুকেন্দ্রিকতা	সীমিত	মাঝারি	উচ্চ	উচ্চ

এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, উন্নত দেশগুলোর প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর সামগ্রিক বিকাশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যেখানে নৈতিকতা, প্রযুক্তি, স্বাধীন চিন্তা, অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা ও শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন দৃশ্যমান হলেও, শিক্ষার মান, প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণের আধুনিকায়ন এখন সময়ের দাবি। উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ আরও কার্যকর, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার সাথে তুলনা: ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান

দক্ষিণ এশিয়া একটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল, যেখানে প্রতিটি দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো আলাদা হলেও, প্রাথমিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে অভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও অগ্রগতির চিত্র দেখা যায়। এই অঞ্চলের দেশগুলো প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি শিক্ষাকে উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে দেখছে। তবে বাস্তবায়নে রয়েছে বৈষম্য, রাজনৈতিক প্রভাব, প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা এবং অবকাঠামোগত দুর্বলতা। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে এর শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ই পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

ভারত

ভারতে ‘Right to Education (RTE) Act, 2009’ অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে সরকার শিশুর মৌলিক শিক্ষা অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ‘মিডডে মিল’ কর্মসূচি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা পুষ্টিহীনতা মোকাবেলা ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া জাতিগত সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরাও শিক্ষার আওতায় আসছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়লেও এটি শহর ও গ্রামীণ শিক্ষায় পার্থক্য তৈরি করছে। ভারতের মতো বিশাল দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আঞ্চলিক বৈষম্য, অবকাঠামোর ঘাটতি, শিক্ষকের অপ্রতুলতা ও মানের তারতম্য এখনও বড় চ্যালেঞ্জ।

নেপাল

নেপালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক, তবে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, যেমন পাহাড়ি ও দুর্গম অঞ্চলগুলোর কারণে শিক্ষকের সংকট ও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হার বেশি। অনেক এলাকায় বিদ্যালয় পৌঁছাতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়, যা শিশুদের বিদ্যালয়মুখী হওয়ার আগ্রহ হ্রাস করে। যদিও সরকার মেয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং নারী শিক্ষায় ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তবে এখনও শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত শিক্ষকের স্বল্পতা ও কার্যকর মান নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে খুবই সীমিত, যা শিক্ষার আধুনিকায়নে একটি বড় বাধা।

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় সবচেয়ে সফল দেশগুলোর একটি। এখানে শিক্ষার হার ৯২% এর বেশি এবং সরকার জাতীয় পর্যায়ে একটি মানসম্পন্ন পাঠ্যক্রম পরিচালনা করে। শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ, স্কুলভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, এবং নিয়মিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক নজরদারি ও বিদ্যালয় পর্যায়ে অভিভাবকশিক্ষক সহযোগিতা শক্তিশালী। সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ, বাজেট বরাদ্দ, এবং শিক্ষাখাতে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কারণে শ্রীলঙ্কা প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানে দক্ষিণ এশিয়ায় অগ্রগামী। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিছু বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে।

ভুটান

ভুটানের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একটি ব্যতিক্রমী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় "Gross National Happiness (GNH)" বা "সামগ্রিক সুখ" ধারণা। এখানে শিশুদের কেবল পঠনপাঠনে সীমাবদ্ধ না রেখে মানসিক বিকাশ, নৈতিকতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং মানবিক মূল্যবোধ শেখানো হয়। পাঠ্যক্রমে সামাজিক দক্ষতা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং সৃজনশীলতার সমন্বয় রয়েছে। তবে প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অবকাঠামো এখনো সীমিত, বিশেষ করে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায়। তবু দেশটি সুশাসন ও শিক্ষা নীতিতে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।

তুলনামূলক চিত্র :

দেশ	আইনগত বাধ্যবাধকতা	প্রযুক্তি ব্যবহার	শিক্ষার মান	মূল চ্যালেঞ্জ
বাংলাদেশ	বাধ্যতামূলক	সীমিত	মাঝারি	শিক্ষার মান, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো
ভারত	বাধ্যতামূলক	মাঝারি	বৈচিত্র্যময়	আঞ্চলিক বৈষম্য, জনসংখ্যা চাপ
নেপাল	বাধ্যতামূলক	কম	দুর্বল	শিক্ষক ঘাটতি, ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা
শ্রীলঙ্কা	বাধ্যতামূলক	ভালো	উন্নত	কিছু অঞ্চলে বৈষম্য, পুনর্বাসনের প্রভাব
ভুটান	বাধ্যতামূলক	সীমিত	মানবিকমুখী	প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা

উপরে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার বাস্তবায়নেও সফলতা দেখিয়েছে। তবে চ্যালেঞ্জের ধরন দেশভেদে ভিন্ন। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি কর্মসূচির মতো ইতিবাচক উদ্যোগ রয়েছে, কিন্তু গুণগত মান, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি এখনো উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে রয়ে গেছে।

এই তুলনামূলক চিত্র শিক্ষকদের জন্য একটি বাস্তবদর্শী মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি করে। একজন শিক্ষক বা শিক্ষা পরিকল্পনাকারী হিসেবে জানা প্রয়োজনবিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গঠন ও পদ্ধতি কেমন, এবং কীভাবে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সময়োপযোগী, মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে পারি। তাই, শিক্ষা শুধু পাঠ্যবই নয় এটি শিশুদের আত্মিক, সামাজিক ও সৃজনশীল বিকাশের এক অবিচ্ছেদ্য পথচলা।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে অনেক অগ্রগতি অর্জন করলেও, অন্যান্য উন্নত এবং দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর তুলনায় এখনও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যেমন জাপান, সুইডেন বা ইউএসএর মতো দেশে প্রাথমিক শিক্ষা শুধু পাঠদান নয়, বরং শিক্ষার্থীর নৈতিক, সৃজনশীল ও আত্মিক বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে শিক্ষকের পেশাগত মর্যাদা, প্রশিক্ষণের মান, প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। একইভাবে শ্রীলঙ্কা, ভুটান বা ভারতেও শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে নীতিমালার পাশাপাশি কার্যকর বাস্তবায়ন রয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ❖ শিক্ষার গুণগত মানের ঘাটতি,
- ❖ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব,
- ❖ শিক্ষা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা,
- ❖ প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার,
- ❖ মৌলিক ও বৈচিত্র্যময় মূল্যায়নের অভাব,
- ❖ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ঘাটতি, এবং
- ❖ গ্রামীণশহরভিত্তিক বৈষম্য

অতিরিক্তভাবে, শিশুরা স্কুলে এলেও শেখার মান ও দক্ষতা অর্জন সঠিকভাবে হয় না। অনেক শিশু মৌলিক গণিত বা ভাষাজ্ঞান ছাড়াই প্রাথমিক স্তর পার করে ফেলে। ফলে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য পূরণ হয় না।

উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর, মানবিক ও যুগোপযোগী করতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি:

১. শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ

- জাতীয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন ও নিয়মিত ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা
- শিক্ষকতার পেশাকে আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক করা
- প্রত্যন্ত এলাকার জন্য প্রণোদনা ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ প্রথা চালু

২. প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল লার্নিং টুল ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহার নিশ্চিত
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল লিটারেসি ট্রেনিং
- ট্যাবলেট, অফলাইন লার্নিং অ্যাপস ব্যবহার করে দূরবর্তী এলাকার শিশুদের জন্য সহায়ক পদ্ধতি চালু

৩. বৈচিত্র্যময় ও বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি

- কেবল পরীক্ষা নির্ভর না হয়ে ফিডব্যাক, পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প ও শিশুর অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন চালু করা
- লগ বুক, পোর্টফোলিও, গল্পভিত্তিক লিখন ব্যবহার করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

৪. শিক্ষা পরিবেশের উন্নয়ন

- স্কুলে নিরাপদ ও শিশুবান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিত করা
- জেন্ডার সংবেদনশীল টয়লেট, বিশুদ্ধ পানি ও মিডডে মিল প্রসারিত করা
- মনোসামাজিক সহায়তা এবং শিশুদের জন্য কাউন্সেলিং সেবা চালু

৫. প্রশাসনিক দক্ষতা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ

- স্কুল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় অভিভাবকশিক্ষক কমিটি সক্রিয় করা
- শিক্ষকদের নিয়োগ, মনিটরিং ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

৬. আন্তর্জাতিক উদাহরণ থেকে শেখা

- ভুটানের "Gross National Happiness", সুইডেনের ফিডব্যাকভিত্তিক মূল্যায়ন, কিংবা জাপানের শিশুর দায়িত্বশীলতা শেখানোএসব পদ্ধতি থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কৌশল রূপান্তর করা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যেমন বিস্তার ও প্রবেশাধিকারে অনেক অগ্রগতি করেছে, তেমনি এখন সময় এসেছে মানের দিকে নজর দেওয়ার। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুকে মানবিক, দক্ষ, চিন্তাশীল ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার কাঠামো, পদ্ধতি ও নীতিতে আরও দৃঢ়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত পরিবর্তন আনা জরুরি। এই পরিবর্তন আনতে হলে, শিক্ষক, প্রশাসক, নীতিনির্ধারক ও অভিভাবক সবাইকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। তখনই আমরা বিশ্বমানের শিক্ষার পথে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলতে পারব।

সহায়ক তথ্যপত্র

- মালেক, ড. আব্দুল, বেগম, ড. মরিয়ম, ইসলাম, ড. ফখরুল, ও রিয়াদ, শেখ শাহবাজ (২০১৫), শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ শিক্ষা (৫ম সংস্করণ), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।
- উদ্দিন, মোঃ আয়েজ, ও দাস, সুভাষ চন্দ্র (২০১৪)। শিক্ষাদর্শন (৩য় সংস্করণ), উপমা প্রকাশন, ঢাকা।
- রায়, সুশীল (২০২২)। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন (ষোড়শ সংস্করণ), সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা।
- রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর (২০১৬), প্রারম্ভিক শিক্ষাবিজ্ঞান, প্রভাতী লাইব্রেরি। ঢাকা।
- রহমান ও অন্যান্য (২০০৩)। শিক্ষাকোষ, সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোওপারেশন (এসডিসি), ঢাকা।

- Mangal, S.K. & Mangal, S. (2019). Learning and Teaching. PHI Learning Private Limited, Delhi.
- UNESCO. (1996). *Learning: The Treasure Within (Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twentyfirst Century)*. Paris: UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Article 26. https://www.un.org/en/aboutus/universaldeclarationofhumanrights
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/conventionrightschild
- UNESCO. (2000). *The Dakar Framework for Action – Education for All: Meeting Our Collective Commitments*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147
- United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://sdgs.un.org/2030agenda
- World Bank. (2020). *The State of Global Learning Poverty: 2020 Update*. https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/thestateofgloballearningpoverty2022
- OECD. (2020). *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/education/educationataglance/
- UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a global common good?*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232555
- UNESCO Institute for Statistics (UIS). *Global Education Monitoring Data*. http://uis.unesco.org
- Education International (EI). *Equity and Inclusion in Education*. https://www.eiie.org/en